Girischandra Ghosh Lectures

গিরিশচন্দ্র

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

'ইণ্ডিয়ান ষ্টেজ' (চারি খণ্ডে), 'গিরিশ প্রতিভা', 'দানীবাবু ও বঙ্গরঙ্গমঞ্চ'
এবং 'দেশবন্ধু-স্মৃতি' (দুই খণ্ডে) প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত

১৯৩৮

PRINTED IN INDIA

PRINTED AND PUBLISHED BY BHUPENDRALAL BANERJEE
AT THE CALCUTTA UNIVERSITY PRESS, SENATE HOUSE, CALCUT

Reg. No. 945B.—July, 1938—E.

উৎসর্গ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা-বিভাগের
অধিনায়ক, যিনি গিরিশচন্দ্র-সম্বন্ধে
বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার প্রথম বক্তৃতা-সভায় সভাপতিত্ব
করিয়া আমাকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন,
বঙ্গসাহিত্যের সেই একনিষ্ঠ সেবক
রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুরের
নামে আমার এই গ্রন্থ নিবেদিত হইল।

বিনীত
গ্রন্থকার

নিবেদন

গিরিশ-স্মৃতিসমিতি-প্রদত্ত অর্থেই বিশ্ববিদ্যালয়ে গিরিশ-লেকচারারের আসন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেই গৌরবময় আসনের প্রথম অধিকারীই আমি। আমার পূর্ব্বে দেশবিশ্রুত বাগ্মী ও রাজনীতিজ্ঞ বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় এবং তৎপরে মনীষী দার্শনিক শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত গিরিশ-লেকচারার নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা উভয়েই ঐ অধ্যাপকের আসন অলঙ্কৃত করেন নাই। বিপিনচন্দ্রের অকালমৃত্যু এবং হীরেন্দ্র-নাথের অসম্মতিই আমাকে ঐ গৌরবের অধিকারী করিয়াছিল। নতুবা ঐ আসন অধিকার করিবার আমার ক্ষমতা কোথায়?

আমি বিশেষ চেষ্টা করিয়াছি যাহাতে আমার পূর্ব্ব রচনার এখানে কোন পুনরুক্তি বা অন্ধ অনুকরণ না হয়, কিন্তু তথাপি দক্ষ লেখক ব্যতীত কাহারও এতবড় গ্রন্থে সেই দোষ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। পাঠকগণের নিকটে সেই অনিবার্য্য ত্রুটীর জন্য মার্জ্জনা চাই।

স্থানে স্থানে ইংরাজি ভাষার নাট্যকারের রচনার কথা আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাও গিরিশ-রচনার সহিত তুলনার জন্য।

অভিনেতৃ-জীবনের একটু বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি, কিন্তু সর্ব্বদাই শুনিতে পাই বিদেশী অভিনেতার সঙ্গে এ দেশের অভিনেতার কাহারও তুলনা হয় না। ঋষিকল্প দ্বিজেন্দ্রনাথ, সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র এবং রঙ্গসাহিত্যিক ইন্দ্রনাথের সহিত

সমস্বরে বলিতে পারি, নট-হিসাবে 'বাঙ্গালার গিরিশ অপেক্ষা কোন দেশের গ্যারিক যে শ্রেষ্ঠ আমার তাহা মনে হয় না।'

সঙ্গীত-রচনায় গিরিশচন্দ্রের সমকক্ষ লেখক এ দেশে দুর্লভ। গিরিশের রচিত গীতগুলি তাঁহার নাটকেরই অঙ্গ। সে জন্য তাঁহার সঙ্গীত-সম্বন্ধে পৃথক্ করিয়া আলোচনা করা হইয়াছে।

আমার আর তিনটী বক্তৃতার সময়ে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ, এম. এ., ডক্টর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ., ডি.এস-সি., এম.এল.এ. এবং শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, এম.এ., মহাশয়গণ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া আমাকে উৎসাহিত করায় তাঁহাদের নিকটেও আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ।

উপসংহারে, বঙ্গসরস্বতীর যে কৃতী সেবকের আগ্রহে, উৎসাহে ও অভিভাবকতায় বিশ্ববিদ্যালয়ে গিরিশচন্দ্র-সম্বন্ধে বক্তৃতার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং আমি গিরিশচন্দ্র-সম্বন্ধে বক্তৃতা ও আলোচনা করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছি, সেই চিরশিক্ষাব্রতী, পরমসারস্বত, দেশপ্রাণ শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহোদয়কে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

বিনীত
শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

সূচি

প্রথম ভাগ

নাট্যসাহিত্যে গিরিশের স্থান

প্রথম অধ্যায়—নাট্যসাহিত্যে গিরিশের স্থান

পৃষ্ঠা

পারিপার্শ্বিক অবস্থা, গিরিশের বাল্য ও যৌবন, ধর্ম্মমত, বিভিন্ন অবস্থার প্রভাব, গিরিশের জননী ও তাঁহার মাতৃত্ব—সুভদ্রা, জনা, Volumnia, Queen Mother, জিজিবাই ও সীতা ১-৩৬

দ্বিতীয় অধ্যায়—পৌরাণিক নাটকে

সাহিত্যে পুরাণ, গিরিশের পৌরাণিক নাটকের তালিকা ৩৮-৪০, গিরিশের ধর্ম্মজীবনের পূর্ব্ব ও পরের অবস্থার সন্ধিস্থল চৈতন্যলীলা নাটক ৪১-৪৪, অন্যান্য নাট্যকারের পৌরাণিক নাটক ৪৫-৪৬, প্রহ্লাদচরিত্র ৪৭, বুদ্ধদেব-চরিত ৪৮, অশোক ৪৯-৫৪, সৎনাম ৫৪-৫৫, তপোবল ৫৫-৫৮, শঙ্করাচার্য্য ৬০, রামকৃষ্ণ-প্রভাবান্বিত নাটকে নাট্যকলার স্ফুরণ ৬০-৬৩ ... ৩৭-৬৩

পৃষ্ঠা

তৃতীয় অধ্যায়—ঐতিহাসিক নাটকে

সাহিত্যে জাতীয়তা—সেক্সপিয়রের Henry V ৬৫, King John ৬৬, কৃষ্ণকুমারী ও পুরুবিক্রম, হামির আনন্দরহো, চণ্ড ৬৬-৬৮, সৎনাম ও বৈষ্ণবী ৬৮-৭৯, হল্‌দিঘাট ৭৯, গিরিশের রাণাপ্রতাপ ৮০ ও প্রতাপসিংহ ৮১-৮৮, গিরিশ ও অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ৯০, সিরাজদ্দৌলা ৯১-৯৭, করিমচাচা ৯৮, জহরা ৯৯-১০০, মিরকাশিম ১০১-১০৪, শিবাজী ১০৪-১০৫, দ্বিজেন্দ্রলাল ও ক্ষীরোদপ্রসাদ ১০৭, তারা ১০৮-১০৯ ... ... ৬৪-১০৯

চতুর্থ অধ্যায়—সামাজিক নাটকে

প্রফুল্লে realism, নাটকে শিক্ষা ও ইবসেন ১১০-১১১, ইবসেনের Ghosts, Doll's House প্রভৃতি নাটক ১১২, বার্নার্ড শ ১১৩, রবীন্দ্রনাথ ১১৪, নোরা ও জোবী ১১৫, নাটকের উপাদান Tragedy, প্রফুল্ল, হারানিধি, মায়াবসান, বলিদান, গৃহলক্ষ্মী ও শাস্তি কি শান্তি—চরিত্র-সৃষ্টি ১২৭-২৯, Falstaf ও বরুণচাঁদ ১৩২, বারাঙ্গনা-চরিত্র ১৩৭, রূপ-সনাতন ১৪০, গিরিশ প্রেমের কবি ১৪১ ... ১১০-১৪১

পঞ্চম অধ্যায়—গিরিশের নূতন ছন্দ

মেঘনাদ-বধের ছন্দ ১৪৫, ইংলণ্ডে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রথম প্রবর্ত্তনা ১৪৭, মিল্টন ও

পৃষ্ঠা

মাইকেলের পদ্মাবতী ১৪৭-১৪৯, হুতোম প্যাঁচার নক্সা ১৫০, সীতা ও বুদ্ধদেব ১৫১, পাগলিনী ১৫২, চিন্তামণি ও বিশ্বামিত্র ১৫২-১৫৪, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৫৫, নবীনচন্দ্র সেন ১৫৬, রাজকৃষ্ণ রায় ও অমৃতলাল বসু ১৫৮, দ্বিজেন্দ্রলাল ১৫৯, ১৬১, সিরাজদ্দৌলা ১৬০, ক্ষীরোদপ্রসাদ ১৬২, কালাপাহাড় ১৬৩, গিরিশচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য ১৬৪-১৬৫ ... ১৪২-১৬৫

ষষ্ঠ অধ্যায়—বিবিধ বিষয়ে

প্রহসন, ম্যাকবেথ, প্রবন্ধ-রচনা ও 'ষ্টাইল' ... ১৬৬-১৭১

দ্বিতীয় ভাগ

বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চে গিরিশের স্থান

প্রথম অধ্যায়—রঙ্গমঞ্চ-গঠনে

সধবার একাদশী ও পূর্ব্ব ইতিহাস ১৭৫, পাবলিক থিয়েটারে 'ভীমসিংহ' ১৮৫, ১৮৭৬ সালের লাঞ্ছনা ১৮৭, গিরিশের চাকুরীগ্রহণ ১৮৮, ষ্টার ও রামকৃষ্ণদেব ১৯২-১৯৬, এমারেল্ড ১৯৭, মিনার্ভায় ম্যাকবেথ ১৯৯, ষ্টার, ক্লাসিক ও মিনার্ভায় সীতারাম ১৯৯-২০০, ক্লাসিকে সৎনাম ২০০, মিনার্ভায় বলিদান, সিরাজদ্দৌলা ২০০, কোহিনুরে ২০১, পরে

পৃষ্ঠা

মিনার্ভায়, শাস্তি কি শাস্তি, শঙ্করাচার্য্য, অশোক, তপোবল ২০২, গ্যারিক প্রভৃতির সহিত তুলনা ২০৫ ... ... ১৭৫-২০৮

দ্বিতীয় অধ্যায়—বিভিন্ন ভূমিকায় কৃতিত্ব

এই গ্রন্থে উল্লিখিত ভূমিকার তালিকা ... ২০৯-২১১

তৃতীয় অধ্যায়—অভিনয়-নৈপুণ্যে

গ্যারিক ও গিরিশ, বিভিন্ন ভূমিকায় নৈপুণ্য ... ২১২-২৩৮

চতুর্থ অধ্যায়—সঙ্গীত-রচনায় গিরিশ

রামপ্রসাদ ও গিরিশচন্দ্রের গান ২৩৯-২৪৮

প্রথম ভাগ

নাট্যসাহিত্যে গিরিশের স্থান

গিরিশচন্দ্র

নাট্যসাহিত্যে গিরিশের স্থান

প্রথম অধ্যায়

গিরিশচন্দ্রকে বুঝিতে হইলে তাঁহার আশৈশব জীবনের পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্যক্ রূপে অবগত হওয়া প্রয়োজন। কারণ, অবস্থার প্রভাব কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। গিরিশচন্দ্র যখন জন্মগ্রহণ করেন (১৮৪৪, ২৮শে ফেব্রুয়ারী), বাঙ্গালায় তখন পুরাতন ও নূতনের যুগসন্ধি। একদিকে পুরাতন যুগ অস্তমিতপ্রায়, আর একদিকে নব যুগের অভ্যুদয়—একদিকে কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস, কবিকঙ্কণ, দাশরথি প্রভৃতির প্রভাব, অন্যদিকে রামমোহন রায়ের আবির্ভাব,—একদিকে প্রাচীন সভ্যতা, অন্যদিকে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও আদর্শ,—একদিকে কৃষ্ণযাত্রা, রামায়ণ, কবি, পাঁচালি ও কীর্ত্তন, অন্যদিকে নূতন আদর্শে গঠিত থিয়েটার ও সখের যাত্রা,—একদিকে টোল, মক্তব ও পাঠশালা, অন্যদিকে বাঙ্গালার পল্লীতে পল্লীতে ইংরেজী স্কুলের প্রতিষ্ঠা,—একদিকে পল্লী-সভ্যতা ও বৃহৎ পরিবারের একান্নবর্ত্তিতা, আর একদিকে নগরের বিলাসিতার প্রলোভন ও আত্মপরায়ণতা। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের এই ভাব-সঙ্গম-সময়ে গিরিশচন্দ্রের আবির্ভাব।

প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়, যিনি আমাকে নানা ভাবে সহায়তা করিয়া ও মৎ-প্রণীত "গিরিশ-প্রতিভা"র ভূমিকা লিখিয়া দিয়া আমার প্রতি তাঁহার ঐকান্তিক স্নেহ ও বান্ধবতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তিনি গিরিশচন্দ্রের সমসাময়িক সাহিত্যিক ও মনীষিগণের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিয়াছেন এখানে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—"শ্রীরামকৃষ্ণদেব অবতীর্ণ (খৃঃ ১৮৩৬) হইবার আট বৎসর পরে তাঁহার প্রিয়ভক্ত গিরিশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন (খৃঃ ১৮৪৪)। যে দীনবন্ধুর "সধবার একাদশী" অভিনয় করিয়া বঙ্গ-রঙ্গভূমে এই অদ্বিতীয় অভিনেতার প্রথম প্রতিষ্ঠা, তিনি তখন কৈশোরে পদার্পণ করিয়াছেন; হুতোম-রচয়িতা কালীপ্রসন্ন সিংহ (খৃঃ ১৮৪১), যিনি গৈরিশী-ছন্দের পূর্ব্বাভাস দিয়াছিলেন, তিনি তখন তিন বৎসরের শিশু; বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র ষষ্ঠ বর্ষীয় বালক; মধুসূদন বিংশতিবর্ষীয় যুবক; গিরিশ যাঁহাকে ভাষার জীবন-দাতা বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন, সেই পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয় (খৃঃ ১৮২০) তখন মধ্যাহ্ন-গরিমায়; গুপ্ত কবি (খৃঃ ১৮১১) খ্যাতি-যশে প্রবীণ; দাশরথি (খৃঃ ১৮০৪) প্রৌঢ় বয়স্ক।" *

বলা বাহুল্য গিরিশচন্দ্র ইঁহাদের সকলের কাছেই অল্পাধিক পরিমাণে ঋণী।

গিরিশচন্দ্র পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও সমসাময়িক ব্যক্তিগণের প্রভাব এড়াইতে না পারিলেও তিনি কিন্তু পূর্ণ নাট্যকার রূপেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ভাবেই বিধাতা যেন তাঁহাকে

* পঞ্চপুষ্প, ১৩৩৬, আশ্বিন, পৃঃ ৮৬৭।

সৃষ্টি করিয়াছিলেন। শিক্ষাও তাঁহার প্রকৃতির পাঠশালাতেই হইয়াছিল। এদিকে আবার তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কালে কি সমসময়ে তাঁহার সমকক্ষ অন্য কোন নাট্যকার না থাকায় তাঁহাকে যেন সর্ব্বদা নিজ সৃষ্টির সহিতই প্রতিযোগিতা করিতে হইত।

এই যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াও ইংরেজী বিদ্যালয়ের উন্নত শিক্ষা লাভ করা গিরিশের অদৃষ্টে ঘটে নাই। স্কুলের পর স্কুল ঘুরিয়া প্রবেশিকার দ্বার পর্য্যন্তও যখন পৌঁছিতে পারিলেন না, তখন তিনি পড়াশুনা ছাড়িয়া গৃহে আসিয়া বসিতেই বাধ্য হইলেন। অতঃপর তাঁহার প্রকৃত শিক্ষা আরম্ভ হইল নিজ গৃহে বসিয়া জ্ঞানচর্চ্চায় এবং প্রকৃতির শিক্ষায়তনে। বাণীমন্দিরের সদর দ্বার তাঁহার নিকট রুদ্ধ হইয়া গেলেও গভীর জ্ঞানস্পৃহা এবং ঐকান্তিক অধ্যবসায়ের বলে উত্তরকালে তিনি যে জ্ঞানসম্পদের অধিকারী হইয়াছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তির শিক্ষাও তাহার নিকট ম্লান হইয়া যায়। একদিকে তিনি যেমন রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি অধ্যয়ন করিয়া ভারতীয় সভ্যতা ও আদর্শসম্বন্ধে গভীর জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, আর একদিকে তেমনি সেক্স্‌পিয়র, মোলিয়ার, মার্লো, মিলটন, বেকন, মিল প্রভৃতি কবি, নাট্যকার, সাহিত্যিক ও দার্শনিকগণের গ্রন্থ পাঠ করিয়া পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার সহিতও তিনি বিশেষভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন। তাই প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য উভয়বিধ শিক্ষার প্রভাবই তাঁহার নাটকে প্রতিফলিত দেখিতে পাওয়া যায়। শিশুকালেই খুল্লপিতামহীর নিকট পৌরাণিক গল্প শুনিয়া পুরাণের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা তাঁহার জন্মিয়াছিল, আর মাতুল নবীনকৃষ্ণ বসুর শিক্ষাগুণে সাহিত্য ও দর্শনও তিনি আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

গিরিশচন্দ্রের পিতা নীলকমল ঘোষ ছিলেন বিচক্ষণ ও বিষয়বুদ্ধি-সম্পন্ন, আর মাতা ছিলেন ভাবপ্রবণা এবং দেব-দ্বিজে ভক্তিমতী। গিরিশচন্দ্র মাতাপিতা উভয়েরই গুণের অধিকারী হইয়াছিলেন। অতি শৈশব হইতেই গিরিশচন্দ্রের ভাবপ্রবণ হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। হৃদয়ের ভাবপ্রবণতা এবং পিতৃদত্ত কঠোর সাংসারিক শিক্ষা তাঁহার চরিত্রের কেবল সম্পূর্ণতাই সাধন করে নাই, পরন্তু নাটক-রচনায়ও তাঁহাকে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল। শৈশবকাল হইতে গিরিশচন্দ্রের ভাবপ্রবণ হৃদয়ের একটি চিত্র 'গিরিশ-প্রতিভা' হইতে এখানে উদ্ধৃত হইল :—

"সেদিন অক্রুর-সংবাদের কথা হইতেছিল। ক্রুর অক্রুর কৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া যাইবার জন্য রথ আনিয়াছেন। শ্রীবৃন্দাবনের আজ বড়ই দুর্দ্দিন। গোকুলচন্দ্রের আসন্ন বিরহে ব্রজপুরী আচ্ছন্ন। আজ তরুপত্রে মর্ম্মর নাই, কুঞ্জবনে গুঞ্জন-ধ্বনি নাই, বিহগ-বিহগী নিস্তব্ধ। লতা আজ ফুলের সাজ খুলিয়া ফেলিয়াছে, গাভী তৃণ ছাড়িয়াছে, ব্রজবাসিগণের হাহাকারে ও তপ্তশ্বাসভরে বাতাস মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে। কেবল যমুনা গুন গুন স্বরে গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে নন্দ-যশোদার হৃদয়, রাধিকার প্রেম, গোপ-গোপীগণের অশ্রুপিচ্ছিল পথ দলিত করিয়া কৃষ্ণকে লইয়া অক্রুরের রথ গভীর ঘর্ঘর-শব্দে চলিয়া গেল—গিরিশের বৃদ্ধা খুল্লপিতামহী দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন। রুদ্ধশ্বাস অশ্রুসিক্ত বালক প্রশ্ন করিল, 'কৃষ্ণ চলে গেলেন, আবার কবে এলেন ?' খুল্লপিতামহী বিষণ্ণ স্বরে বলিলেন, 'আর ভাই, এলেন না।' গিরিশ ব্যথিত স্বরে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, 'আর কখনও এলেন না ?' বৃদ্ধা তেমনি

কাতর কণ্ঠে উত্তর করিলেন, 'না ভাই।' আবার উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন হইল, 'আর মোটে না?' কোন উত্তর না পাইয়া মর্ম্মাহত বালক কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিয়া গেল। তিন দিন আর পুরাণ-প্রসঙ্গ শুনিতে আসিল না।" গিরিশ-প্রতিভা, ৭-৮ পৃষ্ঠা।

পিতার অবস্থা-বিপর্য্যয়ে চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সেই মহাকবি সেক্স্পিয়র সংসারে প্রবেশ করিয়াছিলেন। চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে—কৈশোর ও যৌবনের বয়ঃসন্ধি-সময়েই পিতার মৃত্যুতে গিরিশচন্দ্রকেও সংসারে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া যে অভিজ্ঞতা তিনি অর্জ্জন করেন তাহাই তাঁহার জীবনের প্রধান সম্পৎ-সঞ্চয়। এই বৎসরই সিপাহী-বিদ্রোহের অনল-প্রবাহ সমগ্র ভারত ব্যাপিয়া ভয়ঙ্কর হইয়া জ্বলিয়া উঠে। বিদ্রোহানলের লেলিহান জিহ্বা বাঙ্গলা দেশকেও গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছিল—সিপাহীগণ বঙ্গদেশেও প্রভাব বিস্তার করিতে ত্রুটি করে নাই। অন্তরে বাহিরে এইরূপ বিভীষিকা লইয়া গিরিশচন্দ্রের প্রথম সংসারে প্রবেশ। অতঃপর গিরিশচন্দ্র নিজেই তাঁহার বিবিধ প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, উপন্যাস এবং নাটকের মধ্য দিয়া প্রচ্ছন্নভাবে তাঁহার জীবন-কাহিনী নিজেই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। অনুসন্ধিৎসু পাঠক সামান্য চেষ্টা করিলেই সেই কাহিনী খুঁজিয়া পাইবেন। "গিরিশ-প্রতিভা"য় এ সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করা হইয়াছে।

দুঃখ ছিল গিরিশচন্দ্রের আজন্মসহচর। বিধাতার স্নেহ-কর-স্পর্শে লালিত হওয়ার সৌভাগ্য তাঁহার হয় নাই। প্রকৃতির পাঠশালাই কবির শিক্ষাক্ষেত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহার পক্ষে প্রকৃতি হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন নির্ম্মমহৃদয়া কঠিন শিক্ষাদাত্রী। "শ্রীবৎস-চিন্তায়" বাতুলের মুখ দিয়া তিনি নিজের জীবন-

কাহিনীই ব্যক্ত করিয়াছেন :—"মহারাজের দুঃখের সহিত নূতন আলাপ—আমার বহুদিনের প্রণয়, দুটো একটা ঠাট্টা বোট্‌কেরা চলে।" "মায়াবসানে" কালীকিঙ্করের মুখে এই ভাবটি আরও পরিস্ফুট হইয়াছে :—"জীবনে দুঃখই সার্থক, ভূমিষ্ঠ হয়ে দুঃখ, আজীবন দুঃখ, মরণে দুঃখ।" "অশোকে" ও জীবনের এই দুঃখের দিক্‌টার কথাই উল্লেখ করা হইয়াছে। অশোক আকালকে বলিতেছেন,—"তোমার কথাবার্ত্তা শিক্ষিতের ন্যায়।" আকাল উত্তর করিলেন, "দীন পিতামাতা বাল্যকালেই মরে গেলেন, সেই হ'তেই আজীবন শিক্ষা পেয়ে আস্‌ছি।"

এইরূপ দুঃখ তিনি পাইয়াছিলেন বলিয়াই দুঃখী গৃহস্থের ব্যথায় তাঁহার অন্তরের বেদনা মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে তাঁহার প্রথম সামাজিক নাটক "প্রফুল্লে।" কর্ম্মক্লান্ত জীবন হইতে অবসর গ্রহণ করিবার সময়ে যোগেশ রমেশকে বলিতেছেন,—

"আমার বিবেচনায় কলিকাতার গৃহস্থ ভদ্রলোকই দুঃখী। এই পাড়ায় দেখ চাকরী বাকরী করে আন্‌ছে, নিচ্ছে, খাচ্ছে,—যেই একজন চোখ বুজলো, অমনি তার ছেলেগুলি অনাথ হ'ল, কি খায় তার উপায় নাই। তাদের যে কি অবস্থা তা বল্‌বো কি, আমি হাড়ে হাড়ে বুঝেছি! আমি টালায় যে একখানি দেবোত্তর বাড়ী করেছি সেটি অতিথিশালা নয়, তাতে এইরূপ অনাথ গৃহস্থরা এক একটি ঘর নিয়ে থাক্‌তে পারে, আর পঞ্চাশ হাজার টাকা জমা রেখেছি তারই সুদ থেকে কোন রকমে শাক-অন্ন খেয়ে দিনপাত করবে। তুমি তার ট্রাষ্টি, আজকে একটা লেখাপড়া করো।"—প্রফুল্ল, ১ম অ°, ১ম গ°।

গিরিশচন্দ্রের চরিত্রই ছিল অদ্ভুত। বিপরীত ভাবের এমন বিচিত্র সমাবেশ—এমন দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ আর কাহারও মধ্যে দেখা

যায় না। বাস্তবিক বিরুদ্ধ গুণাবলীর অপূর্ব্ব সমাবেশে তাঁহার চরিত্রই ছিল একখানি সুগঠিত বৃহদায়তন জীবন্ত নাটক। যাঁহার পবিত্র প্রবাহে জীবনের এই বিচিত্র বিরোধের সমাধান হইয়াছিল সেই মহাপুরুষের কথা এখানে উল্লেখ না করিলে গিরিশ-নাটকের সম্যক্ উপলব্ধি হইবে না। যৌবনে গিরিশচন্দ্র ছিলেন ঘোর সংশয়বাদী। একদিকে সমাজে গণ্যমান্য ও বিদ্বান্ Young Bengal-এর প্রভাব, অন্যদিকে জননীর ঐকান্তিকী নিষ্ঠা ও দেবদ্বিজে ভক্তি,—একদিকে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের অনাচার ও অত্যাচারের ফলে হিন্দুসমাজের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব, অন্যদিকে হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি সংস্কারজনিত শ্রদ্ধা,—একদিকে ব্রাহ্ম-সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের একদেশদর্শিতা-দর্শনে অনিশ্চয়-বুদ্ধি আর একদিকে শাক্ত-বৈষ্ণবের বিবাদে হৃদয়ের বিতৃষ্ণা তাঁহার চিত্তকে সংশয়ের দোলায় দোদুল্যমান করিয়া তুলিয়াছিল। হৃদয় চাহিতেছে ঈশ্বর, বুদ্ধি বলিতেছে "ঈশ্বর নাই, বিজ্ঞান বিজ্ঞান, বিজ্ঞান কেবল মানবের বল।" এই সংশয় ও প্রত্যয়ের, হৃদয় ও মস্তিষ্কের অন্তর্দ্বন্দ্বে, হিন্দুর চিরন্তন সংস্কার ও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার ঘাতপ্রতিঘাতে কত যে অশান্তিতে তাঁহার জীবন কাটিয়াছে, কত যে আকুল অশ্রুধারা বর্ষিত হইয়াছে, কত যে বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত হইয়াছে তাহা একমাত্র অন্তর্য্যামী ও তাঁহার অশান্ত হৃদয় ভিন্ন আর কেহ বুঝিত না। কখনও বলিতেছেন—

"কোথায় ঈশ্বর ?
কলেবর ধরে নর ভূতের সংযোগে—
অনিয়ম স্রোতের অধীন সবে ভাসে।"

কখনও বুদ্ধি প্রলুব্ধ করিতেছে—

"বুদ্ধি তারে বলে
ভূমণ্ডলে ধার্ম্মিক সুজন সেই।
গুরু কেবা, কিবা উপদেশ দিবে?"

প্রাণ আবার বিশ্বাস আশ্রয় করিবার জন্যও ব্যাকুল—

"অনিশ্চিত অনিশ্চিত বুদ্ধি পরাজয়
নির্ণয় না হয়—হায় কে আছে কোথায়?"

আবার কখনও বা সন্দেহ ও বিপাকে পড়িয়া যেন হাবুডুবু খাইতেছে—

"অন্তস্থল চঞ্চল প্রবল
সন্দেহ-প্রবাহ পাকে, নিবিড় আঁধার
আবরিল হৃদাকাশ হাহাকার নিশি
দিবা; সত্যতত্ত্ব কহ কিবা মহাশয়!"

এই ভাবেই গুরু-নির্ব্বাচন ব্যাপারেও অন্তরের সহিত তাঁহাকে কম সংগ্রাম করিতে হয় নাই। অবশেষে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের চরণে আত্মসমর্পণ করায় তাঁহার হৃদয়ের তীব্র যাতনার অবসান হয়। তাঁহার সেই অশান্ত হৃদয়ের যাতনা এবং গুরুকৃপায় প্রশান্ত শান্তির চিত্র আমরা তাঁহারই ভাষায় ব্যক্ত করিতেছি—

"ভবে ভ্রান্ত, অশান্ত তরঙ্গে দোলে নর
অজ্ঞান আঁধারে;
সত্য তত্ত্ব নিরূপণে ব্যাকুল অন্তর;

অসহায় বুদ্ধি বলে নারে,
তর্কদ্বন্দ্ব শাস্ত্রের বিচারে
সন্দেহ উদয় বারে বারে ;
দিতে স্নিগ্ধ পদচ্ছায়া, ধরায় ধরেছ কায়া
ঐক্য-জ্ঞান প্রচার সংসারে
মিটে দ্বন্দ্ব ঘুচে সন্দ বিশ্বাস সঞ্চারে।"

পরমহংসদেবের সংস্পর্শে আসিবার পর হইতে গিরিশের সকল নাটকের প্লট ও চরিত্রের পরিকল্পনা তাঁহার পবিত্র প্রভাবে নূতন ভাব ও রূপ ধারণ করিয়াছে। 'বিল্বমঙ্গল,' 'কালাপাহাড়,' 'নসীরাম,' 'জনা,' 'পাণ্ডবগৌরব,' 'মনের মতন,' 'অশোক,' 'শঙ্করাচার্য্য' ও 'তপোবল' নাটকে এই নবভাব ও রূপের প্রকাশই আমরা দেখিতে পাই।

গিরিশচন্দ্রের রচিত অনেক নাটকেই আমরা সাধু, সন্ন্যাসী, পাগল বা বিদূষকের কোন-না-কোন চরিত্র দেখিতে পাই। এই সকল চরিত্রের মধ্যে ন্যায় ও নিষ্ঠা, ধর্ম্ম ও সত্যের বিচিত্র আদর্শ তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। এই সকল চরিত্র-সৃষ্টি গিরিশ-চন্দ্রের উচ্চতম চিত্তবৃত্তির প্রকাশ, তাঁহার উন্নত আধ্যাত্মিক জীবনের পরিচায়ক।

সতীর্থ কর্ম্মযোগী স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্ত্তিত সেবাধর্ম্ম ও আত্মত্যাগ-ব্রতকে গিরিশচন্দ্র কিরূপে তাঁহার নাটকে যুগধর্ম্মরূপে প্রতিফলিত করিয়াছেন, ভ্রান্তি, 'শাস্তি কি শান্তি,' 'মায়াবসান,' 'গৃহলক্ষ্মী,' 'বলিদান' ও 'তপোবল' নাটকে তাহার আভাস পাওয়া যায়। বস্তুতঃ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রভাবে দেশীয় ও বিদেশীয় নাট্যকারগণের মধ্যে গিরিশচন্দ্র একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন।

বাঙ্গালায় জাতীয় ভাবের উন্মেষ হইয়াছিল বঙ্গভঙ্গেরও বহু পূর্ব্বে। কিন্তু ১৯০৪ সালে বঙ্গদেশ যখন দ্বিখণ্ডিত হইবার প্রস্তাব হইল, তখন এই দ্বিধা-বিভক্ত বাঙ্গালাকে কেন্দ্র করিয়া তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়, জাতীয় ভাবের ক্ষীণ স্রোত নূতন ভাবের বন্যায় পরিপুষ্ট হইয়া দুই কূল ছাপাইয়া সমস্ত বাঙ্গালা-দেশকে প্লাবিত করিয়া ফেলে। গিরিশচন্দ্রও বাঙ্গালার এই নবজাগ্রত জাতীয় জীবনের প্রভাবকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তাঁহার 'সৎনাম,' 'সিরাজদ্দৌলা,' 'মিরকাশিম' ও 'ছত্রপতি শিবাজী' এই নব প্রবাহিত ভাবধারা অবলম্বনে রচিত।

স্নেহশীলা জননী, পরমগুরু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, গুরুভ্রাতা স্বামী বিবেকানন্দ ও জাতীয়তার নববন্যা সমধিক ভাবে গিরিশ-চন্দ্রের উপর প্রভাব বিস্তার করিলেও নাটকীয় চরিত্র-সৃষ্টি-চাতুর্য্য ও চরিত্রের অভিব্যক্তি গিরিশচন্দ্রের সম্পূর্ণ নিজস্ব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিপরীত ভাবের সংঘর্ষে গিরিশচন্দ্রের চরিত্রের বিকাশ। একদিকে তাঁহার সাহস যেমন ছিল দুর্দ্দমনীয়, অন্যদিকে আবার তেমনি সামান্য কারণেই তিনি অত্যন্ত ভয় পাইতেন। কঠোর কর্ত্তব্য উপস্থিত হইলে তিনি যেন শত হস্তে অক্লান্তভাবে কাজ করিতেন, আবার সাধারণ কাজেও তাঁহার শিথিলতার সীমা ছিল না। একদিকে তাঁহার ধৈর্য্য যেমন ছিল অসীম আর একদিকে আবার তেমনি ছিলেন তিনি ব্যস্তবাগীশ। বস্তুতঃ দেবেন্দ্রবাবুর সহিত আমরাও সমস্বরে বলিতে পারি, "একাধারে এমন ঔদাস্য ও আমোদ-প্রিয়তা, আলস্য ও উদ্যম, ধৈর্য্য ও অস্থিরতা, সাহস ও ভীরুতা, গর্ব্ব ও বিনয়, ক্রোধ ও ক্ষমা, ক্ষিপ্রকারিতা ও দীর্ঘসূত্রতা, বিচারনিষ্ঠা ও হঠকারিতা, দম্ভ ও দীনতা, ভাবপ্রবণতা ও বিষয়বুদ্ধি, সংশয় ও

বিশ্বাসের একত্র সমাবেশ সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। তাঁহার জীবনে মমতা ও বৈরাগ্য, দৈবনির্ভরতা ও পুরুষকার, সাংসারিকতা ও আধ্যাত্মিকতার একত্র সম্মিলন ঘটিয়াছিল।"

এই সকল বিরুদ্ধ গুণের একত্র সমাবেশ দেখিয়া কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়াছিলেন, "গিরিশ ঘোষকে যত দেখ্‌ছি ততই চিন্‌তে পার্‌ছিনি।" যৌবনে যেমন পান, তামাক, সুরা তাঁহাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া রাখিত, অধ্যয়নস্পৃহা, পুরাণ-প্রসঙ্গ এবং রঙ্গভূমিও তেমনি সমভাবে তাঁহাকে আকৃষ্ট করিত। কিন্তু জীবনের শেষভাগে রামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ ব্যতীত অন্য কিছুতেই তাঁহার স্পৃহা ছিল না।

গিরিশচন্দ্রের চিত্রিত সমস্ত চরিত্রই তাঁহার অভিজ্ঞতা-প্রসূত। বস্তুতঃ তাঁহার অভিজ্ঞতা যেমন বিশাল, চরিত্রাঙ্কনও সেইরূপ অভূতপূর্ব্ব। আমরা ক্রমে ক্রমে সংক্ষেপে তাহার পরিচয় প্রদান করিব। তাঁহার নাটকে যেমন অবতার-চরিত্রের পরিকল্পনা দৃষ্ট হয় তেমনি কুমুদিনী, থাকমণি, রমানাথ, শরৎ প্রভৃতি হীন-চরিত্রও তদনুরূপ জীবন্তভাবে অঙ্কিত হইয়াছে।

"গিরিশ-প্রতিভা"য় আমরা গিরিশ-জননীর ঐকান্তিক ভক্তি-পরায়ণতা ও আত্মত্যাগের জ্বলন্ত কাহিনীর উল্লেখ করিয়াছি। জননীর ভক্তিপরায়ণতা ও আত্মত্যাগ চিরকাল তাঁহার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। গিরিশ ছিলেন অষ্টম গর্ভের সন্তান। অষ্টম বর্ষে পদার্পণ করিলেই তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর লোকান্তরিত হন। ইহার পর হইতেই গিরিশের জননী তাঁহার প্রতি অত্যন্ত কঠোর হইয়া উঠিলেন। আদরের জন্য লালায়িত হইয়া জননীর অঞ্চল ধরিতে গেলে তিনি

দূর দূর করিয়া তাঁহাকে তাড়াইয়া দিতেন। কিন্তু মাতৃস্নেহের অন্তঃসলিলা ফল্গুধারা একদিন আত্মপ্রকাশ করিল গিরিশ-চন্দ্রের ভয়ঙ্কর অসুখের সময়ে। অর্দ্ধ-অচৈতন্য অবস্থায় গিরিশ শুনিলেন জননী পিতাকে বলিতেছেন, "ওকে ভাল করে দাও। ওর কষ্ট আমার সহ্য হচ্ছে না। ওকে অনাদর করেছি ওরই জন্য। পাছে আমার কুদৃষ্টিতে ওর অমঙ্গল হয়, তাই ভয়ে আমি কাছে আস্‌তে দিতুম না।" গিরিশের মর্ম্মদাহ নিমেষে জুড়াইয়া গেল। ইহারই কিন্তু অল্প কিছুদিন পরে একটি মৃত পুত্র প্রসব করিয়া গিরিশচন্দ্রের জননী লোকান্তরিত হন। গিরিশের বয়স তখন একাদশ বৎসর। কিন্তু মাতৃস্নেহের পবিত্র স্মৃতি তিনি জীবনে কখনও বিস্মৃত হন নাই। "গোব্‌রা" নামক গল্পে গিরিশ-চন্দ্র উমাচরণের গর্ভধারিণীকে দিয়া বলাইয়াছেন—

"উমো বড় অভাগা, একদিনও স্তন্য দিতে পারি নাই। বৃদ্ধ বয়সের সন্তান, পাছে অকল্যাণ হয় এই ভয়ে ওর প্রতি আমি চাই নাই, কখনও আদর করি নাই। কিন্তু বাছা সকলের কাছেই দুরন্ত শুন্‌তে পাই। আমার তাড়নায় কেঁদেছে মাত্র, কখনও মুখ তুলে চায় নাই। আমার পুত্র-স্নেহ আমি তোমায় দিয়ে গেলাম।" উমাচরণ শুনিয়া "মা মা" রবে উচ্চ শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল।

মাতৃত্বের এই আত্মত্যাগপূত কল্যাণময়ী মূর্ত্তি 'অশোক' নাটকে আরও উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। মাতা সুভদ্রাঙ্গী অশোককে বলিতেছেন—

"বুঝিবা জানিতে মোরে মমতা-বর্জ্জিত,
বুঝিবা ভাবিতে মম আদরের ত্রুটি,

কিন্তু শোনো বৎস,
আজি করি মনোভাব প্রকাশ তোমারে।
রাজরাজেশ্বর পুত্র জন্মিবে আমার
দৈবজ্ঞের গণনা এরূপ,
স্নেহদৃষ্টে চাহিলে তোমার পানে
পাছে তব হয় অকল্যাণ
স্নেহের প্রকাশ নাহি করি সেই হেতু।"
—১ম অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক।

গিরিশচন্দ্রের উপর এই মহিমময়ী মাতৃমূর্ত্তি কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন তাহার পরিচয় পাই জনা, জিজিবাই, ইচ্ছা, সীতা, সুভদ্রা প্রভৃতি মাতৃ-চরিত্র-অঙ্কনে। এক সেক্‌স্‌পিয়র ব্যতীত আর কেহই এরূপ চরিত্র অঙ্কিত করিতে পারেন নাই। আমাদের দেশীয় আর কোন কবি কি নাট্যকার এরূপ চরিত্র অঙ্কনে প্রয়াস পান নাই। "বন্দে মাতরম্‌" মন্ত্রের দ্রষ্টা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রই সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালী জাতিকে মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছেন। কিন্তু তিনিও তাঁহার কোন উপন্যাসে মাতৃচরিত্র অঙ্কিত করেন নাই। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে, কাব্যে বা নাটকে মাতৃচরিত্র দৃষ্ট হয় না। দ্বিজেন্দ্রলালের 'চন্দ্রগুপ্তে' চাণক্যের মুখে মায়ের ত্যাগ ও করুণা এবং 'পরপারে' নাটকে মাতৃস্নেহের মধুর বাণী আমরা শুনিতে পাই; এবং 'মহিলা' কাব্যের কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার তাঁহার কাব্যগ্রন্থে মমতাময়ী মাতার স্নেহ-নির্ঝরের মধুর আস্বাদ আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু মাতৃশক্তিদ্বারা প্রভাবান্বিত কোন চরিত্র দ্বিজেন্দ্র-লালের নাটকে কিংবা সুরেন্দ্রনাথের কাব্যে আমরা পাই না।

ক্ষীরোদপ্রসাদ অথবা অমৃতলাল বসুর নাট্য-সাহিত্যেও এইরূপ চরিত্র দৃষ্ট হয় না। বিখ্যাত ইংরেজ কবি Swinburne *The Queen-Mother* নাটকে যে স্নেহময়ী জননী-মূর্ত্তি Catharine De' Medicির চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা জনা চরিত্রের কাছেও পরাভব মানে। একমাত্র সেক্‌স্‌পিয়রের *Coriolanus* নাটকের Volumnia চরিত্রে মহিমময়ী মাতৃ-মূর্ত্তির অভিব্যক্তি আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু জনা Volumnia অপেক্ষাও অধিকতর তেজস্বিনী, পুত্রস্নেহ-পরায়ণা ও কর্ম্মকুশলা। সেক্‌স্‌পিয়র Volumnia চরিত্র-অঙ্কনে Plutarch-এর *Parallel Lives*-এর স্যর টমাস্ নর্থ কর্ত্তৃক অনূদিত গ্রন্থের সহায়তা পাইয়াছিলেন, কিন্তু জনা-চরিত্র-অঙ্কনে গিরিশচন্দ্র পুরাণ হইতে কোনই সহায়তা পান নাই। পাঠকের অবগতির জন্য সেক্‌স্‌পিয়রের সহিত গিরিশচন্দ্রের তুলনামূলক আলোচনা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

Plutarch-এর গ্রন্থ এবং রোমের ইতিহাস পাঠে আমরা জানিতে পারি, সেই অতীত যুগে রোমের অভিজাত সম্প্রদায়ের সহিত সাধারণ জনগণের বিশেষ বিরোধ ছিল। অভিজাত সম্প্রদায়ের Caius Marcius একজন অসাধারণ সাহসী ও যোদ্ধা ছিলেন বটে, কিন্তু জনসাধারণকে তিনি ঘৃণার চক্ষেই দেখিতেন। শুধু তাই নয়, সাধারণ জনগণের তিনি যে একজন প্রধান শত্রু ছিলেন নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে তাহা আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি।

"Citizen.—First you know, Caius Marcius is chief enemy to the people."

অভিজাত সম্প্রদায় এবং জনসাধারণের মধ্যে যখন এবংবিধ মনোভাব বর্ত্তমান, সেই সময়ে Volsces সৈন্যের সহিত রোমের

যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল। Caius Marcius Corioli প্রান্তে Volsces-সৈন্যদলকে পরাভূত করিয়া Coriolanus উপাধি প্রাপ্ত হন। এই যুদ্ধের পর তাঁহার Consul হওয়ার প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। কিন্তু Consul হইতে হইলে নির্ব্বাচনপ্রার্থী হইয়া জনসাধারণের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ান ভিন্ন আর কোন উপায় নাই। Caius Marcius প্রথমে জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত হইতে স্বীকৃত হইলেন না। পরে তাহাদের কাছে উপস্থিত হইলেন বটে, কিন্তু জনগণের প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক ঘৃণাবশতঃ তাহাদিগকে অপমান করিয়া চলিয়া আসিলেন। এই অবিমৃষ্যকারিতার পরিণাম হইল রোম হইতে তাঁহার নির্ব্বাসন। Coriolanus যখন শত্রুপক্ষ Volsces-এর সৈন্যাধ্যক্ষ Aufidius-এর সহিত যোগদান করিয়া রোম আক্রমণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন, তখন তাঁহার মাতা, পত্নী এবং অভিজাত বংশের অনেক মহিলা নানা প্রকারে বুঝাইয়া, বহু যুক্তি প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে এই দুষ্কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করেন।

এই উপাখ্যানকে ভিত্তি করিয়া সেক্স্পিয়র মহিমময়ী মাতৃমূর্ত্তি Volumnia চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। পুত্র Caius Marcius শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছেন, গৃহে বীরপুত্রের বীর-মাতা Volumnia পুত্রবধূ Virgiliaকে বলিতেছেন—

"I pray you daughter, sing; or express yourself in a more comfortable sort. If my son were my husband, I would freelier rejoice in that absence wherein he won honour than in the embracements of his bed where he would show most love. When yet he was but tender-

bodied, and the only son of my womb, when youth with comeliness plucked all gaze his way, when for a day of kings' entreaties a mother should not sell him an hour from her beholding, I,—considering how honour would become such a person, that it was no better than picture-like to hang by the wall, if renown made it not stir, was pleased to let him seek danger where was like to find fame. To a cruel war I sent him; from whence he returned, his brows bound with oak. I tell thee, daughter, I sprang not more in joy at first hearing he was a man-child than now in first seeing he had proved himself a man.

Virgilia.—But had he died in the business, madam; how then?

Vol.—Then, his good report should have been my son; I therein would have found issue. Hear me profess sincerely: Had I a dozen sons, each in my love alike, and none less dear than thine and my good Marcius, I had rather had eleven die nobly for their country than one voluptuously surfeit out of action.

Coriolanus, Act I, Sc. III.

এইরূপ বীরমাতার ছবি জনা ব্যতীত গিরিশনাটকের অন্যান্য মাতৃচরিত্রেও অভিব্যক্ত হইয়াছে। অভিমন্যু-জননী সুভদ্রা উত্তরাকে বলিতেছেন—

"জান না বালিকা তুমি ক্ষত্রিয়-নিয়ম ?
সঙ্কট মরণ রণ—অঙ্গ-আভরণ ;
তপ করি যাচে যোগ্য অরি,
পতিপুত্র যায় রণে
বীরাঙ্গনা সাজায় সমরসাজে ;
ঘোর রণভূমে ভ্রমে বীরকুলনারী
সারথি হইয়ে রথে,
কাটে বেণী বিনাইতে গুণ ;
কাঁদায়ে সন্তানে
খুলে দেয় আভরণ রণব্যয় হেতু।"

তবে মাতৃত্বের এই অভিব্যক্তি জনা-চরিত্রেই জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। ফাল্গুনীর সম্মুখীন হইবার জন্য বীরপুত্রকে অনুমতি প্রদান করিতে জনা প্রথমে সম্মত হন নাই। এই সময়কার তাঁহার অন্তরের ভাবদ্বন্দ্ব, তাঁহার সুচিন্তিত যুক্তি তাঁহারই অনুরূপ গাম্ভীর্য্যপূর্ণ। জনা বলিতেছেন—

"বৎস, ত্যজ মনস্তাপ,
প্রবলপ্রতাপ পাণ্ডব ফাল্গুনী শুনি।
তুমি নৃপতির নয়নের নিধি—
তাই রাজা নিবারে তোমারে
সমরে যাইতে যাদুমণি !

বলবানে পূজাদান আছে এ নিয়ম,
রণস্থলে বীর করে বীরের আদর;
শুনিয়াছি নরনারায়ণ ধনঞ্জয়—
লজ্জা নাহি হেন জনে সম্মান-প্রদানে।"

প্রবীর যতই বলিতেছেন—

"মাতৃনাম অক্ষয় কবচ বুকে
সম্মুখসমরে বিমুখ কে করে মোরে।"

জনার ততই কেবল পুত্রের অকল্যাণ-ভাবনায় প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতেছে। কিন্তু প্রবীর যখন মাতাকে বলিলেন যে, ভীরুতার অপবাদ লইয়া তিনি কখনই জীবনধারণ করিবেন না, তাঁহার মাতাও তো ক্ষত্রিয়রমণী—

"কে কোথায় ক্ষত্রিয়রমণী
সন্তানে অঞ্চলে ঢাকিয়া রাখে?"

তখনই বীর জননী জনার প্রসুপ্ত মাতৃত্ব আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। পুত্রের হইয়া জনা স্বামীর সঙ্গে বহু তর্ক করিলেন—অনেক করিয়া বুঝাইয়া বলিলেন—

"পুত্রবর চায় রণে যেতে
পরাজিতে দাম্ভিক অরিরে,
মন্দ যদি তায় কভু হয় নরনাথ
না করিব বিন্দু অশ্রুপাত;

প্রফুল্ল নয়নে
নন্দনে হেরিব রণ-স্থলে ;
বীরমাতা পুত্রের বীরত্ব করে সাধ।
যদি হয় জয়, পূজা লোকময়
পাইবে নন্দন মম।
উচ্চ কার্য্যে ব্রতী সুতে কভু না বারিব,
তুমিও না নিবার রাজন্।"

জনার এই উক্তির সহিত *Queen-Mother*-এর নিম্নোক্ত নারীহৃদয়ের সাহস ও বীরত্বব্যঞ্জক বাক্যাবলীর তুলনা করিলে উভয়ের মধ্যে একটি সুন্দর সাদৃশ্য—একটি অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য আমরা দেখিতে পাই। *Queen-Mother*-এর Catharine De' Medici বলিতেছেন—

"I must push him yet,
Make his sense warm. You see, blood is but blood;
Shed from the most renowned veins o' the world,
It is no redder; and the death that strikes
A blind broad way among the foolish heaps
That make a people up, takes no more pains
To finish the large work of highest men;
Take heart and patience to you; do but think
This thing shall be no heavier then, being done,
Than is our forward thought of it."

Act II, Sc. I.

রাজা নীলধ্বজ পত্নীর তেজময়ী উক্তি শুনিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার একমাত্র ভয় কৃষ্ণার্জ্জুনকে। বীরাঙ্গনা পত্নীর ক্ষত্রিয়-রমণীর যোগ্য অনুরোধও তাঁহার এই ভয়কে দূরীভূত করিতে পারিল না—তিনি কৃষ্ণার্জ্জুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে পুত্রকে অনুমতি প্রদান করিতে পারিলেন না। অধিকন্তু ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি যখন বলিলেন—

"রণ যদি আকিঞ্চন তব বীরাঙ্গনা
যাও রণে নন্দনে লইয়ে
জেনে শুনে করিব না নারায়ণে অরি।"

তখন পুত্র-গর্ব্বে গর্ব্বিত জনা দৃপ্তস্বরে উত্তর করিলেন—

"দেহ আজ্ঞা,—যাব রণে নন্দনে লইয়ে
আজ্ঞা মাত্র চাই ;
এক গোটা পদাতিক সঙ্গে নাহি লব ;
তনয়ে করিব রথী সারথি হইব,
নারায়ণে ভেটিব সম্মুখ-রণে।"

বীরাঙ্গনা জনার প্রাণে সম্মুখীন প্রবল শত্রুর অপরাজেয় শক্তি, অপ্রতিহত সমর-কৌশল কিছুই বিন্দুমাত্র স্থান প্রাপ্ত হয় নাই—জাগিয়াছে শুধু ক্ষত্রিয়-রমণীর স্বাভাবিক কর্ত্তব্য-বোধ—পুত্রগর্ব্বে গর্ব্বিত মাতৃত্ব। তাই তিনি স্বামীকে বলিতেছেন—

"রাজ্য ছার, জীবন অসার,
অতুল গৌরব ভবে রাখ নরবর
কৃষ্ণসখা অর্জ্জুনের সনে বাদ করি।"

মাতৃহৃদয় কখনই পুত্র-বিচ্ছেদ-বেদনার তীব্র দংশনজ্বালা অনুভব না করিয়া পারে না। তাই পূজাগৃহে যখন থাকিয়া থাকিয়া তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতে চাহিল, তখন পাছে পুত্রের অকল্যাণ হয় এই ভাবিয়া দৃঢ়চিত্তে অশ্রুজল রোধ করিয়া—অন্তরের বেদনা অন্তরেই চাপিয়া রাখিয়া সুতীক্ষ্ণ ছুরিকাঘাতে তিনি নিজ বক্ষ বিদীর্ণ করিতেও প্রস্তুত, তথাপি তাঁহার পণ,

"রণ, রণ, রণ"

স্বামীর বাধা জনা অতিক্রম করিলেন বটে, কিন্তু নূতন প্রতিবন্ধক হইলেন পুত্রবধূ মদনমঞ্জরী।

তিনি তাহাকেও বীরজায়ার কঠোর কর্ত্তব্য বুঝাইতেছেন—

"ক্ষত্রিয়ের নিত্য বাধে রণ,
জয় পরাজয়—
যুদ্ধে কিছু নাহিক নিয়ম,
যদি শুনে থাক পাণ্ডব-কাহিনী
দ্রুপদনন্দিনী এলাইল বেণী
স্বামিগণে সমরে উৎসাহ দিতে।
গভীর নিশায় বিরাট-আলয়ে
রন্ধনশালায় পশি,
ভীমে কৈল উত্তেজনা বধিতে কীচকে;
শত ভাই কীচক নিধন তাহে।
উত্তর-গোগৃহ-যুদ্ধে একক অর্জ্জুনে
বিরোধিতে রামজয়ী ভীষ্মদেব সনে
পাঠাইল বীরাঙ্গনা;

বীরপত্নি, নিরুৎসাহ ক'র না পতিরে,
বীরকার্য্যে ব্রতী তব পতি,
নিজকার্য্যে রহ গুণবতি।
ত্যজি ভয়, ক্ষত্রিয়তনয়া,
উচ্চকার্য্যে স্বামীকে উৎসাহ কর দান।"

Volumnia যুদ্ধে প্রিয়পুত্রের ক্ষতবিক্ষত দেহ কল্পনা করিয়া যেমন বলিতেছিলেন—

"His bloody brow
With his mail'd hand then wiping,
forth he goes,"

পুত্রবধূ Vergilia স্বামীর কাল্পনিক রক্তাক্ত কপোল স্মরণ করিয়া চমকিয়া উঠিলেন—

"His bloody brow ! O Jupiter ! no blood."

পুত্রবধূর বিচলিতভাব দর্শন করিয়া দৃপ্তকণ্ঠে Volumnia বলিতেছেন—

"Away, you fool ! it more becomes a man
Than gilt his trophy. The breasts of Hecuba,
When she did suckle Hector,
look'd not lovelier
Than Hector's forehead when it spit
forth blood
At Grecian swords, contemning.

Volumniaর মত জনাও স্বামীর অকল্যাণে আশঙ্কাতুরা পুত্রবধূকে তেজোদীপ্ত কণ্ঠে বলিতেছেন—

"এনেছি কি পুত্রবধূ নীচকুল হ'তে ?
যুদ্ধকার্য্য নিত্য যেই ঘরে,
আছে সদা অমঙ্গল আশঙ্কা সর্ব্বদা ;
কিন্তু তোর সম
শুনি দূর সমীরণ-ধ্বনি
রোদনের ধ্বনি অনুমানি
অকল্যাণ চিন্তা কেবা করে ?
অরে হীনমতি,
পতিভক্তি এই কি তোমার !
কেবা সে অর্জ্জুন ? কেবা নারায়ণ ?
পতি শ্রেষ্ঠ সবা হতে।"

শেষোক্ত পঙ্‌ক্তিতে পুত্র-গৌরবে গর্ব্বিত মাতৃহৃদয়ের পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি আমরা দেখিতে পাই।

জনা ক্ষত্রিয়-রমণী, বীরপুত্রের বীরজননী। পুত্রকে যুদ্ধ-যাত্রায় অনুমতি প্রদান করিয়াই তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ হয় নাই—সৈন্যদলকে বীরের কর্ত্তব্যে উদ্বুদ্ধ করিতেও তিনি অগ্রসর হইয়াছেন। নিশাবসানে শত্রু আক্রমণ করিবে জানিয়াও যে মাহিষ্মতী-সৈন্য—

"আছে সবে জম্বুক সমান দাঁড়াইয়া
প্রাতে অরি আক্রমিবে পুরী,
উৎসাহ-বিহীন আছে পুতলী সমান।"

জনা তাহাদিগকেও তাঁহার উদ্দীপনাময়ী বাণীতে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন—রণোল্লাসে মাতাইয়া দিয়াছেন। তাহারা এখন—

"মহোল্লাসে গর্জ্জে শুন মাহিষ্মতী-সেনা
বীরমদে মত্ত জনে জনে
শমন সমান সবে প্রবেশিবে রণে।"

তারপর বীরমাতার বীরপুত্র প্রবীর অর্জ্জুনের সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধে অন্যায়ভাবে নিহত হইলেন। অন্যায় যুদ্ধে প্রবীরের মৃত্যুকে কেন্দ্র করিয়া গিরিশচন্দ্র জনা-চরিত্রের একটি অপূর্ব্ব বিচিত্র দিক্ পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন। প্রতিহিংসানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে মাতৃহৃদয়ের স্নেহের উৎস আপনিই উৎসারিত হইয়া দুই কূল ছাপাইয়া ছুটিয়া চলে। সেই প্রবল স্রোতে পার্থিব সমস্ত বন্ধন ভাসিয়া যায়, পুত্রশোকাতুর জননীর দীর্ঘশ্বাসে শত্রুনিপাত হয়। এইখানেই Volumniaর সহিত জনার পার্থক্য। Volumniaর যুক্তিপূর্ণ বাণীতে প্রবুদ্ধ হইয়া পুত্র Caius Marcius-এর জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্ত্তনেই *Coriolanus* নাটকের শেষ। গিরিশচন্দ্রের জনায় কিন্তু প্রবীর-পতনের পরেই মাতৃচরিত্র পরিপূর্ণরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রবীর-পতনের পরেই গিরিশচন্দ্র নাটকখানিকে শেষ না করায় অনেকে দুঃখিত হইয়াছেন। কিন্তু প্রবীর-পতনের পরেই যদি "জনা" নাটকের পরিসমাপ্তি হইত, তাহা হইলে মাতৃত্বের পূর্ণ অভিব্যক্তি দেখিবার সৌভাগ্য আমাদের হইত না। প্রবল শত্রুর হস্তে অন্যায় সমরে বীরপুত্রের মৃত্যুতে বীরাঙ্গনা মাতার পুত্র-শোকাতুর হৃদয় প্রতিহিংসার আকাঙ্ক্ষায় কিরূপ পাষাণ

সদৃশ কঠোর হইয়া উঠে, জনার নিম্নোদ্ধৃত বাক্যাংশ হইতে পাঠক তাহার আভাস পাইবেন।—

মমতা এস না বক্ষে মম!
জ্বল জ্বল রে অনল—
প্রতিহিংসানল জ্বল হৃদে!
পুত্রহন্তা জীবিত রয়েছে,
মমতার নহে ত সময়।
নখাঘাতে উৎপাটন করিব নয়ন,
বিন্দু বারি যেন নাহি ঝরে।
বীর-অবতার,
অসহায় পড়েছে কুমার,
প্রেত-আত্মা তার—
নিত্য আসি মা ব'লে ডাকিবে,
নিত্য আসি করিবে ভর্ৎসনা,
'পুত্রহন্তা অরি তোর জীবিত এখনো'।
শোণিতের সনে বহ গরল-প্রবাহ,
বৈশ্বানর খেল শ্বাস সনে,
পুত্রহন্তা বৈরীরে নাশিতে।
চক্ষু হ'তে প্রলয় অনল ছোট',—
হিংসা-তৃষা শুষ্ক কর হিয়া,
কক্ষচ্যুত হও দিনকর,
উঠ রে প্রলয়ধূম বিশ্ব আবরিতে
পুত্রঘাতী অরাতি জীবিত।
ঘুমাও নন্দন, অগ্রে করি বৈর-নির্য্যাতন
শোব শেষে তোরে ধরি কোলে।

মহাভারতের অশ্বমেধপর্ব্বের সামান্য আভাস লইয়া মাইকেল মধুসূদন দত্ত "বীরাঙ্গনা কাব্যের" একাদশ সর্গে 'নীলধ্বজের প্রতি জনা' রচনা করিয়াছেন। উহার—

"সাজিছ কি মহারাজ!
যুঝিতে সদলে
প্রবীর পুত্রের মৃত্যু প্রতিবিধিৎসিতে?"

অন্যত্র—

"অন্যায় সমরে মূঢ় নাশিল বালকে,"

আবার—

"ছাড়িব এ পোড়া প্রাণ জাহ্নবীর জলে,"

এই কয়েকটি কথার আভাস লইয়াই গিরিশের 'জনা' নাটকখানি গড়িয়া উঠিয়াছে, কিন্তু চরিত্রের পরিকল্পনা ও ঘটনার সৃষ্টি গিরিশচন্দ্রের সম্পূর্ণ নিজস্ব। মাইকেল জনার মুখে কুন্তী, অর্জ্জুন, দ্রৌপদী, কৃষ্ণ ও ব্যাসের প্রতি যে কটূক্তি বর্ষণ করিয়াছেন, তাহা মার্জ্জিত রুচিসম্মত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের নীলধ্বজের প্রতি জনার উক্তি অত্যন্ত মহিমময় dignified. কয়েকটি মাত্র ছত্রেই স্ত্রী-চরিত্রের গৌরব ও মর্য্যাদা সম্পূর্ণভাবে সংরক্ষিত হইয়াছে। জনা বলিতেছেন—

আনন্দ উৎসব
দেখিলাম নগরে, রাজন্!
মহোৎসব মহা আয়োজন
কার অভ্যর্থনা হেতু?

বৈরী জিনি আসিছে কি প্রবীর কুমার ?
কিংবা রাজা সাজিছে বাহিনী
পুত্র-নাশ প্রতিবিধিৎসিতে ?

জনার উক্তি সম্পূর্ণরূপে এখানে উদ্ধৃত করিতে আমরা পারিলাম না। তাই পাঠককে অনুরোধ করিতেছি সম্পূর্ণ উক্তিটি পাঠ করিয়া জননী ও পত্নীরূপে জনা-চরিত্রের উজ্জ্বল চিত্রটি উপভোগ করুন। গিরিশচন্দ্র এখানে দুইটি বিরুদ্ধ ভাবের চিত্র পাশাপাশি অঙ্কিত করিয়াছেন। দুইটি বিরুদ্ধ সৃষ্টির সঙ্ঘাতে গিরিশচন্দ্রের অপূর্ব্ব যুক্তিকৌশলের অনুপম মাধুর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। এক দিকে পুত্রশোকের ভীষণ বেদনাতুর অবস্থাতেও নীলধ্বজ আনন্দিত, কেন-না কৃষ্ণ-সখা অর্জ্জুন আসিয়া সখা ভাবে তাঁহাকে সমাদর করিয়াছেন। আর এক দিকে জনার লজ্জা—স্বামী পুত্রঘাতীর শরণাপন্ন—বিজয়ী শত্রুর কৃপাপ্রার্থী। ক্ষত্রিয়পত্নী জনা স্বামীর দুর্ব্বলতাকে লক্ষ্য করিয়া যে শ্লেষোক্তি করিয়াছেন, তাহা এক দিকে যেমন বড়ই তীব্র, আর এক দিকে আবার তেমনি গরীয়ান্। জনা বলিতেছেন,—

ভাল সখা মিলেছে তোমার !
জান না কি, হীন জ্ঞানে ফাল্গুনী আসিয়ে
আতিথ্য করিল অঙ্গীকার !
যাও তবে হস্তিনা নগরে—
অশ্বমেধে হইও সহায় ;
তথা বহু কার্য্য আছে তব,—

ব্রাহ্মণ-ভোজনে যোগাইবে বারি,
নহে দ্বারী হ'য়ে বসিয়ে দুয়ারে,
সখ্যতার দিবে পরিচয় ;
উচ্চাসনে বসিয়াছে রাজা যুধিষ্ঠির,
পদ-প্রান্তে বস গিয়ে তার !
হতো ভাল, পারিতে যদ্যপি
আমারে লইয়া যেতে দ্রৌপদী-সেবায় ।

নীলধ্বজ এবং জনার কথোপকথনের মধ্য দিয়া গিরিশচন্দ্র কৃষ্ণভক্তির একটি সুন্দর ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। কৃষ্ণের পদানত হওয়াই কৃষ্ণভক্তি নয়, মনুষ্যত্ব প্রদর্শনই কৃষ্ণের অভিপ্রেত—এই কথাটিই জনা কয়েকটি দৃষ্টান্ত দ্বারা স্বামীকে বুঝাইতেছেন। নীলধ্বজ যখন বলিলেন,—

কৃষ্ণদরশন পাব পাণ্ডব-কৃপায় !

তখন জনা স্বামীর কৃষ্ণ-দর্শন-স্পৃহার মূলে পুত্রঘাতী শত্রুর নিকট হীনতা-স্বীকার লুক্কায়িত রহিয়াছে বুঝিতে পারিয়া দৃপ্ত কণ্ঠে বলিতেছেন—

ধন্য ধন্য কৃষ্ণ-ভক্তি তব !
কৃষ্ণ-ভক্ত ছিল না কি শান্তনুনন্দন ?
জানিত সাক্ষাৎ নারায়ণ,
জানিত নিশ্চয় পরাজয়,
তবু বীরপণে ধরি ধনুর্ব্বাণ
হরিবক্ষে করিল সন্ধান,
মুরারির প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিল,
রথচক্র ধরাইল কুরুক্ষেত্র-রণে ।

বীরবর সূর্য্যের নন্দন,
হরিপূজা ক'রেছিল পুত্রে দিয়ে বলি,
হরিভক্ত কেবা তার সম ?
কিন্তু সম্মুখ-সমরে, শরাসন করে
নিবারিল শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনে,—
রাখিল ক্ষত্রিয়-কীর্ত্তি ভারত-সংগ্রামে।
জানিত নিশ্চয়, দিলে পরিচয়,
যুধিষ্ঠির বসাইত সিংহাসনে ;
কিন্তু অরাতি-তপন,
মাতৃবাক্য করিল হেলন,
কৃষ্ণে উপেক্ষিল,
প্রাণপণে কৌরবে রাখিল।
হরিভক্তি নহে রাজা হীনতা স্বীকার।
বাঁধ বুক, ধর ধনু, প্রবেশ সমরে।

পুত্রহন্তার প্রতি প্রতিহিংসায় উত্তেজিত হইয়াও জনা যুক্তিতর্কে যে ধীরতা ও গাম্ভীর্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা Volumniaর যুক্তি অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহে। কিন্তু তাঁহার প্রতিহিংসাপরায়ণতার তুলনা কোথাও মিলে না।—

দেখিবে জগতে
পুত্রশোকাতুরা নারী ভীষণা কেমন !
সিংহিনীর দন্ত কাড়ি লব,
ফণিনীর গরল হরিব,
শোক-বলে বজ্র-অগ্নি নেব আকর্ষিয়ে !

জনার মৃত্যুর মধ্যেও গিরিশচন্দ্র মাতৃত্বের একটি বিশেষ ভাব পরিস্ফুট করিয়াছেন। পুত্রবৎসলা নারীর প্রাণসম প্রিয় পুত্র শত্রু-হস্তে অন্যায় সমরে নিহত, স্বামী আবার সেই পুত্রহন্তা অরাতিরই শরণাপন্ন—তাহার সখ্য লাভ করিয়া কৃতার্থ সংসারে তাহার আর রহিল কি? মাতৃত্বেই নারীর পূর্ণ বিকাশ। সেই মাতৃত্ব যখন পুত্র-শোকের তীব্র যাতনায় অভিরঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে, সেই বিক্ষুব্ধ মাতৃত্ব যখন স্বামীর নিকট হইতে আর এতটুকু সহানুভূতি ও সান্ত্বনা লাভ করিতে পারিল না, তখন সংসারে আর তাহার স্থান কোথায়? তাই ক্ষীণপ্রাণা স্বাহার মাতৃসম্বোধনও আর তাঁহাকে তৃপ্ত করিতে পারিল না।—

পুত্র, পুত্রবধূ মম পড়িয়ে শ্মশানে,—
ফুরায়েছে মা বলা আমার।

তাই জনা চলিয়াছেন মহাশ্মশানের দিকে।—

দূরে—দূরে—
দিক্-অন্তে নিশার আলয় যথা,
যথা একাকার প্রলয়-হুঙ্কার
উঠিতেছে রহি রহি,
নাহি যথা সৃষ্টির অঙ্কুর,
দৃষ্টিহীন দিবাকর!
যথা নিবিড় আঁধারে
ঘোর রোলে পরমাণু ঘূর্ণ্যমান—
যথা জড়জড়িমায় প্রকৃতি জড়িত—
ঘোর ধূমমাঝে,

চলে প্রলয়-জীমূতশ্রেণী,
বজ্র-অগ্নিধারা ঝরে !
যথা ঘোর হাহাকার, পিনাকটঙ্কার—
করি স্থান পান শূলকরে মহারুদ্র ধায়,

যথা,—

আভাহীন বহ্নি জ্বলে ঈশানের ভালে
প্রলয়বিষাণ নাদে !
দূরে—দূরে—চল ত্বরা পুত্রশোকাতুরা।

জনার মাতৃত্বের মধুর সুধাধারা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে শেষ দৃশ্যে—সহোদর উলুকের প্রতি কয়েকটি কথার মধ্যে। উলুক যখন বলিতেছেন, "সংসার অসার, গোবিন্দের পাদপদ্ম সার !" পুত্রশোকাতুরা জনার মাতৃহৃদয় তখন পুত্রস্নেহে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে—

জানি আমি সমুদায়,
কিন্তু তুমি জান কি মায়ের প্রাণ ?
*　*　*　*
জাগে মার মনে—
নিরাশ্রয় শিশু
কোলে শুয়ে করে স্তন্য পান ;
জাগে মার মনে—
খুলে দু'টি প্রফুল্ল নয়ন
মার মুখ চেয়ে বিধুমুখে মৃদু হাসে ;
জাগে মার মনে—
আধভাষে মাতৃ-সম্ভাষণ,
*　*　*　*

করিলে তাড়না,
ক্ষুদ্র করে নয়ন মুছিয়ে
ভরে হেরে মায়ের বদন,
জাগে সে নয়ন মনে।

* * * *

হত পুত্র শত্রুর কৌশলে,
পতি-প্রাণা পুত্রবধূ লুটায় ধরায়,
মা হ'য়ে এ স্বচক্ষে দেখেছি!
জান না, ধর নি গর্ভে তারে,
জান না—জান না,—
কি বেদনা বেজে আছে বুকে।

পুত্র-শোকাতুর মাতৃ-হৃদয়ের এই অভিব্যক্তি কি সুন্দর, কি মধুর! গিরিশ-জননীর মমতাময়ী মাতৃ-হৃদয়ে পুত্র-স্নেহের যে অন্তঃসলিলা ফল্গুধারা প্রবাহিত ছিল তাহাই অলক্ষিতভাবে গিরিশচন্দ্রের জীবনে অতুলনীয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তাই, এমন সুন্দর, এমন মধুর মাতৃ-মূর্ত্তি তিনি অঙ্কিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

জনা-চরিত্রে মাতৃত্বের সহিত বীরাঙ্গনার বীরত্বও সমভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বীর প্রবীরের জননী বীরাঙ্গনা ভিন্ন আর কি হইতে পারেন! Volumnia এবং Catharine De' Mediciও বীরাঙ্গনা—মাতৃত্বের সুমধুর অভিব্যক্তিতে তাঁহাদের চরিত্রও উজ্জ্বল। তাই তাঁহাদের সহিত জনা-চরিত্রের তুলনা-মূলক আলোচনা করিবার প্রয়াস আমরা পাইয়াছি। সাধারণ মাতৃ-হৃদয় বুঝিতে হইলে 'চন্দ্রা' উপন্যাসের সোমনাথের মাতা,

গোবরার মাতা এবং কুনালের মাতা পদ্মাবতীর চরিত্র আলোচনা করা প্রয়োজন। জনা, Volumnia প্রভৃতি ছিলেন বীরমাতা—বীরপ্রসবিনী। বীর-মাতার ন্যায়ই তাঁহাদের চরিত্র বিকশিত হইয়াছে। তাঁহাদিগকে বুঝিতে হইলে তাঁহাদের বীর-জননী রূপটি বিশ্লেষণ করিয়াই বুঝিতে হইবে।

জনা-নাটক-রচনার কিছু পূর্ব্বে গিরিশচন্দ্র সেক্‌স্‌পিয়র-রচিত "ম্যাক্‌বেথ" নাটকখানি বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনয় করেন। অনুবাদ এবং অভিনয় উভয়ই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইলেও এই নাটকখানি সর্ব্বসাধারণের মন তেমন ভাবে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। গিরিশচন্দ্র বুঝিলেন দেশের ভাবধারা-অবলম্বনে নাটকের প্লট এবং চরিত্র অঙ্কিত না হইলে নাটক দেশের লোকের হৃদয় স্পর্শ করিতে সমর্থ হইবে না। তাই তিনি লেডি ম্যাক্‌বেথের উন্নত হৃদয়ের কিঞ্চিৎ ছায়া অবলম্বনে ভারতীয় পুরাণ এবং কাব্য হইতে সামান্য উপাদান সংগ্রহ করিয়া স্বীয় প্রতিভা এবং শিল্পচাতুর্য্য দ্বারা অপূর্ব্ব জনা-চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। জনা-চরিত্র-সৃষ্টিতে অন্য কবি বা স্রষ্টার প্রভাব অপেক্ষা গিরিশচন্দ্রের নিজের চরিত্র-প্রভাবই অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছে। বিশেষ ভাবে লক্ষ্য না করিলে জনার চরিত্র-সৃষ্টিতে অন্য কাহারও প্রভাব একেবারেই লক্ষিত হয় না। সমস্ত কবি এবং নাট্যকারের মধ্যে সেক্‌স্‌পিয়র গিরিশচন্দ্রের সম্পূর্ণরূপে অধীত এবং অধিকৃত হইলেও গিরিশ-চন্দ্রের চরিত্র-সৃষ্টি সম্পূর্ণ তাঁহার নিজস্ব। গিরিশচন্দ্রের সৃষ্ট কোন কোন চরিত্র সেক্‌স্‌পিয়র বা অন্য কোন নাট্যকারের সৃষ্ট চরিত্রের অনুরূপ হইলেও উহা যে অনুকরণ নহে তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

শিবাজী-জননী জিজিবাইএর চরিত্রে মাতৃত্ব আরও জ্বলন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। মমতাময়ী জননী সন্তানের হিতার্থে জীবনের কঠোরতম কর্ত্তব্যে সন্তানকে যে দীক্ষা প্রদান করিয়াছেন তাহার তুলনা আর কোথাও মিলে না। জিজিবাই বীরপুত্র শিবাজীকে বীরের যে কি নির্ম্মম কর্ত্তব্য তাহাই শিক্ষা দিতেছেন :—

"তোমার কার্য্য ভবানীর কার্য্য; তোমার মাতা নাই, পিতা নাই, ভাই নাই, বন্ধু নাই; যে ভবানীর কার্য্যে অগ্রসর সেই তোমার পিতা, সেই তোমার মাতা, সেই তোমার বন্ধু। মা ভবানীর নামে জানু পেতে ভবানীকে স্মরণ ক'রে আমি মুক্ত কণ্ঠে বল্‌ছি যে, দেবীকার্য্যে যদি আমার মস্তক ছেদন করা প্রয়োজন হয়, তৎক্ষণাৎ আমার মস্তক ছেদন ক'রো, তোমার মাতৃহত্যা হবে না, তোমার কোন অপরাধ হবে না।"

জিজিবাইএর আর একটি কথার মধ্যে মাতৃত্বের অমৃতময়ী নির্ঝরিণী-ধারার মৃদুমন্দ ধ্বনি এখনও যেন কানে বাজিতেছে। শিবাজী তখন দিল্লীশ্বর আওরঙ্গজেবের বন্দী, তনাজী প্রভৃতি মহারাষ্ট্র বীরগণ শত্রুকে আক্রমণ করিয়া জীবন বিসর্জ্জন দিতে কৃতসঙ্কল্প। এই সঙ্কট-সময়ে জিজিবাই তাহাদিগকে বৃথা প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া বলিতেছেন :—"শিবাজী জন্মভূমির হিতসাধনে তৎপর, তাই তোমাদের প্রিয়, নতুবা সে সামান্য নরদেহধারী। মহারাষ্ট্রের সঙ্কল্প নিস্ফল গৌরব নয়— গৌরব-কার্য্য-সম্পন্ন। অহেতু' শত্রুভয়ে অগ্নি-প্রবেশ তাদের সঙ্কল্প নয়।"

কঠোরতার বহিরাবরণের অন্তরালে জিজিবাইএর মাতৃ-হৃদয় যে সন্তান-স্নেহের পবিত্র স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলোকের ছটায়

উদ্ভাসিত হইয়া রহিয়াছে তাহার পরিচয় আমরা পাই যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থিত সন্তানের জন্ম তাঁহার অন্তরের ব্যথাব্যাকুলতার মধ্যে। কোমল-কঠোরে এমন সুন্দর মাতৃমূর্ত্তি বাঙ্গালা সাহিত্যে দ্বিতীয় আর একটিও আমরা দেখিতে পাই না।

"সীতার বনবাসে" নির্ব্বাসিতা সীতার আত্মজীবন রক্ষার মূলেও তাঁহার আসন্ন মাতৃত্বের প্রভাবই আমরা দেখিতে পাই। স্বামী যাহাকে নির্ব্বাসিতা করিয়াছেন নিজের জীবনের প্রতি মমতায় আর তাহার প্রয়োজন কি? স্বামী যাহাকে বন্ধন-মুক্তি দিয়াছেন, সেই অভিমানিনী পত্নী কিসের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া বাঁচিয়া থাকিবে? কিন্তু সীতার গর্ভে রহিয়াছে শুধু অযোধ্যা রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী নয়—শুধু স্বামীর বংশধর নয়, তাঁহার নিজের জীবনের শেষ অবলম্বন—নিজের সন্তান। সন্তানের জীবন রক্ষার জন্য মরা আর তাঁহার হইল না। সন্তানের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সীতার মাতৃহৃদয় জগজ্জননীর নিকট প্রার্থনা করিতেছে —

জগৎ-মাতা,
শিখাও গো দুহিতারে জননীর প্রেম।

বস্তুতঃ সীতা-চরিত্রে পুত্রস্নেহ ও মাতৃত্ব পতিভক্তির সহিত সমভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। গিরিশচন্দ্রের সৃষ্ট মাতৃ-চরিত্রসমূহের মধ্যে সীতা-চরিত্রের ইহাই বিশেষত্ব। ইতিপূর্ব্বে "গিরিশ-প্রতিভায়" এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি।

গিরিশচন্দ্রের জীবনে তাঁহার জননীর প্রভাবের কথা বলিতে গিয়া গিরিশ-নাটকে চিত্রিত বিভিন্ন মাতৃ-চরিত্রের আলোচনা এখানে আমরা করিয়াছি। বস্তুতঃ গিরিশচন্দ্রের জীবনে

তাঁহার জননী, পরমগুরু পরমহংসদেব এবং গুরুভ্রাতা স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব যেমন দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী এবং সমসাময়িক রূপস্রষ্টাদের প্রভাবও যে একেবারে দৃষ্টি-গোচর হয় না, তাহা নহে। কি সাহিত্যিক, কি কবি, কি নাট্যকার, কি কথাশিল্পী কেহই তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ও সমসাময়িক রূপস্রষ্টাদের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন না—গিরিশচন্দ্রও পারেন নাই। কিন্তু প্রতিভা সমস্ত প্রভাবকে অতিক্রম করিয়া নিজের অন্তর্নিহিত প্রেরণায় জগতে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া লয়। গিরিশচন্দ্রও এই বিশেষত্ব লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রকৃত পক্ষে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী এবং সমসাময়িক কথা-শিল্পিগণ তাঁহার নাট্য-প্রতিভার অভিব্যক্তির সাহায্য করিয়াছেন মাত্র। কিন্তু তাঁহার অনন্যসাধারণ নাট্যপ্রতিভা তাঁহাকে শুধু বাঙ্গালার নাট্যজগতের একটি বিশিষ্ট স্থানেই প্রতিষ্ঠিত করে নাই, তাঁহার সমসাময়িক এবং পরবর্ত্তী নাট্যকার এবং নটশিল্পিগণকেও বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। বাঙ্গালার নাট্যসাহিত্য আজও গিরিশচন্দ্রের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে নাই, বাঙ্গালার রঙ্গমঞ্চে আজও গিরিশচন্দ্রের যুগই চলিতেছে।

পৌরাণিক নাটকে

দ্বিতীয় অধ্যায়

গিরিশচন্দ্র প্রকৃতপক্ষে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ হইতেই লেখনী ধারণ করেন। প্রথমে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, বিষবৃক্ষ ও দুর্গেশনন্দিনী, মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্য, নবীনচন্দ্রের পলাশীর যুদ্ধ এবং রমেশচন্দ্র দত্তের মাধবীকঙ্কণ নাটকাকারে রূপান্তরিত করেন, 'গজদানন্দ' প্রহসনে প্রস্তাবনা ও গান সংযোজনা এবং কিছু কিছু Pantomime ও পঞ্চরং এর সৃষ্টি করেন, আর অকাল বোধন, দোললীলা, আলাদিন প্রভৃতি ক্ষুদ্র নাটিকা এবং রাসলীলা, মায়াতরু, মোহিনীপ্রতিমা প্রভৃতি গীতিনাট্য প্রণয়ন করেন। গিরিশচন্দ্রের প্রথম নাটক "আনন্দরহো" ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়। যদিও ইহাতে রাণাপ্রতাপের ত্যাগপুত-কাহিনীই বিবৃত হইয়াছে, তথাপি এই নাটক দর্শকগণের হৃদয় আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় নাই। নাটক হিসাবেও ইহার বিশেষত্ব কিছুই নাই। "আনন্দরহো" নামীয় চরিত্রের প্রকৃত মর্ম্ম দর্শকগণের নিকট দুর্ব্বোধ্য তো ছিলই, অধিকন্তু ভাষাও স্থানে স্থানে নাটকের উপযোগী হয় নাই। গিরিশচন্দ্রের দৃঢ় ধারণা জন্মিল যে সামাজিক ও জাতীয়তা-মূলক নাটকের সময় তখনও হয় নাই এবং নাটক সার্ব্বজনীন ভাবে রচিত না হইলে সর্ব্বসাধারণের নিকট সমাদৃতও হইবে না। আর এই সার্ব্বজনীনতা একমাত্র পৌরাণিক নাটকেই রক্ষিত হইতে পারে বলিয়া তিনি

মনে করিতেন; কারণ, পৌরাণিক কৃষ্ণ বা রাম-চরিত্র দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের নিকটেই পরিচিত। এ সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র "পৌরাণিক নাটক" শীর্ষক একটি প্রবন্ধও রচনা করিয়াছিলেন। পাঠক তাহার আভাস "গিরিশ-প্রতিভায়" প্রাপ্ত হইবেন।

বস্তুতঃ বিভিন্ন দেশের সাহিত্য আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, উচ্চ শ্রেণীর সমস্ত গ্রন্থই পোরাণিক আখ্যায়িকা-অবলম্বনে রচিত। হোমর এবং ভার্জ্জিলের বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ গ্রীসদেশের পৌরাণিক আখ্যায়িকা-অবলম্বনেই রচিত হইয়াছে। মিল্টনের Paradise Lost রচনার ভিত্তিও খৃষ্টীয় পুরাণে বর্ণিত পৃথিবীর আদিম মানব-মানবীর জীবন-কাহিনী। মাইকেল মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ', হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার'ও ভারতীয় পুরাণ-কাহিনীকে অবলম্বন করিয়াই রচিত হইয়াছে। এমন কি বঙ্কিমচন্দ্রের সীতারাম ও দেবী চৌধুরাণী এই দুইখানি শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের ভিত্তিও পৌরাণিক শ্রীমদ্ভগবৎ গীতা। গিরিশচন্দ্রও পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বন করিয়াই নাটক-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। "রাবণ-বধে" তাঁহার পৌরাণিক নাটক-রচনার আরম্ভ, আর পরিসমাপ্তি হয় গিরিশ-প্রতিভার শেষ অবদান "তপোবল" নাটকে। গিরিশচন্দ্রের লেখনী হইতে যে সকল পৌরাণিক ও ধর্ম্মমূলক নাটক প্রসূত হইয়াছে, 'গিরিশ-প্রতিভা' হইতে তাহাদের তালিকাটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।—

নাটকের নাম	প্রথম অভিনয়ের তারিখ	রঙ্গমঞ্চের নাম
রাবণ-বধ	১৮৮১, ৩০ জুলাই	ন্যাশনেল থিয়েটার, ৬ নং বিডন ষ্ট্রীট
সীতার বনবাস	১৭ সেপ্টেম্বর	ঐ

নাটকের নাম	প্রথম অভিনয়ের তারিখ	রঙ্গমঞ্চের নাম
অভিমন্যু-বধ	১৮৮১, ২৬ নভেম্বর	ন্যাশনেল থিয়েটার, ৬নং বিডন ষ্ট্রীট
লক্ষ্মণ-বর্জ্জন	„ ৩১ ডিসেম্বর	ঐ
সীতার বিবাহ	১৮৮২, ১১ মার্চ্চ	ঐ
ব্রজবিহার	„ ১২ এপ্রিল	ঐ
রামের বনবাস	„ ১৫ এপ্রিল	ঐ
সীতাহরণ	„ ২২ জুলাই	ঐ
পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস	১৮৮৩, ৩ ফেব্রুয়ারী	ঐ
দক্ষযজ্ঞ	„ ২১ জুলাই	ষ্টার থিয়েটার
ধ্রুবচরিত্র	„ ১১ আগষ্ট	ঐ
নলদময়ন্তী	„ ১৫ ডিসেম্বর	ঐ
কমলে কামিনী	১৮৮৪, ২৬ মার্চ্চ	ঐ
বৃষকেতু	„ ১৯ এপ্রিল	ঐ
শ্রীবৎস-চিন্তা	„ ৭ জুন	ঐ
চৈতন্যলীলা	„ ২ আগষ্ট	ঐ
প্রহ্লাদ-চরিত্র	„ ২২ নভেম্বর	ঐ
নিমাই-সন্ন্যাস	১৮৮৫, ১০ জানুয়ারী	ঐ
প্রভাসযজ্ঞ	„ ৯ মে	ঐ
বুদ্ধদেব-চরিত	„ ১৯ সেপ্টেম্বর	ঐ
বিল্বমঙ্গল	১৮৮৬, ১২ জুন	ঐ
রূপসনাতন	১৮৮৭, ২১ জুন	ঐ
পূর্ণচন্দ্র	১৮৮৮, ১৭ মার্চ্চ	এমারেল্ড থিয়েটার
বিষাদ	„ ৫ অক্টোবর	ঐ
নসীরাম	„ ২৬ মে	ষ্টার থিয়েটার
জনা	১৮৯৩, ২৩ ডিসেম্বর	মিনার্ভা থিয়েটার
করমেতি বাই	১৮৯৫, ১৮ মে	ঐ

নাটকের নাম	প্রথম অভিনয়ের তারিখ	রঙ্গমঞ্চের নাম
কালাপাহাড়	১৮৯৬, ২৬ ডিসেম্বর	ষ্টার থিয়েটার
পাণ্ডবগৌরব	১৯০০, ১৭ ফেব্রুয়ারী	ক্লাসিক থিয়েটার
শঙ্করাচার্য্য	১৯১০, ১৫ জানুয়ারী	মিনার্ভা থিয়েটার
অশোক	„ ৩ ডিসেম্বর	ঐ
তপোবল	১৯১১, ১৮ নভেম্বর	ঐ

উদ্ধৃত তালিকার পৌরাণিক নাটকগুলি দুইটি স্তরে বিভক্ত করিলেই গিরিশচন্দ্রের নাট্যপ্রতিভার ক্রমাভিব্যক্তি সহজেই পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইবে। প্রথম স্তর—রাবণ-বধ হইতে শ্রীবৎস-চিন্তা পর্য্যন্ত ; এবং বিল্বমঙ্গল হইতে তপোবল পর্য্যন্ত নাটকগুলি দ্বিতীয় স্তরভুক্ত। এই উভয় স্তরের সন্ধিস্থল চৈতন্যলীলা। দ্বিতীয় স্তরস্থিত নাটক বিল্বমঙ্গলের পাগলিনী, পূর্ণচন্দ্রের গোরক্ষনাথ, নসীরামের নসীরাম, রূপসনাতনের সনাতন, জনার বিদূষক, কালাপাহাড়ের চিন্তামণি, পাণ্ডবগৌরবের কঞ্চুকী, শঙ্করাচার্য্যে শঙ্করাচার্য্য, তপোবলে ব্রহ্মণ্যদেব প্রভৃতি চরিত্র এমন একটি ছাঁচে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে যে ঐ সকল চরিত্র আলোচনা করিলে মনে হয় গিরিশচন্দ্র যেন একটি ঐশ্বরিক ভাবের আভাস প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু চৈতন্যলীলার পূর্ব্ববর্ত্তী পৌরাণিক নাটকসমূহে এরূপ কোন চরিত্রের পরিকল্পনা দেখিতে পাওয়া যায় না। জনার বিদূষক ও পাণ্ডবগৌরবের কঞ্চুকী আর প্রথম স্তরের নলদময়ন্তীর বিদূষকের মধ্যে স্বর্গ-মর্ত্ত্যের প্রভেদ। দক্ষযজ্ঞে দক্ষ-চরিত্রে Paradise Lostএর Satanএর দম্ভ ফুটিয়া উঠিয়াছে সত্য, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত উপাদানের অভাবে Theory of Utility সংযোজিত হইয়াছে। ঠিক এই কারণেই শ্রীবৎস-চিন্তায় ছায়াপাত হইয়াছে ফরাসী বিপ্লবের। অতঃপর

মহাপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পাদস্পর্শে তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের আরম্ভ। তাঁহারই কৃপায় একদিকে গিরিশ যেমন নবজীবন লাভ করেন, তেমনি নাটকীয় উপাদান লাভেও পরিপুষ্ট হইয়া তাঁহার পরবর্ত্তী পৌরাণিক নাটকগুলিতে আত্মত্যাগী মহাপুরুষের বিশ্বপ্রেমাভাস ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকসমূহের মধ্যে এই পরিবর্ত্তনের ধারাটি উপলব্ধি করিতে হইলে তাঁহার তৎকালীন মানসিক অবস্থাও জানা আবশ্যক। যৌবনে গিরিশচন্দ্র হিউম, মিল প্রভৃতির প্রভাবে ঘোর সংশয়বাদী হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই সংশয়ের আবর্ত্তনে পড়িয়া দীর্ঘ চতুর্দ্দশ বৎসর তাঁহাকে ভয়ানক অশান্ত হৃদয়ে কাটাইতে হয়। বিদ্যাবুদ্ধির অভিমানে কাহাকেও তিনি গ্রাহ্য করিয়া চলিতেন না। এক দিকে যেমন প্রবাদ-প্রচলিত কালাপাহাড়ের মতই তাঁহার ব্যবহার হইয়া উঠিয়াছিল —সাধু-সন্ন্যাসীর লাঞ্ছনায়, দেবদ্বিজের প্রতি অশ্রদ্ধায় যেন জগাই-মাধাই-এর মতই দুর্ব্বৃত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, আর এক দিকে তাঁহার অশান্ত হৃদয় তেমনি জীবনের পরম শ্রেয় লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল। তাঁহার অন্তর-রাজ্যের এই বিচিত্র ভাব-দ্বন্দ্ব অতি উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে "চৈতন্য-লীলা" নাটকে। এক দিকে

বিজ্ঞান বিজ্ঞান—নাহি অন্য জ্ঞান,
ভাবে নর ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী,
লিখে দম্ভ ভরে—
ঈশজ্ঞান অনর্থের হেতু

অন্য দিকে বিজ্ঞানবিদের অন্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়ের ইঙ্গিত—

কিন্তু হায়, চিত্ত তার ঘোর অন্ধ অন্ধকারে।

এক দিকে বুদ্ধি-বলে তিনি ভাবিতেছেন—

বুদ্ধি তারে বলে
ভূমণ্ডলে ধার্ম্মিক সুজন সেই,

আর এক দিকে অনুতাপানলে দগ্ধ-হৃদয় জিজ্ঞাসা করিতেছে—

বিনা অহঙ্কার
বল, মাতা, পতন কাহার ?

এক দিকে যুক্তি আর এক দিকে ভক্তির অনাবিল ধারা-প্রবাহ—

ভক্তি-স্রোতে যুক্তি ভেসে যায়
হেরি তরঙ্গ-নিচয়
সভয় হৃদয়, বিজ্ঞান পলায় দূরে।

আবার এক দিকে দানব-প্রকৃতিসুলভ দম্ভ-অহঙ্কার আর এক দিকে "প্রেমে তাহা হবে পরাভূত" বলিয়া আন্তরিক বিশ্বাস —গিরিশচন্দ্রের আত্ম-জীবনের এই ভাব-দ্বন্দ্বের প্রতিচ্ছায়া চৈতন্য-লীলা নাটকে প্রতিফলিত হইয়াছে, আর উহা বিশেষভাবে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে জগাই-মাধাই চরিত্রে। মাধাই বলিতেছে, "মদ খেয়ে আমোদ করা কি যে-সে ব্যাটার কাজ ?" গিরিশচন্দ্র সেই অসাধারণ মানুষ হইবার প্রার্থনাই করিতেছেন। জগাই-মাধাই-চরিত্র গিরিশচন্দ্রের সংশয় ও বিশ্বাস, দুর্ব্বৃত্ততা ও

কোমলতা, পাষণ্ড-জনসুলভ প্রবৃত্তি ও দীনতার অপূর্ব্ব সমাবেশে গড়িয়া উঠিয়াছে। জগাই ও মাধাই দুইজনই মাতাল, কুক্রিয়াশক্ত ও দেবদ্বেষী—

দু'টি ভাই জগাই মাধাই
মোহ-ঘোরে ফেরে অন্ধকারে।

কিন্তু মাধাইএর মনে হরির প্রতি ঘোর বিদ্বেষ, আর জগাই যন্ত্র-চালিতের মতই চাহিতেছে হরিনাম করিতে। মাধাই 'মারিল', জগাই 'বারিল'। এই দুইটি চরিত্র সংশয়বাদী গিরিশের যুগপৎ বিরুদ্ধ মনোভাবের প্রতীক, তাই নাটক এত সরস হইয়া উঠিয়াছে। গিরিশচন্দ্রেরও দেবদ্বিজের প্রতি দারুণ বিদ্বেষ, কিন্তু আবার কে যেন তাঁহার অন্তরের অন্তস্তল হইতে ভগবানের দিকে তাঁহাকে আকর্ষণ করিতেছে। চৈতন্যদেবের অহেতুক অপার করুণায় পাপাত্মা জগাই-মাধাই যেমন পরিত্রাণ লাভ করিল, গিরিশচন্দ্রের হৃদয়ের দ্বন্দ্বও তেমনি মিটিয়া গেল শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণদেবের পবিত্র পাদস্পর্শে। কিন্তু এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে এবং উঠাও স্বাভাবিক যে, চৈতন্যলীলা লিখিবার সময় তিনি তো ঠাকুরের করুণা-লাভে বঞ্চিত ছিলেন, তাহা হইলে জগাই-মাধাই-উদ্ধারের বর্ণনা তিনি কিরূপে করিলেন? চৈতন্য-দেবের এই লীলাকীর্ত্তনে গিরিশচন্দ্রের অসহ্য মানসিক যন্ত্রণা, এবং ইহা হইতে মুক্ত হইবার ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষাই আমরা পরিস্ফুট দেখিতে পাই। তিনি যে অনাগত ভাবেরও অগ্রদূত ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি যেন পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, শীঘ্রই তাঁহার যাতনাময় দিনের অবসান হইবে—সংশয়ের দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত হইবার—ভক্তিবিশ্বাসের স্নিগ্ধোজ্জ্বল

আলোকে উদ্ভাসিত দিন আগত প্রায়। ইহার পরেই পরমহংস-দেব স্বয়ং আসিয়া থিয়েটার হইতে তাঁহার ভৈরবকে চিনিয়া লইলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের "চৈতন্যলীলা" অভিনয় দর্শনের পরেই গিরিশচন্দ্র তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তাই আমরা চৈতন্যলীলার পরবর্ত্তী সমস্ত নাটকই পরমহংসদেবের ভাবে অনুপ্রাণিত দেখিতে পাই। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন নাটকে এই ভাবের নিদর্শন পাওয়া যায় না।

"রাবণবধ," "সীতাহরণ" প্রভৃতি নাটকে রাবণচরিত্রের বিশেষত্বই প্রদর্শিত হইয়াছে। রাবণ সর্ব্বদাই দর্পী, মানই তাঁহার একমাত্র চরম লক্ষ্য। প্রাণের জন্যও মান বিসর্জ্জন দিতে তিনি প্রস্তুত নহেন। 'সীতাহরণ' নাটকের প্রথম কয়েকটি ছত্রেই এই চরিত্রটি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। মান-সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্রেরও বরাবরই ধারণা ছিল,—

> অপমান, মান আছে যার
> ভিখারীর মান কিরে ভিখারিণী ॥—দক্ষযজ্ঞ।

"প্রফুল্ল" নাটকেও যোগেশ বলিতেছেন, "মানের জন্য তুচ্ছ প্রাণ যেতই বা—মা, তুমি কাঞ্চন ফেলে কাঁচে গেরো দিয়েছ, মান খুইয়ে প্রাণের দরদ করেছ।"

গিরিশচন্দ্রের রাবণচরিত্রে দম্ভ, শৌর্য্য ও বীরত্ব যে মধুসূদনের মেঘনাদবধের রাবণ অপেক্ষা অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছে তাহা আমরা "গিরিশ-প্রতিভায়" আলোচনা করিয়াছি। গিরিশচন্দ্র রামচরিত্রও সম্পূর্ণ মানবীয় ভাব রক্ষা করিয়াই অঙ্কিত করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা "গিরিশ-প্রতিভায়" আছে বলিয়া এখানে আর তাহা উল্লিখিত হইল না।

গিরিশচন্দ্রের পূর্ব্বে কালীপ্রসন্ন সিংহই প্রথম পৌরাণিক নাটক "সাবিত্রী-সত্যবান্" (১৮৫৯, মার্চ্চ) প্রণয়ন করেন এবং "বিদ্যোৎসাহিনী থিয়েটারে" উহা অভিনীত হয়। ইহারও পূর্ব্বে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে তারাচাঁদ শিকদার "ভদ্রার্জ্জুন" নাটক প্রণয়ন করেন। এই নাটকের দুই একটি দৃশ্যে গদ্যে কথোপকথন ব্যতীত আর সমস্তই পয়ারছন্দে রচিত। পুস্তকখানিও নাটকত্ব-বর্জ্জিত। এ সম্বন্ধে History of the Indian Stage, Vol. IIতে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। ইহার পরবর্ত্তী নাটক মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'শর্ম্মিষ্ঠা।' শর্ম্মিষ্ঠার অভিনয়ে (১৮৫৯, সেপ্টেম্বর) বেলগাছিয়া থিয়েটারের যশঃসৌরভ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িলেও এবং নাটক হিসাবে ইহার কিছু কিছু গুণ থাকিলেও, নাটকখানির বিশেষত্ব খুবই কম। ইহার ভাষা কবিত্বপূর্ণ হইলেও নাটকোপযোগী হয় নাই। শ্রদ্ধেয় যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলেন "ইহার ভাব অনেক স্থলে কৃত্রিমতাপূর্ণ ....প্রচলিত যাত্রা প্রভৃতিতে যেমন নাটকীয় পাত্র আসিয়া শ্রোতার নিকটে আপনার সুদীর্ঘ কাহিনী বর্ণনা করিতে আরম্ভ করে, শর্ম্মিষ্ঠাতেও অনেক স্থলে সেইরূপ করা হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।"

শর্ম্মিষ্ঠা নাটকের পরবর্ত্তী কবি মনোমোহন বসু-বিরচিত 'রামাভিষেক নাটক' (১৮৬৮), 'সতীনাটক' (১৮৭১), ও 'হরিশ্চন্দ্র' (১৮৭৪) এবং হরলাল রায়-প্রণীত 'শত্রুসংহার' (১৮৭৪, ১২ ডিসেম্বর) উল্লেখযোগ্য পৌরাণিক নাটক। কবি মনোমোহন বসুর নাটকগুলি "বৌবাজার বেঙ্গল থিয়াটারে" এবং 'শত্রুসংহার' ন্যাশনেল থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল। নাটক হিসাবে 'শত্রুসংহার'ও কিছু সুখ্যাতি লাভ করিতে সমর্থ

হয়। অতঃপর গিরিশচন্দ্র তাঁহার অসামান্য নাটকীয় প্রতিভা লইয়া পৌরাণিক নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার রচিত পৌরাণিক নাটকাবলী তাঁহাকে পৌরাণিক নাট্যজগতের একচ্ছত্র সম্রাটের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছে। নাট্যসম্রাট্‌রূপে তাঁহার গৌরব ও প্রতিষ্ঠা আজ পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

গিরিশচন্দ্রের নাটকীয় প্রতিভার প্রথম উন্মেষের যুগে আর কেহ যে পৌরাণিক নাটক রচনা করেন নাই এমন নহে। এই সময়ে যাঁহারা পৌরাণিক নাটক রচনা করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ঘাটেশ্বরের জমিদার কেদার চৌধুরী এবং সুপ্রসিদ্ধ কবি রাজকৃষ্ণ রায়ের নামই বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। কেদার চৌধুরীর 'ছত্রভঙ্গ' নাটকের শেষ অভিনয় হয় (১৮৮৩-৮৪) প্রতাপ জহুরীর ন্যাশনেল থিয়েটারে এবং তাঁহার 'পাণ্ডব-নির্ব্বাসন' নাটকের অভিনয় উপলক্ষে গোপাললাল শীলের এমারেল্ড (১৮৮৭, ৮ অক্টোবর) থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা। বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত বিহারীলাল চট্টোপাধায়-প্রণীত "পাণ্ডব-নির্ব্বাসন," "শ্রীবৎসচিন্তা," "দুর্ব্বাসার পারণ," "রাজসূয় যজ্ঞ" প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য পৌরাণিক নাটক। রবীন্দ্রনাথের "বাল্মীকিপ্রতিভার" প্রথম অভিনয় হয় ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে। এই বৎসরেই নগেন্দ্রনাথ ঘোষের 'মহাশ্বেতা' এবং 'বিমুক্ত-বেণী-বন্ধন' রচিত হয়। আর পণ্ডিত হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের 'কুমার-সম্ভব' ইহার পূর্ব্বেই রচিত হইয়াছিল।

উপরে যে সকল নাট্যকারগণের নাম আমরা করিলাম তাঁহাদের মধ্যে রাজকৃষ্ণ রায়ই সমধিক সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার 'প্রহ্লাদচরিত্র' নাটকের এতই সমাদর হইয়া

ছিল যে যাত্রাওয়ালারা তাঁহার অনুকরণে প্রহ্লাদচরিত্র পালার অভিনয় আরম্ভ করে। এই যাত্রাভিনয় তৎকালে ঢাকা, ফরিদপুর প্রভৃতি অঞ্চলে 'নূতন যাত্রা' নামে অভিহিত হইত। বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত রাজকৃষ্ণ রায়ের 'প্রহ্লাদচরিত্র' গিরিশচন্দ্রের 'প্রহ্লাদচরিত্র' অপেক্ষাও অধিকতর যশ ও খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল। রাজকৃষ্ণ সুন্দর গান বাঁধিতে পারিতেন। তাঁহার রচিত প্রহ্লাদচরিত্রের অভিনয়ে যে অভিনেত্রী প্রহ্লাদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তিনি শুধু প্রহ্লাদের গানের জন্যই সাধারণের নিকট 'প্রহ্লাদ' আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন। রাজকৃষ্ণ রায়ের 'হরধনুর্ভঙ্গ' ও 'রামের বনবাস' উল্লেখযোগ্য পৌরাণিক নাটক।

গিরিশচন্দ্রের 'প্রহ্লাদচরিত্র' নাটকে বিশেষত্ব লক্ষিত হয় হিরণ্যকশিপুর চরিত্র-অঙ্কনে। এই নাটকখানি চৈতন্যলীলার সমসময়েই রচিত হয়, এই জন্য উহাতে কৃষ্ণদ্বেষী অথচ উন্নতকায়, উন্নতমনা এক বিরাট্ দৈত্য-চরিত্রের যেরূপ পরিকল্পনা হওয়া উচিত গিরিশচন্দ্রের লেখনীমুখে উহা সেইরূপ ভাবেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। হিরণ্যকশিপু কৃষ্ণকে সংহার করিতে চান, আবার তাঁহাকে তাঁহার অন্তরের মধ্যে পাইবার জন্যও তিনি ব্যগ্র। শত্রুভাবে হরিকে পাইতে চাহিয়া ক্রমে তাঁহারই জন্য কিরূপ ব্যগ্র ও উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছেন, কিরূপে অন্তিম সময়ে হরির সেই মোহনমূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার চরণে স্থান পাইয়াছেন, গিরিশচন্দ্র তাহা স্তরে স্তরে তাঁহারই নিজের সংশয়াকুলিত চিত্তের অন্তর্দ্বন্দ্ব, তাঁহার ব্যাকুলতা, 'কিন্তু মম অন্তরের কালি নাহি গেল'—বলিয়া তাঁহার সেই অনুতাপের ছায়াপাতে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু সাধারণ দর্শক হিরণ্যকশিপু-চরিত্রের এই

সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ বুঝিয়া উঠিতে সমর্থ হয় নাই। তাই তৎকালে এই নাটকখানি যোগ্য সমাদরলাভে বঞ্চিত ছিল।

'বুদ্ধদেব-চরিত' Edwin Arnoldএর Light of Asiaর ছায়াবলম্বনে রচিত। কিন্তু বুদ্ধদেব-চরিত্র এমন সরসভাবে রচিত হইয়াছে যে অন্য কোন বহিঃপ্রভাবের ছায়াপাত কণামাত্রও দৃষ্ট হয় না। বুদ্ধদেব জন্মের মত সংসার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছেন—যাইবার সময় একবার প্রেয়সী পত্নী ও নবজাত শিশুপুত্রের মুখ দেখিবার জন্য তাঁহার হৃদয় ব্যগ্র হইয়া উঠিতেছে, কিন্তু আবার মানবের জরামরণের দুঃখ দূর করিবার সুমহান্ ব্রতের কথা স্মরণ করিয়া স্নেহের বন্ধনকে ছিন্ন করিয়া দৃঢ়চিত্তে কর্ত্তব্যের পথে অগ্রসর হইতেছেন—এই হৃদয়-দ্বন্দ্বের চিত্রটি বড়ই মধুর, বড়ই সুন্দর, বড়ই প্রাণস্পর্শী। প্রথমে ভোগ, তারপর কঠোর সাধনা এবং সর্ব্বশেষে মধ্যপথ—নিয়মিত আচার-প্রতিপালন—জীবনের এই ক্রম-অভিব্যক্তিটি গিরিশচন্দ্রের সুনিপুণ তুলিকা-স্পর্শে সুন্দর হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিম্বিসারের রাজসভায় আত্মবলিদানেও তাঁহাকে সহস্র ছাগ বলিদান হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার মহতী প্রচেষ্টায় বুদ্ধদেব-চরিত্রের পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। বুদ্ধদেবের জন্মের কারণ-সম্বন্ধে প্রস্তাবনাটি গিরিশের সম্পূর্ণ নিজস্ব।

বিল্বমঙ্গল নাটকে বিল্বমঙ্গল-চরিত্রের বিপুল পরিবর্ত্তনের মূলে রহিয়াছে তাঁহার একনিষ্ঠ প্রেম। যে প্রেম একদিন তাঁহাকে বারাঙ্গনার প্রতি আসক্ত রাখিয়াছিল—যে প্রেমের জন্য তিনি শবকে কাষ্ঠখণ্ড মনে করিয়া তাহাই আঁকড়াইয়া ধরিয়া নদী পার হইয়াছিলেন, রজ্জু মনে করিয়া কালসর্পকে ধরিয়াই উপরে উঠিলেন—সেই একনিষ্ঠ প্রেমের ধারা যখন ভগবানের দিকে

প্রবাহিত হয়, তখন উহা কিরূপ মহান্ ভাবে অভিব্যক্ত হইয়া উঠে বিল্বমঙ্গলে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। বেশ্যাশক্তি, ব্যাকুলতা, বৈরাগ্য, পুনরায় আসক্তি, তীব্র বৈরাগ্য, ভাবসমাধি, নাম-সাধনা প্রভৃতি মানবীয় ভাবের বিভিন্ন স্তর বিল্বমঙ্গল-চরিত্রে সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভক্তিরসের সংমিশ্রণে নাটকীয় চরিত্র এমনই সরসতা প্রাপ্ত হইয়াছে যে, এইরূপ নাটক-রচনা একমাত্র গিরিশ-চন্দ্রের পক্ষেই সম্ভব। কালাপাহাড়, অশোক, শঙ্করাচার্য্য ও তপোবল নাটকও এই ভাব-অবলম্বনে রচিত। কালাপাহাড় কিরূপ ঘোর নাস্তিকতার মধ্য দিয়া ক্রমে ক্রমে ভগবৎ প্রেমিক হইয়া উঠিলেন—একবার প্রণয়িনীকে পাইবার বিপুল আগ্রহ, আবার তাহার প্রতি প্রবল বিতৃষ্ণা—একবার প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ করিবার দুর্জ্জয় আকাঙ্ক্ষা, আবার অনুতাপানলে দগ্ধ-হৃদয়—এই সকল বিভিন্ন বিরুদ্ধ ভাব, অনুকূল ও প্রতিকূল ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে, পুরুষকারের প্রচেষ্টায়—আশায় ও নিরাশায়—মোহে ও ত্যাগে কালাপাহাড়-চরিত্রের পরিপূর্ণ বিকাশ হইয়াছে। অবশেষে কালাপাহাড়ের সংশয় বিশ্বাসে এবং কাম প্রেমে পরিণত হইল। এইখানে নাট্যকলার অতি সুন্দর পরিস্ফুরণ হইয়াছে। শ্রেষ্ঠ সমালোচক দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ বলিয়াছিলেন, "শ্রেষ্ঠ-কলাবিদ্ Idealistও নয় Realistও নয়, সে Naturalist. রূপের ভিতর যখন আত্মার রসটি জাগিয়া উঠে তখনই তাহা সুন্দর। যখন মনকে রসের মধ্যে ডুবাইয়া দেওয়া হয় তখনই সুন্দর সুন্দর।" এই সুন্দরকে প্রকাশ করিবার জন্য কল্পকলার সৃষ্টি—এই শ্রেষ্ঠকলার অভিব্যক্তি কালাপাহাড় নাটকে। অশোক নাটকের মূলে ইতিহাস থাকিলেও তাহাও এই শ্রেণীর নাটক। ক্ষীরোদপ্রসাদের চণ্ডাশোক এবং গিরিশচন্দ্রের ধর্ম্মা-

শোকের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের মূলই যে ক্ষমা ও ত্যাগ তাহাই অশোক নাটকে প্রদর্শিত হইয়াছে এবং আরও প্রমাণ করা হইয়াছে যে, হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্ম মূলতঃ এক। কিন্তু অশোক-চরিত্রের ক্রম-অভিব্যক্তি—সংহার কার্য্যে ব্রতী, নিষ্ঠুর হৃদয়, দয়াহীন, ধর্ম্মহীন উত্তপ্তমস্তিষ্ক অশোকের ক্ষমাশীল, পরোপকারী, আত্মত্যাগী অশোকে পরিণতিই, এই নাটকের প্রধান বিশেষত্ব। বড়ই অদ্ভুত এবং বিচিত্র অবস্থার মধ্য দিয়া গিরিশচন্দ্র অশোক-চরিত্রকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। উন্নত-হৃদয় লইয়াই অশোক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রতি পিতার বিজাতীয় ঘৃণা এবং ভ্রাতার বিদ্বেষ—আঘাতের পর আঘাত তাঁহার হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করিয়া তুলে। শুধু তাই নয়—জনসাধারণ কর্ত্তৃকও তিনি পরিত্যক্ত। পিতার রাজ-সিংহাসনে তাঁহারই তো ন্যায্য অধিকার। কিন্তু তাঁহার ন্যায় বীরপুত্রকে উপেক্ষা করিয়া বংশের কুলাঙ্গার অকর্ম্মণ্য, অযোগ্য ব্যভিচারী পুত্র সুসীমের প্রতি পিতা পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিতেছেন, অশোকের দেহের রাজচক্রবর্ত্তিব্যঞ্জক জটুল চিহ্নকে কুষ্ঠ রোগ মনে করিয়া ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিতেছেন, পিতা হইয়া দিবারাত্র পুত্রের মৃত্যু-কামনা করিতেছেন—চারিদিক্ হইতে আঘাত পাইয়া অশোকের চিত্ত বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তিনি যে পাটলীপুত্রের অধীশ্বর হইবেন, এ শুধু তাঁহার আকাঙ্ক্ষা নয়—তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। কিন্তু পিতা বলিতেছেন—

"অধীশ্বর হবে? অধীশ্বর হবে? তুই আবার নগরে প্রবেশ করেছিস? তোর যে প্রাণ-বধের আজ্ঞা দেই নাই এই তোর প্রতি যথেষ্ট ক্ষমা! কুষ্ঠরোগী, নাপ্তিনী-পুত্র, দূর হ দূর হ—"

পিতার নিকট হইতে দারুণ আঘাত পাইয়া মর্ম্মন্তুদ যাতনায় অশোক চীৎকার করিয়া উঠিলেন—দয়ালু অশোকের প্রাণে নিষ্ঠুরতা জাগ্রৎ হইয়া উঠিল :—

কোথা ধর্ম্ম! নামে মাত্র আছ কি জগতে?
ভাগ্যহীন বহুজনে ধরে এ ধরণী;
কিন্তু অতি দীনজন
পিতৃ-স্নেহে বঞ্চিত নহেক কদাচন!
আত্মহত্যা উপায় কি মম?
বিদ্রোহী হৃদয়,
এত অপমানে ধৈর্য্য না ধরিতে পারে।
মাতৃস্নেহ, মাতৃবাক্য বন্ধন কেবল—
নহে প্রজ্জ্বলিত কোপানলে
ভস্মসাৎ করিতাম এ পাপ সংসার।
যেন এ পাপ-ধরায়,
পিতা-পুত্র পুনরায় সম্বন্ধ না হয়!
আজীবন পশু বা মানবে
সমভাবে করিয়াছি দয়া বিতরণ,
কিন্তু এবে রাখি যদি এ ঘৃণ্য জীবন,
স্তম্ভিত করিব ধরা নিষ্ঠুর আচারে।
দেখিব দেখিব,
প্রবল শোণিত-স্রোতে তিতি' বসুমতী
হয় বা না হয় তার আচারবর্ত্তন!

পাঠকবর্গের অবগতির জন্য এখানে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, অশোকের জননী সুভদ্রাঙ্গী ছিলেন ব্রাহ্মণ-কুমারী। কোন

মহাপুরুষ গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন, তাঁহার গর্ভে রাজচক্রবর্ত্তী পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে। এইজন্য তাঁহার পিতা তাঁহাকে পাটলীপুত্রের রাজঅন্তঃপুরে রাখিয়া যান। কিন্তু সুভদ্রাঙ্গীর অসামান্য রূপলাবণ্য-দর্শনে ঈর্ষাপরায়ণা রাজ্ঞীগণ তাঁহাকে হীন ক্ষৌরকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া ছিলেন। অশোককে 'নাপ্তিনী-পুত্র' বলিয়া সম্বোধন করিবার ইহাই পূর্ব্ব ইতিহাস।

অতঃপর অশোক যখন রাজসিংহাসনে আরোহণ করিলেন তখন একমাত্র কলিঙ্গাধিপতি ব্যতীত ভারতের অন্যান্য রাজন্যবর্গ সকলেই তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। কলিঙ্গাধিপতি তাঁহাকে সম্রাট্ বলিয়া স্বীকার না করায় অত্যাচারের পরা কাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া অশোক কলিঙ্গ-দুর্গ ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেন। ইতিহাস ও বৌদ্ধ পুরাণে এই নিষ্ঠুর অত্যাচার-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। অশোকের এই নির্ম্মম অত্যাচার-কাহিনীকে গিরিশচন্দ্র একটি নূতন রূপ দিয়াছেন, একটি নূতন দিক্ হইতে এই নিষ্ঠুরতা তিনি দেখিতে পাইতেছেন, তাই তিনি বলিয়াছেন—

"ঘোর হৃদয়-ঝটিকা উড়ায়েছে স্বভাব তাহার;"

নিজে অনেক নিষ্ঠুর পীড়ন সহ্য করিয়াছেন বলিয়াই—

"পীড়নে করেন তিনি শাসন-স্থাপন।"

বাল্যকালে সামান্য পতঙ্গের প্রাণনাশেও যাঁহার প্রাণ ব্যথায় ভরিয়া উঠিত, সেই অশোকের সুকোমল মনোবৃত্তি অবস্থা-বিপর্য্যয়ে পড়িয়া কিরূপে দানবীয় প্রবৃত্তিতে পরিণত হইল— 'মার' আসিয়া কিরূপে তাঁহাকে আশ্রয় করিল, গিরিশচন্দ্রের সুনিপুণ তুলিকা-স্পর্শে তাহা অতি সুন্দররূপে অঙ্কিত হইয়াছে। অত্যাচারের পরে অনুতাপ আসিয়া তাঁহার চিত্তকে অধিকার

করিল, উপগুপ্তের কাছে আত্মত্যাগের মহতী শিক্ষা তিনি লাভ করিলেন। কিন্তু পুনরায় অহঙ্কারে চিত্ত তাঁহার ভরিয়া উঠিল—"আত্মত্যাগ বাক্য আড়ম্বর" বলিয়া তাঁহার ধারণা জন্মিল, তাঁহার চিত্ত আবার নিষ্ঠুর হইয়া উঠিল—তিনি এবার ভিক্ষুগণকে বধ করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। কিন্তু পুনরায় তাঁহার অনুতাপে চিত্ত ভরিয়া উঠিল, তাঁহার প্রাণে সর্ব্বস্বত্যাগের বাসনা জাগিয়া উঠিল, এবং তিনি আবার পরিপূর্ণ আত্মত্যাগের নূতন দীক্ষা লাভ করিলেন। অশোকের এই যে ক্রমবিকাশ, ধর্ম্মাশোকরূপে তাঁহার চরিত্রের এই যে পরিণতি, গিরিশচন্দ্র তাহা তাঁহার অসামান্য কৃতিত্বের সহিত স্তরে স্তরে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ধর্ম্মচিন্তাই অতঃপর রাজা অশোকের সর্ব্বস্ব হইয়া উঠিল, ক্রোধকে তিনি দমন করিতে সমর্থ হইলেন—সসাগরা ধরিত্রীর অধীশ্বর সকল ভুলিয়া প্রজাবর্গের হিতসাধনে আত্মনিয়োগ করিলেন। কিন্তু ইহাতে শুধু আদর্শ নরপতি হয় তো হওয়া যায়—খাঁটি মানুষ তো হওয়া যায় না—বুদ্ধদেবের মহাজ্যোতি তো দর্শন হয় না! মোহই মানুষের প্রধান শত্রু। মোহবীজ হইতেই বহুশাখা-বিশিষ্ট মহাপাপ-বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। ক্রোধ শান্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু বহুরূপী কাম-ধর্ম্মের আবরণে আসিয়া তাঁহাকে ছলনা করিতে লাগিল। তিষ্যরক্ষিতার ছলনায় তিনি মোহে পতিত হইলেন। ভোগ ব্যতীত প্রারব্ধের ক্ষয় হয় না। তাই ক্রমে তিনি যখন ঐ পাপীয়সীর মোহবিষের তীব্রজ্বালা অনুভব করিতে পারিলেন তখন কামও তাঁহার নির্ম্মূল হইয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত সমস্ত পরিবর্ত্তনের পরেও পরিবর্ত্তনের নূতন স্রোত অশোক-চরিত্রের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতে দেখিতে পাওয়া যায়।

ক্রোধ দূরীভূত হইল, কাম বিলুপ্ত হইল, মাৎসর্য্যও বিনাশ প্রাপ্ত হইল, কিন্তু ইহাতেও শেষ হইল না—দেহাভিমান তো বিদূরিত হইল না। বৌদ্ধসঙ্ঘকে তাঁহার সমস্ত রাজ্য তিনি দান করিয়া ফেলিলেন বটে কিন্তু অন্তরে রহিয়া গেল দানের গৌরব-বোধ। ক্রমে তিনি এই গৌরবকেও বিসর্জ্জন দিয়া, "রাজ্য, ধন, কীর্ত্তিকলাপ কিছুই আমার নয় সমস্তই বুদ্ধদেবের, আমি নিমিত্তমাত্র" এই সারতত্ত্ব উপলব্ধি করিলেন এবং দিব্যদৃষ্টি লাভ করিলেন।

অশোককে মানব-মনের এই সকল বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়া অতিক্রম করাইয়া তাঁহাকে আদর্শ চরিত্রে পরিণত করিতে গিরিশচন্দ্র নাট্যকলার অদ্ভুত অভিব্যক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। কি কর্ম্মক্ষেত্রে, কি ধর্ম্মসংস্থাপনে, কি সমাজ-সংস্কারে, কি দেশ-হিতৈষণায় কেহই পুর্ণমানবত্ব লইয়া আসে না। জীবন-সংগ্রাম অবশ্যম্ভাবী। বারংবার নিষ্ফল হইলেও চেষ্টায় বিরত হওয়া কিছুতেই উচিত নয়। গিরিশচন্দ্র এই সংগ্রামের বিভিন্ন স্তর অশোক-চরিত্রের ক্রম-অভিব্যক্তির মধ্যে প্রদর্শন করিয়াছেন।

এই জাতীয় ইতিহাস-মূলক 'সৎনাম' নাটকেও গুলসানার প্রতি প্রণয়াশক্ত হইয়া রণেন্দ্র একবার নিজের কর্ত্তব্য ভুলিয়া যাইতেছেন, আবার নিজের কর্ত্তব্যসাধনে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। আসক্তি ও কর্ত্তব্যের এই দ্বন্দ্বক্ষেত্রে বৈষ্ণবী তাঁহাকে দৃঢ়চিত্তে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া জয়লাভ করিবার জন্য উৎসাহিত করিতেছেন—

ভাব কেন হে বীরকেশরী ?
স্পর্শে নারী সবার হৃদয়,
বীর তায় নাহি হয় বিচলিত।

ফুলশরে কম্পিত শঙ্কর,
যোগভঙ্গ হয়ে ছিল তাঁর ;
কিন্তু যোগীশ্বর—
মদন-দাহন করিলেন নয়ন-অনলে ;
স্মরহর নাম সে কারণ ।
মন্মথের শরাঘাতে না হয় কাতর,
অধিক মাহাত্ম্য জেনো তাঁর ।
সুসিদ্ধ-সঙ্কল্প যেই, বীর—দৃঢ়পণ,
হৃদয়-দৌর্ব্বল্য পারে করিতে বর্জ্জন,
তা হ'তে মহৎ কেবা এ তিন ভুবনে ?
অস্ত্রাঘাত বিনা কেহ না হয় কাতর ;
কিন্তু প্রবল আঘাতে যেই বীর রহে স্থির,
ধন্য বলি মাহাত্ম্য তাঁহার !

—৫ম অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক ।

নারীর মোহে পতিত হইয়া বীর রণেন্দ্রের ব্রতভঙ্গ হইল, কিন্তু অশোক কাম, ক্রোধ, মাৎসর্য্য, মোহ, অভিমান পরিত্যাগ করিয়া আদর্শ চরিত্র লাভ করিলেন। আবার দৃঢ়-সঙ্কল্প ব্যক্তিকেও এই সকল রিপুর সহিত কিরূপ ঘোরতর সংগ্রাম করিতে হয়, গিরিশচন্দ্র তাঁহার প্রতিভার শেষ দান 'তপোবল' নাটকে তাহা দেখাইয়াছেন।

বিশ্বামিত্র যখন বুঝিলেন ব্রহ্মশক্তিই একমাত্র শক্তি, তখন তিনি এই শক্তি লাভ করিবার জন্য সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। বহু তপশ্চরণ, অনেক কৃচ্ছ্রসাধন, উত্থান-পতন ও ঘাতপ্রতি-ঘাতের মধ্যদিয়া ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে আরোহণ

করিয়া তিনি ব্রহ্মশক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মানব-জীবনের এই ক্রমবিকাশের চিত্রটি গিরিশচন্দ্রের অনন্যসাধারণ শক্তির পরিচায়ক। রাজর্ষিত্ব লাভ করিয়াও বিশ্বামিত্র পাইয়াছিলেন কেবল জড়শক্তি, যাহার সম্বন্ধে পরমহংসদেব বলিতেন, 'রাজার দুয়ারে আসিয়া লাউ কুমড়ো মাগিব কেন?' রাজর্ষিত্বের পর ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ করিবার জন্য তিনি কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু অন্তরে তখনও প্রতিহিংসাবৃত্তি রহিয়া গিয়াছে—পুত্রশোকে যে প্রতিহিংসানল হৃদয়ে প্রজ্বলিত হইয়াছিল তাহা তখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই। এই প্রতিহিংসানল তিনি নির্ব্বাপিত করিতে চাহিলেন বশিষ্ঠের শত পুত্রকে বিনাশ করিয়া। এই উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য তপোবলে তিনি রাজা কল্মাষপাদকে শত হন্তার শক্তি প্রদান করিয়াছিলেন। অহঙ্কারও তাঁহার ছিল যে, তিনি "কামজয়ী পুরুষ, সঙ্গে স্ত্রী সত্বেও কামে বিরত।" তাই মোহিনী মেনকার মোহজালে তিনি পতিত হইলেন—শকুন্তলার জন্ম হইল। কিন্তু "ঝরিল অনলরাশি ঋষির নয়নে"—বিশ্বামিত্র আরও দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন—

আজি হতে সঙ্কল্প আমার
বিঘ্ন-বাধা করি অতিক্রম—
রব ঘোর সাধনে মগন;
হয় হ'ক শরীর-পতন,
প্রতিজ্ঞা না ভঙ্গ হবে মম।

—৩য় অঙ্ক, ৭ম গর্ভাঙ্ক।

তপস্যার সময় কাম-ক্রোধের আক্রমণ বিশ্বামিত্রকে বিব্রত করিয়া তুলিত। ক্রোধবশে রম্ভাকে তিনি অভিশাপ-প্রদান

করিয়াছিলেন। কিন্তু দৃঢ়চিত্ত হইয়া ক্রমে সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তিনি ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ করিলেন। ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ করিয়াও ক্ষমাগুণ তিনি অর্জ্জন করিতে পারেন নাই, তখনও অহঙ্কার তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া বর্ত্তমান ছিল। এবং এই সমস্ত রিপু জয় করিবার পূর্ব্বে তিনি ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইলেন না। রিপুর সহিত সংগ্রামে এই যে জয়পরাজয়, জীবনের এই যে উত্থানপতন—মনের এই যে সঙ্কল্প-বিকল্প, তাহা "তপোবল" নাটকে জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। "তপোবলে"র শেষ দৃশ্যে বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ-মারণ-যজ্ঞে ব্রতী, কিন্তু বশিষ্ঠের প্রাণ নির্ভয়, অচঞ্চল, ক্ষমাশীল তাঁহার প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া বিশ্বামিত্র নিজের দোষ, নিজের মনের ছলনা সমস্তই বুঝিতে পারিলেন। এবার সর্ব্বশেষ রিপুকেও তিনি জয় করিতে সমর্থ হইলেন—বশিষ্ঠের 'ক্ষমাশীলতা' দেখিয়া নিজেও ক্ষমা করিতে শিখিলেন। তাঁহার মধ্যে ব্রাহ্মণত্বের উন্মেষ হইল, নিজ হস্তে বারিসিঞ্চন করিয়া তিনি যজ্ঞানল নির্ব্বাপিত করিয়া দিলেন। জীবনের এই ক্রমবিকাশের ধারাটি অশোক অপেক্ষাও বিশ্বামিত্র চরিত্রে অধিকতর পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। উপগুপ্ত এবং বশিষ্ট উভয়েই developed character—পূর্ণ বিকশিত চরিত্র, তাঁহাদের অন্তরে দ্বন্দ্ব আর সম্ভব নয়। তাঁহাদের নির্দ্বন্দ্ব অন্তরের অনুপ্রেরণায় অশোক ও বিশ্বামিত্র নানা বিভিন্ন অবস্থা অতিক্রম করিয়া মহত্ত্বের চরম মহত্ত্বসীমায় উপনীত হইয়াছেন—অশোক বুঝিলেন অভিমান বৃথা, বিশ্বামিত্র বুঝিলেন "এই মহত্ত্বের অভাব আমার!" কালাপাহাড় যেমন চিন্তামণির প্রভাবে ক্রমে আত্মত্যাগ শিক্ষা করিয়াছিলেন, এই দুইটি চরিত্রও তেমনি মহদাদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া পরিণতি লাভ করিয়াছে। "কালা-

পাহাড়ে” যাহা আরম্ভ, “অশোকে” তাহার পরিণতি, “তপোবলে” তাহার পরিসমাপ্তি। তাই নাটক হিসাবে “তপোবল” একখানি উচ্চাঙ্গের নাটক। এইরূপ অসামান্য নাট্যপ্রতিভার বলে গিরিশ-চন্দ্র দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত নাট্যজগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন।

গিরিশচন্দ্রের পরেও অনেক নাট্যকার পৌরাণিক নাটক রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে অমৃতলাল বসু মহাশয়ের হরিশ্চন্দ্র (১৮৯৮), যাজ্ঞসেনী (১৯২৮), ক্ষীরোদপ্রসাদের সাবিত্রী (১৯০২), উলুপী (১৯০৬), ভীষ্ম (১৯১৩) ও নরনারায়ণ (১৯২৬), হরিশ্চন্দ্র সান্যালের বিশ্বামিত্র (১৯১) ও ভীষ্ম (১৯১৩), দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ভীষ্ম, পাষাণী ও সীতা, ভূপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষত্রবীর (১৯১৪), অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ে‹ রামানুজ (১৯১৬), কর্ণার্জ্জুন (১৯২৩) ও শ্রীকৃষ্ণ (৯২৬) এবং শ্রীযুক্ত যোগেশ চৌধুরীর সীতা (১৯২৪) প্রভৃতি নাটক উল্লেখযোগ্য। এই সকল নাট্যকারদিগের অধিকাংশই গিরিশ-চন্দ্রকে গুরুজ্ঞানে ভক্তিশ্রদ্ধা করিলেও এক অমৃতলাল বসু মহাশয় এবং অপরেশচন্দ্র ব্যতীত অন্য কেহ বড় গিরিশচন্দ্রকে সম্পূর্ণরূপে তাঁহার অনুসরণ করেন নাই। এই নাটকগুলি গিরিশ-চন্দ্রের ছাঁচে রচিত হইয়াছে বলিয়া এখানে তাহাদের সমালোচনা করা নিষ্প্রয়োজন, বিশেষতঃ গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকের সহিত তুলনামূলক আলোচনা করা যাইতে পারে, এমন কোন বিশেষত্ব তাহাদের নাই। স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় গিরিশচন্দ্রেকে পৌরাণিক নাটকের সম্রাট বলিয়া অভিহিত করিতেন। বহুভাষাবিদ্ পণ্ডিতপ্রবর সুবিখ্যাত অধ্যাপক স্বর্গীয় হরিনাথ দে মহাশয় গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটক সম্বন্ধে প্রায়ই বলিতেন—

"Girish has worked a miracle in the present age. Many of us thought it was no longer possible to revive Pouranik plots in modern dramas. Girish proved it to be false."

"পৌরাণিক ঘটনা অবলম্বনেও যে বর্ত্তমান যুগের উপযোগী উৎকৃষ্ট নাটক রচনা করা যাইতে পারে, একমাত্র গিরিশচন্দ্রই তাহা প্রমাণিত করিয়াছেন।"

প্রাচীন গ্রীকনাট্যকার ব্যতীত পাশ্চাত্য-সাহিত্যেও কেহ এ পর্য্যন্ত ভাল পৌরাণিক নাটক লিখিতে পারেন নাই, এমন কি ফরাসী নাট্যকার Racine, সুপ্রসিদ্ধ কবি ও নাট্যকার Goetheও তেমন কৃতকার্য্য হন নাই*।

নাটক সম্বন্ধে একটী কথা বলা আবশ্যক। ভাষা, চরিত্র-সৃষ্টি, ঘটনার সমাবেশ ও সঙ্কল্প-বিকল্প, নাটকের প্রধান বিষয়ীভূত হইলেও, উহাতে লোকশিক্ষা একেবারে উপেক্ষা করা চলে না। ম্যাক্‌সুইনি জাতীয়শিক্ষার জন্য জাতীয়নাটকের অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন, জাতীয় নাটকের প্রচার করিয়া সোভিয়েট রাসিয়ার "মস্কো আর্ট থিয়েটার" এখন প্রধান জাতীয় শিক্ষা-নিকেতন। আমাদের দেশেও একদিন জাতীয় রঙ্গমঞ্চ এইরূপ শিক্ষামন্দিরেই পরিণত হইয়াছিল।

বেশী দিনের কথা নয়,—'বুদ্ধদেব' নাটক অভিনয় দেখিয়া অনেকে বলি বন্ধ করিয়াছিলেন, 'বলিদান' অভিনয় দেখিয়া বাঙ্গালীহৃদয় বরপণ-প্রথার উচ্ছেদ সাধন করিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল, 'সিরাজুদ্দৌলা,' 'মিরকাশিম,' 'প্রতাপাদিত্য,' 'রাণা-

* Danteর Divine Comedyতে ইহার ব্যত্যয় দৃষ্ট হয়, কিন্তু Dante কোন নাটক রচনা করেন নাই।

প্রতাপ' দেখিয়া বাঙ্গলাকে ভালবাসিতে শিখিয়াছিল। গিরিশচন্দ্র আবার এই রঙ্গালয় হইতেই অনেক দর্শন-নীতি, ধর্ম্মতত্ত্ব, সেবা-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। "চৈতন্যলীলা" অভিনয় দর্শন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছিলেন "নকলে আসলের উদ্দীপনা হয়, সোলার আতা দেখ্‌লে সত্যিকারের আতা মনে হয়"।

পরবর্ত্তী রচিত নাটক সমূহে আমরাও যখন দেখি কিরূপে বশিষ্টের আত্মাশক্তির কাছে বিশ্বামিত্রের রজোশক্তি পরাভূত হইল, কিরূপে পাগলিনীর মধুর কণ্ঠে ব্রহ্মরূপকল্পনা অনুভূত হয়, তাঁহার "নাহি নাহি ফুরাইল বাক্, বর্ত্তমান বিরাজিত" উদাস বাক্যে নির্ব্বিকল্প সমাধির সন্ধান পাওয়া যায়, তখন প্রাণে যথার্থই আনন্দের সঞ্চার হয়। আবার যখন শঙ্করাচার্য্যের গম্ভীর উদাত্তকণ্ঠে সহজ বেদান্ত বাণী শুনিতে পাই—

"—ধীর ভাবে কর বৎস মন সন্নিবেশ
আমা হতে প্রিয় আর কি আছে আমার ?
পুত্র পরিবার প্রিয় বস্তু যা আছে সংসারে
প্রিয় তাহা আমার বলিয়ে।
ব্রহ্ম বস্তু প্রিয় মম আমার সমান
জন্মিলে এ জ্ঞান
আমি তিনি ভেদ নাহি রহে
প্রিয় জ্ঞানে এক জ্ঞান জন্মে ব্রহ্ম সনে
এই প্রিয় জ্ঞানে ক্ষুদ্র অহম্ বিনাশ,
ব্রহ্মজ্ঞানে বিলুপ্ত অহম্
উদয় সোহং ভাব অহং বর্জ্জনে !

মনোবুদ্ধি অহঙ্কার লয় সমুদয়—"
আত্মজ্ঞানে অবস্থান ক্ষুদ্রাহংক্ষয়ে।

যখন বিদ্যা ও অবিদ্যার পার্থক্য দেখিতে পাই—

"স্বর্ণ লৌহ শৃঙ্খলের প্রভেদ যেমতি
বিদ্যা আর অবিদ্যার প্রভেদ সেরূপ
উভয়ই বন্ধন................."

তখন বুঝিতে পারি মায়া দূর হইলেই তিনি ও আমি এক-অভেদ। আর সমজ্ঞানই মায়া বিনাশের একমাত্র মহৌষধ।

বিল্বমঙ্গল, শঙ্করাচার্য্য ও তপোবলের স্থায় নাটক জাতীয় প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির মর্ম্ম-চিত্র সকলের সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়া দেয়। ভারতবর্ষের জাতীয়তার মূলে ধর্ম্ম—ভারত ধর্ম্মপ্রাণ। এই নাটকগুলি জাতির হৃদয় উন্নত এবং সরস করিতে সমর্থ বলিয়াই চৈতন্যলীলার পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী নাটক সমূহের চরিত্রসৃষ্টিমূলে যে বিশেষত্ব রহিয়াছে, তাহাই দেখাইতে আমরা প্রয়াস পাইয়াছি। স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, পরমহংস রামকৃষ্ণ-দেবের প্রভাবেই এই নাটকগুলির এত গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং ইহারা জাতির এত হিতকর।

অনেকে মনে করেন, অন্যের প্রভাবান্বিত নাটকে নাট্যকলার স্ফুরণ হয় না। গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে একথা একেবারেই অর্থহীন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অনুপ্রাণিত গিরিশের সমস্ত নাটকেই একদিকে যেমন ভগবদ্বার্ত্তা স্থানলাভ করিয়াছে, অপরদিকে আবার প্রচুর নাট্য-রসেরও সৃষ্টি হইয়াছে। দর্শকের প্রাণে ভগবদ্ভক্তি সঞ্চার

প্রকৃষ্ট রসাভাষ-সৃষ্টি ব্যতিরেকে সম্ভব নয়, এবং তাহা কেবল শ্রেষ্ঠ কলাবিদের পক্ষেই সম্ভব।

পূর্ব্বাপর দেখিতেছি ভক্তিরসসৃষ্টি ভারতীয় নাট্যকলার একটা প্রধান অঙ্গ। বস্তুতঃ একাধারে ভক্তিরস এবং অন্যদিকে নাট্যকলার সৃষ্টি কম শক্তি ও গৌরবের কথা নয়। ভারতের কবিগণ সকল সময়েই স্বদেশের ভাবধারা অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের সমসাময়িক মহাপুরুষগণের জীবনালোচনা করিয়া গিয়াছেন, এ দৃষ্টান্তও নিতান্ত বিরল নহে। আপনার উপাস্য-দেবতার প্রভাবানুপ্রাণিত হইয়াই রূপগোস্বামী 'বিদগ্ধমাধব' ও 'ললিতমাধব' রচনা করিয়াছিলেন—আজও বিদগ্ধমাধব সর্ব্ব-জনাদৃত, 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকও তদনুভাবেই অনুপ্রাণিত। ভারতীয় মহাকাব্যের অন্তরালেও এই সত্য নিহিত। জগতে আজও এমন কোন কবি বা নাট্যকার জন্মগ্রহণ করেন নাই যিনি রসসৃষ্টিতে ব্যাস ও বাল্মীকিকে অতিক্রম করিয়াছেন।

মহৎ চরিত্রের মহৎ ভাব প্রকাশ করিবার অধিকার এবং যোগ্যতা একমাত্র মহাকবি ব্যতিরেকে আর কাহারও সাধ্য নাই। তাই একাধারে রসসৃষ্টি ও মহৎ চরিত্রের বিকাশ করা রসস্রষ্টৃগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরব। ষোড়শ শতাব্দীর পরে গিরিশচন্দ্রের পূর্ববর্ত্তী কি সমসাময়িক কোন কবির ভাগ্যেই রামকৃষ্ণ দেবের ন্যায় মহাপুরুষ দর্শন লাভের সৌভাগ্য হয় নাই। একমাত্র গিরিশচন্দ্রের শুভাদৃষ্টেই তিনি পরমপুরুষের কৃপালাভ করিয়াছিলেন, এবং রচনাও স্বতঃই তদ্‌ভাবানুপ্রাণিত হইয়া অভিনব রূপ ধারণ করিয়াছে।

মহাকবি সেক্‌স্‌পিয়রের নাটকেও ভগবদ্‌বাণী বা পারলৌকিকতত্ত্ব উজ্জ্বল হইয়া উঠে নাই। কারণ অতীন্দ্রিয়

রহস্যের প্রতি পাশ্চাত্যজাতির প্রকৃতিগত সন্দেহ। তাই হ্যামলেটের ন্যায় তত্ত্ব-বিচারশীল পুরুষও মৃতপিতার প্রেতাত্মা প্রত্যক্ষ করিয়াও Polinius এর মৃত্যু সম্বন্ধে বৈতরণীর পরপারের উদ্দেশে বলিতেছেন

অজ্ঞানিত দেশ, পান্থ নাহি
ফিরে যথা হ'তে।

That undiscovered country, from whose bourne no traveller returns.

কিন্তু পরলোকে বিশ্বাস হিন্দুর জন্মগত সংস্কার। এই ধর্ম্ম বিশ্বাসেই পাশ্চাত্য ও হিন্দুজাতির পার্থক্য। ইহলোকসর্ব্বস্ব পাশ্চাত্যজাতির সকল কর্ত্তব্যসম্পাদনের মূলে রহিয়াছে নীতি ও পুরুষকার; আর হিন্দুর জাতীয় জীবনের মূল ধর্ম্মপ্রাণতা, পরলোকে বিশ্বাস এবং ভগবৎ-নির্ভরতা। যেখানে অতীন্দ্রিয় জগৎ, সেক্‌স্‌পিয়র সেখানে মূক, আর গিরিশচন্দ্র মুখর। হিন্দুর জাতীয় ভাবের দিক্ হইতে গিরিশনাটকের আলোচনা করিলে বিচারে ভুলভ্রান্তি হওয়ার সম্ভাবনা কম। কর্ম্মরত পাশ্চাত্য জাতি কিরূপে কর্ম্মভোগে কর্ম্মনাশ হয়, ত্যাগ কি, বৈরাগ্য কেন জন্মে, এ সকল তত্ত্ব বুঝিতে পারে না। এই যুগে রামকৃষ্ণদেব এই সকল প্রশ্নের সমাধান করিয়া ভক্তি ও বিশ্বাস, ত্যাগ ও বৈরাগ্য, কর্ম্ম ও সেবাধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। এই তত্ত্বই যুগধর্ম্মরূপে ভারতের অসংখ্য নরনারীকে আজ পথের সন্ধান মিলাইয়া দিতেছে। আর গিরিশচন্দ্র তাঁহার অমর-লেখনীতে ভৈরবরূপে সেই মহাপুরুষের লীলাই প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ইহাই গিরিশের নাটকের বৈশিষ্ট্য।

ঐতিহাসিক নাটকে

তৃতীয় অধ্যায়

জাতীয় হৃদয় অধিকার করাতেই কাব্য ও নাটক রচনার সার্থকতা। কি কবি কি নাট্যকার কি ঔপন্যাসিক যত বড় ক্ষমতাশালী বা প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিই হউন না কেন, তাঁহার রচনার মধ্যে জাতীয় ভাবের সন্ধান না থাকিলে, উহা স্থায়িত্ব লাভে বঞ্চিত হয়। জাতীয়জীবন গঠন-নিয়ন্ত্রণে সহায়তা না করিলে, জাতীয় চরিত্র প্রভাবিত করিতে না পারিলে, সাহিত্য সাহিত্য নয়। কৃত্তিবাস ও কাশীরাম হিন্দুর জাতীয়হৃদয় স্পর্শ করিয়াই অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

"জন্মভূমি রক্ষা হেতু
কে ডরে মরিতে ?"

এই জাতীয় ভাব হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে ছত্রে ছত্রে উদ্‌ঘাটিত না হইলে কেবল অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্ত্তন করিয়াই মধুসূদন বাঙ্গালীর হৃদয় অধিকার করিতেন না। "বন্দেমাতরম্" সঙ্গীত জাতীয় পুরোহিতের হৃদয়-নিঃসৃত পূতবারিধারা রূপে সমগ্র জাতির হৃদয় প্রভাবান্বিত না করিলে বঙ্কিমচন্দ্রও মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির আসনে প্রতিষ্ঠিত হইতেন না। গিরিশচন্দ্রের নাটক, কবিতা ও উপন্যাসেও জাতীয় ঐক্যবন্ধনের সমধিক পরিচয় পাই বলিয়াই তিনি শ্রেষ্ঠ জাতীয় নাট্যকার। যেদিন শুনিলাম—

শুনি মা তুই সোণার বাংলা
শুনি যেমন সোণার কাশী

তুই যদি মা সোণার বাংলা
আমরা কেন উপবাসী ॥

তখনই কবিহৃদয়ে বাঙ্গলার প্রাণের সন্ধান পাইলাম। এই ভাবই গিরিশ-নাটকের পত্রে পত্রে, আর এই দিক হইতেই এবার গিরিশ-নাটকের আলোচনা করিব।

অতি প্রাচীন কাল হইতেই মানুষ জাতীয় সাহিত্যের গৌরব করিয়া আসিতেছে। বাল্মীকি ও বেদব্যাসের গ্রন্থ যেমন ভারতের জাতীয় মহাকাব্য, হোমারের ইলিয়ড্ তেমনি গ্রীসের এবং ভার্জ্জিলের ইনিয়ড্ রোমের জাতীয় মহাগ্রন্থ। চসার, দান্তে, সেক্সপিয়র, সুইনবার্ণ, স্কট, গেটে, বায়রণ, কাউপর, ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও টেনিসন—সকলেরই অমরগীতিকা জাতীয়তার সুরে ঝঙ্কৃত। এজিনকোর্টের শিবিরে সেক্সপিয়রের হেনরী দি ফিফ্থ্ যখন সৈন্যগণকে কর্ত্তব্য শুনাইতে শুনাইতে (he let him outlive that day to see his greatness) আশ্বাসিত করিতেছেন :—

Upon the King! let us, our lives, our souls,
Our debts, our careful wives,
Our children, and our sins, lay on the King ;—
We must bear all ;

কাহার হৃদয় না উৎসাহে স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিল? বস্তুতঃ প্রত্যেক ইংরাজের কাছে Henry V নাটকখানি National Anthemএর ন্যায় আনন্দের সামগ্রী, তাঁহার কাছে হেনরী "one still strong man in a blatant land"

King Johnএরও শেষ তিনটী ছত্রে এই ভাবেরই অভিব্যক্তি—

Come the three corners of the world in arms
And we shall shock them. Nought shall make us
rue
If England to itself do rest but true.''

সেক্সপিয়রের ''England never shall lie
At the proud feet of a conqueror''

সর্ব্বকালে ইংরাজের কাছে একটা গৌরবময় বাণী। তবে সুইনবার্ণের Trafalgar Dayর পরে জাতীয় নাটক আর সেখানে বড় রচিত হয় নাই, কিন্তু বঙ্গবাসী সেই আদর্শ দেখিতে পায় গিরিশের ঐতিহাসিক নাটকের অঙ্কে অঙ্কে।

বাঙ্গলার প্রথম ঐতিহাসিক নাট্যকারই মধুসূদন। তাঁহার "কৃষ্ণকুমারী" বিয়োগাত্মক নাটক হইলেও উহা বাঙ্গালীর প্রথম উদ্যম (১৮৬১)। অতঃপর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের "পুরু-বিক্রম" (১৮৭৪), "সরোজিনী" (১৮৭৫) এবং "অশ্রুমতী" এবং সুরেন্দ্র মজুমদারের "হামির" (১৮৮০) উল্লেখযোগ্য নাটক। কয়খানি নাটকই জাতীয়তার সুরে ঝঙ্কৃত কিন্তু নাটক হিসাবে উহাদের মর্য্যাদা কম। অতঃপর গিরিশই ঐতিহাসিক নাটক লিখিতে প্রয়াস পান।

গিরিশের প্রথম নাটক "আনন্দরহো" ঐতিহাসিক ঘটনার উপরেই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু রাণাপ্রতাপের আত্মত্যাগের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত থাকিলেও, গিরিশের নাট্যপ্রতিভা তখন বাঙ্গালীর

হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে নাই। গিরিশ বুঝিলেন জাতীয় হৃদয় স্পর্শ করিতে না পারিলে নাটক সমাদৃত হয় না। তিনি পৌরাণিক নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

গিরিশচন্দ্রের দ্বিতীয় উদ্যম ষ্টার থিয়েটারে। "প্রফুল্ল" ও "হারানিধি"র পরেই তিনি রাজস্থান অবলম্বনে "চণ্ড" নাটক প্রণয়ন করেন। চণ্ড নাটকের স্থানে স্থানে স্বদেশের বড় নিখুঁত বর্ণনা আছে :—

হের ঐ চিতোর নগর পুণ্যধাম—
উচ্চ শির প্রাচীর বেষ্টিত ধরাধর
গর্ব্ব খর্ব্ব যাহে ; সূর্য্য বংশ-অবতংস
গৌরব-আকর বাপ্পারাও, কীর্ত্তি যার
ব্যাপ্ত ধরাতলে, বসিতেন ঐ পুরে ;
স্বর্গোপম গরীয়সী মম জন্মভূমি—
পিতৃপিতামহ-দেবালয়, আজি তথা
বিহরে রাঠোর—রম্য নন্দন কাননে
দুরন্ত দানব দল, রাণা সিংহাসনে
মারবার কিরাত বর্ব্বর, কেশরীর
গহ্বরে জম্বুক, বসে চণ্ডাল বেদীতে,
রাজহস্তী ভুজঙ্গ-বেষ্টনে জরজর,
সুন্দর চিতোর এবে পিশাচের ঘর !

প্রভৃতি পূর্ব্বগৌরব গাঁথায় প্রাণে আবেগ সঞ্চারিত হয় বটে, কিন্তু নাটকখানি সাধারণে সমাদৃত হয় নাই।

তবে একটা কথা নিতান্তই উল্লেখযোগ্য। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে "চণ্ড" নাটক রচিত হইয়াছিল, আর স্বদেশপ্রেমের

উদাত্তবাণী তখনও বাঙ্গালীর কাণে বাজিয়া উঠে নাই। কিন্তু সেই অন্ধকারযুগেও গিরিশ ভাবী দেশনায়কের কর্ত্তব্যপথ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন—

"অন্তরের গূঢ়-স্থল কর অন্বেষণ
মন! পশি অভ্যন্তরে গুহ্যতম স্তরে
হের কোথা স্বার্থ লুক্কায়িত। উচ্চ আশ,
উন্নতি প্রয়াস, আছে কি গোপনে ধরি—
স্বদেশ-বৎসল ভাব? আধিপত্য-লিপ্সা,
কিম্বা চিতোরের হিতে চালিত অন্তর?
সত্যতত্ত্ব কর নিরূপণ। দেখ মন,
স্বার্থশূন্য নহে কি অন্তর?
...............নহে কেন লোকনিন্দা ভরি?"

মহাপ্রস্থানের পূর্ব্বে দেশনায়ক দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মনেও এইরূপ আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রশ্ন উদিত হইয়াছিল—

"আমার মনে কি হিংসা আছে, নতুবা এত শত্রু কেন?"

চণ্ডের পরে গিরিশের "সৎনাম" নাটক রচিত হয়। ইহাতে জাতীয় মনোভাবের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের "প্রতাপাদিত্য" নাটক রচিত ও অভিনীত হওয়ায় (১৯০৩, ১৫ আগষ্ট) তাঁহাকে অন্যতম জাতীয় নাট্যকার আখ্যা দেওয়াই সঙ্গত।

ক্ষীরোদপ্রসাদের "বাঙ্গালীতে সত্যনিষ্ঠার অভাব, বাঙ্গালী পরছিদ্রান্বেষী, পরশ্রীকাতর, স্বার্থপর" ইত্যাদি সেলিমের মুখে আরোপিত বাঙ্গালীর হীনতাসূচক কথাগুলি করিমচাচার

অভিমানের বাণী নহে, বাঙ্গালীজাতি সম্বন্ধে মেকলের মিথ্যা উক্তির প্রতিধ্বনি মাত্র !

যাহা হউক, ক্ষীরোদপ্রসাদের পূর্ব্বেও গিরিশচন্দ্র ভ্রান্তি নাটকের রঙ্গলালে, আদর্শ বাঙ্গালী চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন (১৯ জুলাই, ১৯০২)। চিত্রটি সম্পূর্ণরূপে কল্পনাপ্রসূত হইলেও উহাতে মুর্শিদকুলীখাঁর সমসাময়িক বাঙ্গালার অবস্থার ছায়াপাত হইয়াছে। রঙ্গলাল যদিও সম্পূর্ণ কাল্পনিক চরিত্র, তথাপি রঙ্গলালের আদর্শে অনুপ্রাণিত অনেক বাঙ্গালী চরিত্রের পরিচয় গত চল্লিশ বৎসরের মধ্যেই আমরা পাইয়াছি। ইহারও পূর্ব্বে ১৯০০ খৃষ্টাব্দেই গিরিশচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের 'সীতারাম' উপন্যাসখানি ইচ্ছানুরূপ নূতন ঘটনার সংযোগে নাটকে রূপান্তরিত করিয়া স্বদেশ উদ্ধারে দৃঢ়সঙ্কল্প খাঁটি স্বদেশভক্ত বাঙ্গালী বীরকে রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত করিয়াছেন। "সৎনাম" নাটক ১৯০৪ সালের ৩০শে এপ্রিল তারিখে অভিনীত হইলেও, নাটকখানি যে ১৯০২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রচিত হইয়াছিল তাহা 'সৎনাম' নাটকের প্রথম সংস্করণ দেখিলেই আমরা জানিতে পারি। জনৈক প্রসিদ্ধা অভিনেত্রীর অসুস্থতার জন্য কিছুদিন রিহার্সেলের পর প্রায় বৎসরাধিক কাল এই নাটকের অভিনয়ের কোন চেষ্টা আর হয় নাই। "সৎনাম" নাটকের রচনা কাল হইতে ইহা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, এই নাটকখানিই জাতীয়তার প্রথম উন্মেষের যুগের প্রথম নাট্যগ্রন্থ। স্বর্গীয়া নিবেদিতা তাঁহার পিতৃসদৃশ গিরিশচন্দ্রকে এই নাটক লিখিতে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। অতএব দেখা যায় "প্রতাপাদিত্য" স্বদেশী যুগের একখানি জনপ্রিয় নাটক হইলেও, 'চণ্ড' 'সীতারাম,' 'ভ্রান্তি' ও 'সৎনাম' নাটকের রচয়িতাই বাঙ্গালার সেই স্মরণীয় যুগের সর্ব্বপ্রথম জাতীয় নাট্যকার।

"সৎনাম" নাটকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করে বৈষ্ণবী চরিত্রটি। ইহা সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক চরিত্র। আওরঙ্গজেবের সময়ে সৎনামী সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ অবলম্বনে এই নাটক রচিত হইয়াছে। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা ভগবান্‌কে "সৎনাম" বলিয়া থাকে। এই জন্য এই সম্প্রদায়ের নাম হইয়াছে "সৎনামী সম্প্রদায়"। সৎনামী বিদ্রোহের নেত্রী ছিলেন একজন রাজপুত রমণী। তাঁহারই নাম বৈষ্ণবী। ঐতিহাসিক নাটক রচনায় গিরিশচন্দ্র সময় সময় কল্পনার সাহায্য লইলেও, ভিক্‌টর হুগো, ডুমা, ইউজিনস্যু, স্যার ওয়াল্টার স্কট্‌ প্রভৃতির ন্যায় তাঁহার নাটকে দেশের তৎকালীন অবস্থা এবং ঐতিহাসিক ঘটনার বিকৃতি সম্পাদন করেন নাই। বিখ্যাত সমালোচক হাড্‌সন সাহেব ঐতিহাসিক নাটক সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"For, to be truly an historical drama, a work should not adhere to the literal truth of history in such sort as to hinder the proper dramatic life; that is, the laws of the drama are here paramount to the facts of history; which infers that, where two cannot stand together the latter are to give way. Yet, when and so far as they are fairly compatible, neither ought to be sacrificed; at least historical fidelity is so far essential to the perfection of the work."

গিরিশচন্দ্রের ঐতিহাসিক নাটক ঠিক এই ধারা অবলম্বনেই রচিত। তিনি কল্পনার সাহায্য লইলেও ইতিহাসকে কখনও ক্ষুণ্ণ করেন নাই বা কোন অপার্থিব ঘটনারও উল্লেখ করেন

নাই। এইখানেই বাঙ্গালার অন্যান্য ঐতিহাসিক নাট্যকারের সহিত গিরিশচন্দ্রের পার্থক্য। এমন কি সেক্স্‌পিয়ারও নাট্যকলার খাতিরে ইতিহাসকে নিজের মনোমত করিয়া ভাঙ্গিয়াছেন বা গড়িয়াছেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের কৃতিত্ব যে তিনি ইতিহাস বজায় রাখিয়াই উচ্চশ্রেণীর ঐতিহাসিক নাটক রচনা করিয়াছেন, আর তাহাতে laws of the drama বা রসাভাস কিছুমাত্রও ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

ঐতিহাসিক চরিত্র হইলেও বৈষ্ণবী গিরিশচন্দ্রের এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। তাঁহার ন্যায় স্বদেশবৎসলা স্বধর্ম্মানুরাগিনী এবং ভগবানে একান্ত নির্ভরশীলা নারীচরিত্র নাটকীয় সৌন্দর্য্যের সমাবেশে এমন সুন্দর ভারে ফুটিয়া উঠিয়াছে যে নাট্য-সাহিত্যে এরূপ চরিত্র বিরল। কেবলমাত্র জগদ্বিখ্যাত জার্ম্মান নাট্যকার সিলাবের 'Maid of Orleans'এর সঙ্গে বৈষ্ণবীর মহিমাময়ী চরিত্রের তুলনা হইতে পারে। "জোয়ান অব্ আর্ক" যেমন নিজেকে ভগবদ্‌প্রেরিতা বলিয়া বিশ্বাস করিতেন বৈষ্ণবীও তেমনি নিজের অন্তরে দেবীর প্রেরণা অনুভব করিতেছেন—

"ভৈরবীর উজ্জ্বল মূর্ত্তি আমার নয়নপথে পতিত হয়েছে—দেবী আমার উদ্দেশ্য, আমার অন্তরে বল্‌ছেন—সম্মুখে আমার প্রশস্ত পথ"—

"কৌমারী নন্দিনী আমি!
নেহার সঙ্গিনী—
কৌমারীর অনুচরা ভীষণা যোগিনী।"

২য় অঙ্ক, ৪র্থ গর্ভাঙ্ক।

জোয়ান অব আর্ক্ দেশের জন্য আপনার শ্যামা জন্মভূমি হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেছেন, গিরিমালার কাছে আশীর্ব্বাদ চাহিতেছেন, তাঁহার অন্তরে যেন অশরীরী বাণী তাঁহাকে বলিতেছে—

"Go forth! thou shall on earth my witness be
Thou in rude armour must thy limbs invest."
Act I, Sc. II.

সৎনামী নাটকের বৈষ্ণবীও বলিতেছেন—

জেনো স্থির—
সিন্ধু শোষে, মেরু টলে প্রতিজ্ঞার বলে।
ভাব আমি একাকিনী নারী?
বাক্য মম উন্মাদ প্রলাপ?
নহি একাকিনী, নহে এ প্রলাপ।
বুঝেছি এখন—
অলক্ষিতে শতকোটি যোগিনী সঙ্গিনী ফেরে
জন্ম মম মাতৃভূমি উদ্ধারের তরে,*
ইঙ্গিতে আমার সৈন্য হইবে সৃজন।

সৎনাম ১ম অঙ্ক, ৪র্থ গর্ভাঙ্ক।

* সেক্স্পিয়রও বলেন—

God's mother deigned to appear to me
And willed me to free my country from calamity.
Henry VI, Act. I, Sc. II.

সকলেই জানেন সেক্স্‌পিয়র জোয়ানের চরিত্রের উপযুক্ত মর্য্যাদা প্রদান করেন নাই। তিনি তাঁহাকে

> Foul fiend of France and hag of all despite
> Encompassed with thy lustful paramours,
>
> Henry VI, Act III, Sc. II, Part I.

বলিয়া উপহাস করিয়াছেন। অন্যত্র তাঁহার মৃত্যু সময়েও Warwick তাঁহার চরিত্রের প্রতি দোষারোপ করিয়া বিদ্রূপ করিতেছে—

> "It is a sign she hath been liberal and free"
>
> Act V, Sc. IV.

কিন্তু জার্ম্মানগণ জোয়ানের পবিত্র চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করার জন্য সেক্স্‌পিয়রকে তাঁহার কবিত্বের উচ্চপ্রশংসা করিয়াও সিলারের নিম্নে আসন প্রদান করিয়াছেন। তাঁহারা সিলারের "জোয়ান অব আর্ক" দেখাইয়া বলেন—সেক্স্‌পিয়র পৃথিবীতে বিচরণ করেন, অর্থাৎ পার্থিব স্থূলভাব লইয়া তাঁহার নাটক রচনা; উচ্চ প্রতিভার চালনায় পার্থিব স্থূলভাব হইতে যখন তিনি উড্ডীয়মান হইবার চেষ্টা পান, পার্থিব স্থূল আকর্ষণে ধড়াস্‌ করিয়া পৃথিবীতে পড়িয়া যান (comes down with a thud)। কিন্তু সিলার, যিশু-জননী কুমারী মেরী লইয়া মায়িক প্রেম অতিক্রমপূর্ব্বক মহাপ্রেমের কথা কহেন। সেই মহাপ্রেমে স্বদেশহিতকর প্রভা ও তাহার অভাবে পতন। Joan of Arcএ সিলার অদ্ভুত মহিমা চিত্রিত করিয়াছেন। সিলারের গ্রন্থ ইংরাজী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে—ইংরাজ সিলারের অঙ্কিত জোয়ান চরিত্র উপলব্ধি করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু

ব্যবসায়ী ইংরাজ জার্ম্মানদিগকে হিন্দু জাতির ন্যায় অপার্থিবভাব-বিভোর, স্বপ্নাচ্ছন্ন জাতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

গিরিশ সিলারের অঙ্কিত জোয়ান অব্ আর্ক অপেক্ষা কম দেবভাব লইয়া বৈষ্ণবী চরিত্র অঙ্কন করেন নাই, জোয়ানের ন্যায় বৈষ্ণবীও খাঁটি ঐতিহাসিক চরিত্র। ভারতে স্বদেশ মন্ত্র প্রচার করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। কিন্তু রক্ত-মাংসের আকর্ষণ জোয়ানের ন্যায় বৈষ্ণবীকে অভিভূত করিতে পারে নাই—

কারো নাহি অধিকার পতিত্বে আমার
রতি রতীশ্বর কিঙ্কর কিঙ্করী মোর

আর জনৈক ইংরেজ যুবকের প্রাণ সংহার করিতে উদ্যত হইলে তাহার বিষণ্ণ মুখ জোয়ানের হৃদয়ে প্রেম সঞ্চার করে, কিন্তু দৃঢ়ভাবে চিত্ত সংযত করিয়া আবার শান্তি ফিরিয়া পান—

"Now my mind
Is heal'd once more
I feel an inward peace and come what may
of no more weakness am I conscious."

এই ভাবসংঘর্ষ সত্ত্বেও জোয়ানকে আমরা দেবীমূর্ত্তিতেই পাই, আর বৈষ্ণবী চরিত্রে মুহূর্ত্তেও সে দুর্ব্বলতা দৃষ্ট হয় না। ইহা কি অস্বাভাবিক? কখনও নয়। শাস্ত্রে বলে, এবং আমরা নিজেরাও সেরূপ চরিত্র সম্মুখে পাইয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছি স্বদেশরক্ষা জীবনের দৃঢ়ব্রত হইলে, অন্য কোন ভাবই হৃদয়ে স্থান পায় না। তাই রণেন্দ্রের ন্যায় কোন মমতা তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই। তিনি সকলকে কলুষিত জীবন হইতে উদ্ধার

করিয়া মহাব্রতে দীক্ষিত করেন এবং রণেন্দ্রকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য উদ্দীপনাময়ী বাক্যে তাহাকে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন—

অন্তরের দুর্ব্বলতা করি পরিহার,
যাও ভ্রাতা যাও।
মার্জ্জনা মাগিয়া দেবী কৌমারীর পায়,
বীরমণি, সাজায়ে বাহিনী,
বিনাশ সম্রাট-চমূ
মুগ্ধপ্রায় নাহি রহ আর,
রণনাদে হৃদি-দুর্ব্বলতা যাবে দূরে।
যাও শীঘ্র বাহিনী মাঝারে,
নহে সবে হবে ভগ্নোদ্যম।
৪র্থ অঙ্ক, ৬ষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

নেতার দুর্ব্বলতায় সৎনামী সম্প্রদায় যখন ছত্রভঙ্গপ্রায়, তখন বৈষ্ণবীর প্রাণে যে অনুতাপ—অকৃতকার্য্যতার যে তীব্র-বেদনা উপস্থিত হয়—তাহা অতি মর্ম্মস্পর্শী ভাষাতেই গিরিশচন্দ্র প্রকাশ করিয়াছেন। বৈষ্ণবী বলিতেছেন—

বৃথা নারী করে ধরিলাম অসি,
স্রোতস্বতী সম বৃথা বহিল শোণিত,
বৃথা উচ্চকুলোদ্ভব নিরীহ যুবক—
উত্তেজিত পাপমন্ত্রে মম,
প্রাণ দিল এ কাল সমরে।
পিতা, মাতা, স্বদেশী, স্বধর্ম্মী, বন্ধু,
আত্মীয়, স্বজন, ভাসিল এ রণ স্রোতে!

বৃথা এ বিদ্রোহ।
রাজ রোষানল উদ্দীপনা হেতু
ছারখার করিতে ভারত,
নারীরূপা ভারতের কণ্টক পাপিনী
করিলাম মাতৃ-অপমান
প্রসাদ-মুকুট তাঁর দানি হীনজনে।

বৈষ্ণবী আওরঙ্গজেবের নিকট মৃত্যুদণ্ডই প্রার্থনা করিয়াছিলেন; কিন্তু কূটরাজনীতিজ্ঞ বাদশাহ যখন তাঁহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিতে স্বীকৃত হইলেন না, তখন বৈষ্ণবী স্বেচ্ছায় দেহ ত্যাগ করিলেন। তাঁহার এই ইচ্ছামৃত্যু অলৌকিক হইলেও বৈষ্ণবী চরিত্রেরই যোগ্য।

সিলারের আহত জোয়ান যেমন মৃত্যুর পূর্ব্বে বলিয়াছেন,—

Light clouds bear me up
My ponderous mail becomes a winged role
I must fly—back rolls the earth
Brief is the sorrow, endless is the joy

বৈষ্ণবীও তেমনি মৃত্যুর পূর্ব্বে বলিতেছেন,—

ওই ওই বিমানচারিণী
ময়ূরবাহিনী শক্তিসঞ্চারিণী
আবাহন করেন কন্যায়;
ওই অট্টহাস, দিবা সুপ্রকাশ,
ওই ভীমা রণাঙ্গনা, ওই পরাৎপরা,
ওই হাস্যধরা, ওই ওই মধুরভাষিণী

আবির্ভাব নন্দিনীর তরে।
লহ মাতা, তাপিতা দুহিতা।
৫ম অঙ্ক, ২গর্ভাঙ্ক।

সৎনাম নাটকের বীর রণেন্দ্রের চরিত্র এখানে আমরা আলোচনা করিব না। দেশভক্ত সঙ্কল্প-বিকল্প-সমন্বিত বীর যুবকের চরিত্র যেরূপ হওয়া স্বাভাবিক, ঠিক সেই ভাবেই গিরিশচন্দ্র তাঁহাকে অঙ্কিত করিয়াছেন। সেই সঙ্গে ত্যাগ ও ভোগ, প্রতিজ্ঞা ও মোহের দ্বন্দ্ব সংঘর্ষে এই চরিত্রটি অধিকতর সরস হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ফকিররাম ও চরণদাস এই দুইটি চরিত্রে শাশ্বত জাতীয় ভাবের সরস ও অভিনব অভিব্যক্তিই গিরিশচন্দ্র প্রদর্শন করিয়াছেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন যেমন বলিতেন "আমি জাতীয়তাকে ধর্ম্মের সহিত একাঙ্গীভূত মনে করি", তেমনি গিরিশচন্দ্রও বলিয়াছেন "ধর্ম্ম হিন্দু জীবনের কেন্দ্রস্বরূপ, হিন্দুকে জাগাইতে ও তাহার জাতীয় জীবন উন্নত করিতে হইলে ধর্ম্মের দ্বারাই হইবে। ধর্ম্ম হইতে তাহার জাতীয় জীবন পৃথক করিলে চলিবে না। তাহাকে যদি বুঝাইতে পার যে স্বদেশ রক্ষার জন্য তাহার মৃত্যু ধর্ম্মকার্য্যে মৃত্যু, তীর্থস্থানে মৃত্যু, তাহা হইলে এই হিন্দুদ্বারা অসাধ্য সাধিত হইতে পারে।" আমরা সৎনাম নাটকে ধর্ম্মের এই ব্যাখ্যাই একাধিক স্থানে দেখিতে পাই। ফকিররাম বলিতেছেন "এমন হিন্দু অতি বিরল যে ধর্ম্ম-রক্ষার জন্য কিছুমাত্র উত্তেজিত হয় না। আত্মীয়-রক্ষা, স্বদেশ-রক্ষা এ সকল কথায় কর্ণপাতও করে না; কিন্তু দেখ মুসলমানেরা দেবদেবী ভঙ্গ করছে, হিন্দুরা

জীবন উপেক্ষা ক'রে দেবদেবী ল'য়ে পলায়ন করে। দেখা যায় সে সময় তাঁহাদের মুসলমানের ভয় দূর হয়। তুমি যদি তোমার উপদেশ ও আদর্শে বোঝাতে পার যে, মাতৃভূমির জন্য যবনযুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করা অপঘাত নয়, কাশীমৃত্যু অপেক্ষা শ্রেয়ঃ, বোধ করি অনেকে তোমার কার্য্যে অস্ত্রধারণ কর্‌তে প্রস্তুত হয়।" স্বদেশভক্ত চরণদাসের মুখে এই কথারই পুনরুক্তি আমরা শুনিতে পাই। চরণদাস বলিতেছেন—"মৃত্যু-ভয় হিন্দুর নাই, বাঙ্গালী ব'লে এক জাতি হিন্দু আছে, জগত জুড়ে যাদের ভীরু বলে জানে, তাদেরও দেখেছি মৃত্যুকাল উপস্থিত হ'লে জাহ্নবী তীরে নিয়ে যেতে উৎসাহের সহিত স্বজনকে অনুরোধ করে। হিন্দুর ভয় কি জানো? যবনের হাতে ম'রে পাছে অপঘাত মৃত্যু হয়। হায়, হায়, যদি এই সংস্কার দূর হয়, যদি প্রকৃত ধর্ম্ম হিন্দুরা হৃদয়ে স্থান দেয়, তা'হলে বুঝ্‌তে পারে যে আত্মীয়রক্ষার জন্য, স্বগণ রক্ষার জন্য, দেশের জন্য, ধর্ম্মস্থাপনের জন্য প্রাণ দিলে কোটি জীবন গঙ্গায় সজ্ঞান মৃত্যুর ফল হয়। হায়, হায়, এ ধারণা হিন্দুর হৃদয়ে স্থান পেলে ভারত অজেয় হতো। অযথা শাস্ত্র ব্যাখ্যায় দেশ উচ্ছন্ন গেল।" ধর্ম্ম ও স্বদেশভক্তির সমন্বয়ে হিন্দুর যে সনাতন ধর্ম্মভাব, তাহাতে অনুপ্রাণিত হইয়াই মোহিনী বৈষ্ণবীকে বলিতেছে,—

মনে ছিল কাশীধামে ত্যজিব জীবন;—
কিন্তু শুনি তোমার বচন,
সে বাসনা নাহি আর,
যথাসাধ্য হ'ব তব কার্য্যে অনুকূল।

ক্ষুদ্র কার্য্য আমা হ'তে হ'লে সমাধান,
ভাবিব মা, সার্থক জনম।
বুঝিয়াছি কথায় তোমার,
যাগ-যজ্ঞ, তপ-যপ নাহি কিছু হেন
মাতৃভূমি-পূজা সম।
আছে বহু ধনরত্ন-কর মা গ্রহণ,
অর্জ্জন সফল হবে তব কার্য্য-ব্যয়ে।

২য় অঙ্ক, ৪র্থ গর্ভাঙ্ক।

রাণাপ্রতাপের চরিত্র পরিকল্পনাতেও গিরিশচন্দ্রের অদ্ভুত শিল্পচাতুর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রতাপসিংহের চরিত্র গিরিশচন্দ্রের মনের উপর এমনি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে তিনি একাধিক নাটক, প্রবন্ধ ও কবিতায় প্রতাপের কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। তাঁহার প্রথম নাটক 'আনন্দরহোর' কথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

আবার "হল্‌দিঘাটের যুদ্ধ" কবিতায় গিরিশচন্দ্রের "গম্ভীর আরাবে ভেরী ভেদিয়া গগনে" প্রতাপের বীরত্ব-গাথা শুনিতে পাই—

"জ্ব'লে জ্ব'লে ভস্মরাশি হয় দাবানল,
বেগবান ঘূর্ণবায়, নিজ বেগে লয় পায়,
সমুদ্র মন্থন করি ফণীন্দ্র বিকল ;
ক্রমে গৌরবের সনে, ক্ষত্রিয় শুইল রণে
অভাগী ভারত ভাগ্যে যবন প্রবল,
হল্‌দিঘাট ইতিহাসে রহিল কেবল।"

ইতিমধ্যে স্বর্গীয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় "অশ্রুমতী" নাটকে (১৮৮১) রাণাপ্রতাপের চরিত্র আলোচনা করেন। নাটকখানি সেই যুগের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক নাটক হইলেও বর্ত্তমান যুগে উহাকে বিশেষত্ব বর্জ্জিত বলিয়াই মনে হয়। তবে দ্বিজেন্দ্রলালের লেখনীতে রাণাপ্রতাপের চরিত্র বেশ সজীব হইয়া উঠিয়াছে (জুলাই, ১৯০৫)। কিন্তু প্রতাপসিংহ কিম্বা পারিপার্শ্বিক অন্য কোনও চরিত্রে নূতন আলোকপাত হয় নাই। গিরিশচন্দ্র "সৎনাম" ও অসমাপ্ত নাটক "প্রতাপসিংহে" যে বীর চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহাতে একদিকে যেমন তাঁহার আদর্শ দেশভক্তি, স্বদেশের জন্য সর্ব্বস্ব-ত্যাগ এবং অদ্ভুত বীরত্ব উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়াছে, আর একদিকে তেমনি ঐ বীরচরিত্রের দুর্ব্বলতা ও রাজনৈতিক অদূরদর্শিতাও প্রদর্শিত হইয়াছে। আকবরের সৈন্যব্যূহের সম্মুখে প্রতাপসিংহের পরাজয়ের প্রকৃত কারণ নির্দ্দেশ করিতেও গিরিশচন্দ্র ক্রুটী করেন নাই। গিরিশচন্দ্রের মতে প্রতাপসিংহ তাঁহার মৈত্রীলিপ্সু মানসিংহকে অপমান না করিলে হিন্দুস্থানে এত রক্তস্রোত প্রবাহিত হইত না। গিরিশচন্দ্র তাঁহার এই অভিমতটি কূটবুদ্ধিসম্পন্ন রাজনীতিজ্ঞ সম্রাট আকবরের মুখে প্রকাশ করিয়াছেন—

"আমি যদি রাণার অবস্থাগত হ'তেম, রাজ্য রক্ষার জন্য রাণা যে যে উপায় অবলম্বন কচ্ছে আমিও সেই সেই উপায় অবলম্বন কর্ত্তেম। কিন্তু এক স্থানে রাণার দুর্ব্বলতা দেখ্‌ছি। সেই দুর্ব্বলতার কারণও রাণার ধর্ম্ম—যে ধর্ম্মবলে রাণা আমার আনুগত্য স্বীকারে প্রস্তুত নয়। এই ধর্ম্মই তাহার নিধনের কারণ হবে।"

বীর প্রতাপের রাজনীতি-অনভিজ্ঞতা-সম্বন্ধেও আকবর সেলিমকে বলিতেছেন—

"আমি যদি রাণার অবস্থায় পতিত হ'তেম, যদি দিল্লীর সিংহাসনে হিন্দু স্থাপিত হ'তো, আর আরাবলী পর্ব্বত-প্রদেশ আমার অধিকারে থাক্‌তো, সে সময়, যদি ভয়ে অন্য অন্য মুসলমানেরা হিন্দুর বশ্যতাপন্ন হ'তো, এমন কি হিন্দুর ন্যায় তাদের আচরণ হ'তো, তা'হলেও আমি তাদের হিন্দু বলে ঘৃণা ক'রতেম না, স্বজাতি ব'লে গ্রহণ ক'রে উচ্চ সম্মান প্রদান ক'রতেম— সকলকে বন্ধু ক'রতেম, তাতে যে পাতক হ'তো তাদের সাহায্যে সমস্ত হিন্দুস্থান বিজয় ক'রে রাজসিংহাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক মক্কায় গিয়ে ফকীর বেশ ধারণ ক'রে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'রতেম। কিন্তু রাণা মূর্খ, মানসিংহকে অপমান ক'রে কেবল আত্মীয়দের পর ক'রেছে তা নয়—মুসলমান অপেক্ষা প্রবল শত্রু ক'রেছে। তাদের বিদ্বেষ মুসলমান অপেক্ষা রাণার প্রতি শতগুণে তীব্র হ'য়েছে। রাজনীতি-অনভিজ্ঞ রাণা তার এই বুদ্ধি-ভ্রমের সম্পূর্ণ প্রতিফল পাবে, অচিরে মিবার তোমার পদানত হবে।" এইখানেই গিরিশচন্দ্রের মৌলিকত্ব। চরিত্রাভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে ভারতের তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থা ও পতনের কারণ-সম্বন্ধে এইরূপ আলোচনা ও বিশ্লেষণ গিরিশচন্দ্র 'সৎনাম' নাটকে যেরূপ সংক্ষেপে ও সরল ভাষায় করিয়াছেন, এ পর্য্যন্ত কোন রাজনৈতিক সাহিত্যেও ঐরূপ সরল ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা দেখা যায় নাই। কিন্তু যে ভ্রম চিত্তরঞ্জন কখনও করেন নাই, আজ রাজনীতিক্ষেত্রে সেই ভ্রম অনুষ্ঠিত হইতেছে। ভারতের তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং রাষ্ট্রীয় অধঃপতনের কারণ-সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্রের অভিমত 'সৎনাম'

নাটকে যেভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে, আমরা এখানে তাহার একটু আলোচনা করিব।

রণেন্দ্র সৎনামী সম্প্রদায়ের একজন নেতা এবং শ্রেষ্ঠ বীর। তিনি গ্রামবাসীদিগকে মোগলের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু তাহারা অস্ত্রধারণ করিতে বিমুখ—তাহারা কথাও বলে, যেন ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া—

এখনো র'য়েছি সবে কন্যাপুত্র ল'য়ে,
বিচার-আলয়ে দণ্ড পায় অত্যাচারী।
কিন্তু হ'লে বিগ্রহে সজ্জিত,
গ্রাম পোড়াইবে, স্ত্রী-পুত্র বধিবে,
ধ্বংস হবে সৎনামীর দল।

আর একজন বলিতেছেন—

নাহি সেনা, নাহি অস্ত্র, নাহি লোকবল,
সম্প্রদায় কিরূপে বা ঐক্য হইবে ?
হইতে যবন-প্রিয় অর্থ-লালসায়,—
কেহ বা করিবে গুহ্য মন্ত্রণা প্রকাশ,
ধ্বংস হব প্রথম উদ্যমে।

গিরিশচন্দ্র এই রাজনীতির প্রতি কটাক্ষ করিয়া ফকিররামের মুখে বলিয়াছেন—

"এরই নাম বিজ্ঞতা! ডাঙ্গায় সাঁতার শিখে জলে নাব্‌তে হবে। খালি সভা ক'রে বাদশার কাছে আবেদন পাঠান যাক্।"

তারপর রণেন্দ্রের মুখে ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক অধঃপতনের কারণ গিরিশচন্দ্র ব্যক্ত করিয়াছেন—

কি হেতু বিপক্ষগণ অজেয় ভারতে ?
বীর্য্যহীন হিন্দুগণ এ নহে কারণ—
মেরুশির, উপত্যকা, বিশাল প্রান্তরে
হিন্দুর বীরত্ব-গাথা রয়েছে অঙ্কিত।
হিন্দুর পতন, অনৈক্য কারণ,—
দ্বেষ হিংসা পরস্পরে—
উচ্চ নীচ জাতি-অভিমান—
দৃঢ়ীভূত কুমন্ত্রীর উপদেশে—
ধর্ম্ম-অভিমানে—
স্বজাতি-বান্ধব-পরিত্যাগ।
অযথা শাস্ত্রের ব্যাখ্যা স্বার্থপর ব্রাহ্মণের মুখে ;
হীনমতি অশাস্ত্রীয় শাস্ত্র-ব্যাখ্যা শুনি,
অশাস্ত্রীয় হীন বিধি করিয়া আশ্রয়,
ভেদবুদ্ধি জন্মেছে ভারতে।
সেই হেতু স্বরূপ-শাস্ত্রের মর্ম্ম করিয়ে লঙ্ঘন
স্বতন্ত্রতা-ভাব যত হিন্দুর হৃদয়ে ;
ভারতের পতনের কারণ এ সব।
অংশে অংশে পরাজিত হয়েছে ভারত।

২য় নাগরিক।—মহাশয়, রাজপুতনায় রাজপুতগণ
প্রকাশিল অসীম বিক্রম।
কিন্তু কি ফল ফলিল ?

হিন্দু রক্ত বহিল কেবল,
এই মাত্র পরিণাম।
বীরেন্দ্র প্রতাপসিংহ করিল উদ্যম,
চিতোর না হইল উদ্ধার।
অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিল রাজপুত-বালা
বীরগণ শোণিত দানিল;
পুত্রকন্যা সনে মহারাণা ভ্রমিল কাননে,
নিষ্ফল সকলি কাল মোগল-বিগ্রহে।

রণেন্দ্র।—ভেদ-বুদ্ধি পরাজয় হেতু।
যবে বীরবর মানসিংহ অম্বর-ঈশ্বর
অতিথি হইল আসি রাণার আলয়ে,
একত্রে ভোজন অস্বীকার করিলেন রাণা।
বাদসাহে ভগিনী-অর্পণ
ঘৃণার কারণ তাঁর।
অভিমানে হলো বন্ধু-ভেদ,
হল্‌দিঘাটে বহিল শোণিত,
রাজপুত—রাজপুত প্রতিবাদী!

২য় নাগরিক।—যবনে ভগিনী-দান করিল যে জন,
নিষিদ্ধ তাহার সনে একত্রে ভোজন।

রণেন্দ্র।—এই শাস্ত্র-ব্যাখ্যা ধীর, ভেদ-বুদ্ধি হেতু।
সেই হিন্দু, বেদ যেই করে সত্যজ্ঞান।
হ'লে অনাচার, প্রায়শ্চিত্ত আছে তার,
তথাপি হিন্দু সেই, বেদ যদি মানে।

কিন্তু মুসলমানে কন্যাদান করে যেই কুলে
ভোজনে তাহার সনে হয় যদি পাপের সঞ্চার,
স্বদেশবৎসল নাহি গণে সেই পাপ।
যে সকল রাজপুতগণে
মুসলমান সনে কুটুম্বিতা করিলা স্থাপন,—
মহারাণা ত্যজি অভিমান,
সে সকলে দানিলে সম্মান,
আত্মহীন জ্ঞানে সবে, অবনত শিরে
শ্রেষ্ঠ মানি নেতৃপদে বরিত রাণায়;
পরে একত্র হইয়ে—মোগলে করিলে দূর
হিন্দুরাজা বসিত ভারত-সিংহাসনে।
মুসলমান-সংস্পর্শে—হয় যদি পাপের সঞ্চার
তুষানলে প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে সাধন,
হইতেন মহারাণা মোক্ষ-অধিকারী।
দেখ হিন্দুর কি ভ্রম!
করি বৃথা অভিমান,
বান্ধব-স্বজন করিয়াছে পরিত্যাগ;
মিত্র ছিল—শত্রু এবে সবে।
উচ্চ-পদস্থিত আছে বহু হিন্দুগণ
ঘৃণা মোরা করি সে সবারে।
*　　*　　*　　*　　*
এই ঘৃণা হেতু, সুশিক্ষিত হিন্দু যুবাগণে
স্বতন্ত্র জাতির সম করে অবস্থান।

কোন অন্ধবিশ্বাস, ভাবপ্রবণতা (sentiment) বা কোন ব্যক্তি-বিশেষের আদেশ-পালনের জন্য দেশ-হিতে রত হইলে

পতনের বিশেষ আশঙ্কা থাকে। তাই শুধু কর্ত্তব্যবোধের প্রেরণায় দেশহিতব্রতে রত হইবার বাণী গিরিশচন্দ্র গুলসানার মুখে বাঙ্গালী জাতিকে শুনাইয়াছেন :—

যদি ধর্ম্মের স্থাপনে, মাতৃভূমি উদ্ধার-কারণে
হিন্দুগণে হ'ত উত্তেজিত,
দেশ-হিতে রত,
ধর্ম্ম-মর্ম্ম বুঝে হ'ত ভারত জাগ্রত—
মোগলের সিংহাসন নিশ্চয় টলিত।
রাজপুত-প্রতাপ রাণা প্রমাণ তাহার ;
অটল স্বদেশভক্ত আকবর প্রভাবে।
শিবাজী মারহাট্টা বীর দ্বিতীয় প্রমাণ।
শিখ সেনা তৃতীয় দৃষ্টান্ত নরনাথ !

'সৎনাম' নাটকের কাল্পনিক চরিত্রগুলিও ঐতিহাসিক চরিত্রগুলিকে আরও অধিকতর স্পষ্ট ও উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। ঐ সকল চরিত্র-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন নাই, কারণ ঐগুলি গিরিশচন্দ্রের নাট্যকলার সহিত একাঙ্গীভূত (a part of his dramatic art)।

এই নাটকে সম্রাট্ ঔরঙ্গজীবের চরিত্রটি গিরিশচন্দ্র যে ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন তাহাতে সম্রাটের স্বাভাবিক স্বধর্ম্মানুরাগ, কর্ম্মকুশলতা এবং নির্ভীকতা সুন্দর হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 'দুর্গাদাস' নাটকে ঔরঙ্গজীবকে রমণীর অঙ্গুলি-সঞ্চালনে পরিচালিত করিয়াছেন। তাঁহার 'সাজাহানে' যুবক ঔরঙ্গজীব কৌশলী ও বীররূপেই অঙ্কিত হইয়াছে। সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের ঔরঙ্গজীব দুর্ব্বলপ্রকৃতি। ক্ষীরোদপ্রসাদ

'গোলকুণ্ডা'য় যুবক ঔরঙ্গজীবের গাম্ভীর্য্য ও কপটতাপূর্ণ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। তাঁহার "আলমগীরে" ঔরঙ্গজীব-চরিত্রকে উন্নত করিতে (idealise) চেষ্টা করিয়াছেন বটে কিন্তু তাহা বড়ই অস্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে। জিজিয়া কর স্থাপন, সকলকে অবিশ্বাস, নিষ্ঠুরতা—সমস্তই কোন একটি উচ্চতর আদর্শের প্রেরণায় অনুষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া ক্ষীরোদপ্রসাদ দেখাইয়াছেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের ঔরঙ্গজীব ঐতিহাসিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সম্রাট্ চিরসতর্ক, সদাবহিত—যখন যাহা করিতে হইবে তাহার আয়োজন বহুপূর্ব্ব হইতে যেন তিনি করিয়া রাখিয়াছেন। কেহই তাঁহার বিশ্বাস-ভাজন নহেন কিন্তু আপনার উপরে তাঁহার অগাধ বিশ্বাস—আর সে বিশ্বাস তিনি অনাড়ম্বর-চিত্তে, অকপটভাবে প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত নহেন। তিনি অসীম সাহসী—বিপদের সম্মুখীন হইতে একটুকুও পশ্চাৎপদ নহেন। তাঁহার চরিত্রের পরিচয় তাঁহার নিজ মুখেই প্রকাশ—

> জানো তুমি বিধিমতে,
> আরঙ্গজেব প্রত্যয় না করে কোন জনে।
> সুত, সুতা, জায়া
> অবিশ্বাস সকলের পরে।
> কিন্তু কহি স্বরূপ তোমারে
> চাহ যদি লয়ে যেতে সয়তান-সম্মুখে
> না হব পশ্চাৎপদ জানাই নিশ্চয়।

'ছত্রপতি শিবাজী'র 'আওরঙ্গজেব'ও অত্যন্ত কৌশলী। নিজে কাজ করেন কিন্তু কি নিকটবর্ত্তী কি দূরবর্ত্তী কোন স্থানের ঘটনাই তাঁহার দৃষ্টিকে অতিক্রম করিতে পারে না।

একটি কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। 'সৎনাম' নাটক 'প্রতাপাদিত্যের' পূর্ব্বে রচিত হইলেও তিনরাত্রি অভিনীত হইবার পর উহার অভিনয় বন্ধ হইয়া যায়। সুতরাং একমাত্র 'প্রতাপাদিত্য'ই বাঙ্গালীর প্রাণে কিছুদিন জাতীয় ভাবের উৎস প্রবাহিত রাখে। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই নাটক-খানির যথেষ্ট গুণ থাকিলেও ইহা প্রথমশ্রেণীর জাতীয় নাটক নহে। খাঁটি আদর্শ বাঙ্গালী-চরিত্র দেখিবার জন্য বাঙ্গালার রঙ্গ-মঞ্চের দর্শকগণকে আরও দুই বৎসর অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। ইতিমধ্যে বঙ্গ-ভঙ্গ হইলে মৃতপ্রায় বাঙ্গালীর প্রাণে নব জাগরণের তরঙ্গ আসিয়া লাগিল—মরাগাঙ্গে আবার বান ডাকিল। সেই স্বর্ণযুগে জাতীয় নাটকের ধারা-প্রবাহে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন সতেজ ও সজীব হইয়া উঠিল। ক্ষীরোদপ্রসাদের 'পদ্মিনী', 'নন্দকুমার', 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত', দ্বিজেন্দ্রলালের 'রাণাপ্রতাপ', 'মেবার-পতন', 'দুর্গাদাস' এবং গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজুদ্দৌলা' 'মিরকাশিম' ও 'ছত্রপতি শিবাজী' এই যুগের প্রসিদ্ধ নাটক। Elizabethএর সময় Spanish Armada ধ্বংস করিয়া ইংরেজ যখন জাতীয় গৌরবের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিল, তখন সেক্সপীয়র যেমন তাঁহার ঐতিহাসিক নাটকগুলি একে একে তাঁহার দেশবাসীর নিকট উপস্থিত করিয়াছিলেন, তেমনি বাঙ্গালার সেই নবযুগে জাতীয় ভাবগুলি নাট্যসাহিত্যের মধ্য দিয়াই সমধিক মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল এবং ক্ষীরোদপ্রসাদই সেই যুগের প্রসিদ্ধ জাতীয় নাট্যকার। তাঁহাদের নাট্যগ্রন্থের মধ্যে আবার গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজুদ্দৌলা' ও 'মিরকাশিম' কি আদর্শ বাঙ্গালী-চরিত্র-পরিকল্পনায়, কি চরিত্র-সৃষ্টিতে, কি মৌলিক চরিত্র-উদ্ধারে

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাটক। এখানে আমরা বিশদভাবে নাটক দুইখানির আলোচনা করিব।

এখানে জাতীয়তামূলক নাটক-সম্বন্ধে আর একটি কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক। জাতীয়তামূলক নাটকে আর্টের পরিচয় পাওয়া যায় না বলিয়া অনেকে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তাঁহারা বলেন উদ্দেশ্যমূলক বা ইতিহাসঘটিত নাটকে আর্ট থাকিতে পারে না। উদ্দেশ্যমূলক নাটক হেনরী দি ফোর্থ, হেনরী দি ফিফ্‌থ্‌ ও রিচার্ড দি থার্ডে আর্ট নাই কি? উদ্দেশ্যবিহীন কোন কল্পনা কোন উপন্যাসে শোভা পাইলেও নাটকে তাহার স্থান নাই। আর সৌন্দর্য্যই যদি আর্টের প্রধান উপাদান হয়, তাহা হইলে জাতীয়তা, স্বদেশপ্রেম ও পরহিত-ব্রত অপেক্ষা অধিকতর সুন্দর উপাদান আর কি আছে? যে কারণে সেক্সপীয়রের হেনরী দি ফিফ্‌থ্‌ দেশপ্রেম উদ্দীপ্ত করিয়াও শ্রেষ্ঠ নাটক, যে কারণে সিলার যিশু-জননী কুমারী মেরীর চরিত্রে মায়িক প্রেমের পরপারবর্ত্তী অপার্থিব মহাপ্রেমের স্বর্গীয় মাধুর্য্য ফুটাইয়া তুলিয়া নাটকখানিকে সার্থক করিয়াছেন, সেই কারণেই গিরিশচন্দ্রের ঐতিহাসিক নাটক পবিত্র দেশভক্তির মন্ত্রে জাতিকে দীক্ষিত করিয়াও শ্রেষ্ঠ আর্টের পরিকল্পনায় সমধিক উজ্জ্বল।

গিরিশচন্দ্রের ঐতিহাসিক নাটকেও পাশ্চাত্ত্য প্রভাব সমধিক পরিলক্ষিত হয়। অনেক চরিত্রে সেক্সপীয়রের ছায়াপাত হইয়াছে। মার্লো প্রভৃতি পূর্ব্ববর্ত্তী নাট্যকারগণের নিকট হইতে চরিত্রের আভাস গ্রহণ করিয়াও সেক্সপীয়র সেক্সপীয়র। গিরিশ-চন্দ্রে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব পরিলক্ষিত হইলেও, গিরিশ গিরিশই।

'সিরাজুদ্দৌলা' ও 'মিরকাশিম' নাটকে খাঁটি বাঙ্গালীর জাতীয়তা যে কিরূপ সুন্দর হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, নাটক

দুইখানির প্রচার ও অভিনয় গভর্নমেণ্ট বন্ধ করিয়া না দিলে পাঠকবর্গ তাহার পরিচয় লাভ করিবার সুযোগ পাইতেন। তবে গভর্নমেণ্ট উক্ত নাটক দুইখানির কতক অংশ আমাকে প্রকাশ করিবার অনুমতি দেওয়ায় আমি এখানে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। ইতিপূর্ব্বে বিদেশী বণিক্ ও তথাকথিত ঐতিহাসিকগণ-কর্ত্তৃক লিখিত বিবরণ এবং কবিবর নবীন সেন মহাশয়ের "পলাশীর যুদ্ধ" পাঠ করিয়া সিরাজ-সম্বন্ধে সাধারণের হৃদয়ে খুব অনুদার ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু পণ্ডিতপ্রবর স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, সি.আই.ই. মহোদয় এবং নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ সিরাজের চরিত্র ও কার্য্যাবলী-সম্বন্ধে প্রকৃত সত্য উদ্ধার করিয়া দেশবাসীর নিকট উপস্থিত করায় সিরাজ-সম্বন্ধে দেশবাসীর পূর্ব্ব ধারণার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। উভয়েই ক্ষমতাশালী লেখক এবং জাতীয় চরিত্র উদ্ধার করায় উভয়েই বঙ্গবাসী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন। কিন্তু একজনের রচনা ইতিহাস আর একজনের রচনা নাটক। ইতিহাস গম্ভীর, সুসংযত এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ। নাটকখানিতে গিরিশচন্দ্রকে সত্যকে ভিত্তি করিয়াই স্থানে স্থানে পারিপার্শ্বিক ঘটনার সহিত কল্পনা মিশাইয়া সিরাজ-চরিত্র ফুটাইয়া তুলিতে হইয়াছে। গিরিশ তাঁহাকে রক্ত-মাংসের মানুষ করিয়াই গড়িয়া তুলিয়াছেন। 'বসুমতী'-সম্পাদনকালে রায় জলধর সেন বাহাদুর মহাশয় সত্যই বলিয়াছিলেন "ইতিহাসের সিরাজুদ্দৌলা সেকালের মানুষ, তাঁহাকে একালের লোকে ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই। নাটকের সিরাজুদ্দৌলাকে সকলেই বুঝিতে পারিয়াছে। যাঁহারা অভিনয় দেখিয়াছেন তাঁহারাই তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছেন।" ইতিহাসের মর্য্যাদা-রক্ষা-সম্বন্ধে স্বয়ং

অক্ষয়কুমারও গিরিশচন্দ্রকে লিখিয়াছিলেন, "ইতিহাস যাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছে আপনি তাহাই প্রত্যক্ষবৎ ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন।......আপনি যে ইতিহাসের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া নাটকের সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধি করিতে পারিয়াছেন, ইহাই আপনার রচনা-প্রতিভার প্রচুর আত্মপ্রসাদ। ইতিহাস লিখিয়া সুখী হইতে পারি নাই, লিখিতে লিখিতে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছি। নাটক পড়িয়াও সুখী হইতে পারিলাম না, পড়িতে পড়িতে অশ্রু বিসর্জ্জন করিলাম।" সুরেন্দ্রনাথ-সম্পাদিত সাময়িক 'বেঙ্গলী' পত্রিকাও গিরিশ-প্রতিভার সাক্ষ্য-প্রদান করিতেছে—

" Both from the dramatic and literary point of view Sirajuddowla is destined to occupy a high and an enduring place in our national literature. As a piece for the stage it is non-pareil ; and it requires no mean talent to interpret the diverse and complex characters that the gifted author has marshalled in it and......"

সিরাজ যে কৈশোরে দুর্ব্বিনীত এবং প্রথম যৌবনে উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন, কিন্তু সিংহাসনে আরোহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই যে তিনি মিতাচারী হইয়া প্রজারঞ্জন-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য-প্রদান করিতেছে। গিরিশচন্দ্রও ইতিহাস বজায় রাখিয়াই সিরাজের মুখে তাঁহার প্রকৃত পরিচয় প্রদান করিতেছেন :—

স্বেচ্ছাচারে চালিত জীবন
হিতাহিত ছিল না বিচার,

মদ্যপানে করিয়াছি
শত শত দুর্নীত ব্যাভার।
কিন্তু কহি স্বরূপ বচন—
বসি' বৃদ্ধ নবাবের মরণশয্যায়,
শেষ বাক্যে তাঁর
জন্মিয়াছে ধারণা আমার,
রাজকার্য্য নহে স্বেচ্ছাচার।
নবাব প্রজার ভৃত্য, প্রভু প্রজাগণে ;
প্রজার মঙ্গল-সাধন
নবাবের উদ্দেশ্য জীবনে।

১ম অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক।

এখানে হেনরী দি ফিফ্থ্এর Archbishop of Canterburyর কথা মনে পড়িতেছে—

The courses of his youth promised it not.
The breath no sooner left his father's body,
But that his wildness, mortified in him,
Seem'd to die too : yea, at that very moment
Consideration, like an angel, came
And whipp'd the offending Adam out of him,
Leaving his body as a paradise,
To envelope and contain celestial spirits.
Never was such a sudden scholar made ;
Never came reformation in a flood,
With such a heady current, scouring faults ;
Nor never Hydra-headed wilfulness

So soon did lose his seat, and all at once,
As in this king.

King Henry V, Act I, Sc. i.

গিরিশচন্দ্রের অঙ্কিত সিরাজ-চরিত্র-সম্বন্ধেও একথা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। ষোড়শ শতাব্দীতে সেক্সপিয়র-রচিত হেনরী দি ফিফ্‌থ্‌-চরিত্র সিরাজ-চরিত্র অপেক্ষা উন্নত না হইলেও তিনি ইংলণ্ডের বীররাজা। আর অষ্টাদশ শতাব্দীর সিরাজ চরিত্র বহু সদ্‌গুণে অলঙ্কৃত হইয়াও জনসমাজে সয়তানরূপে প্রতিভাত।

সর্ব্বোপরি, নাটকে সিরাজের স্বদেশভক্তি এবং জাতীয়তা সমধিক প্রদর্শিত হইয়াছে। সিরাজ কখনও অমাত্যবর্গকে বুঝাইতেছেন—

"হে অমাত্যগণ, আমায় শত্রু বিবেচনা ক'রবেন না। কিন্তু যদি সত্যই শত্রু হই, আমি আপনাদেরই শত্রু, বাঙ্গালার শত্রু নই। আপনাদের যদি বর্জ্জন করা আমার অভিপ্রায় হয়, আপনাদের পরিবর্ত্তে বঙ্গবাসীকেই রাজকার্য্য প্রদান করবো, আপনাদের আত্মীয়স্বজন স্বদেশীই নির্ব্বাচিত হবে। হিন্দু-মুসলমান এক স্বার্থে বাঙ্গালায় আবদ্ধ, সে স্বার্থের বিঘ্ন হবে না। বঙ্গবাসীর পরিবর্ত্তে বঙ্গবাসীই রাজকার্য্য প্রাপ্ত হবে।"

আবার তিনি কখনও অমাত্যগণের হস্তধারণ করিয়া ক্ষমা চাহিতেছেন—

ওহে হিন্দু মুসলমান!
এসো, করি পরস্পর মার্জ্জনা এখন;

হই বিস্মরণ পূর্ব্ব বিবরণ,
করো সবে মম প্রতি বিদ্বেষ-বর্জ্জন।

কখনও-বা বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন দেখিয়া মীরমদনকে উদ্দেশ করিয়া আক্ষেপের সহিত বলিতেছেন—

"মীরমদন, জন্মভূমির আশা বিলুপ্ত। যদি কখনও সুদিন হয়, যদি কখনও হিন্দুমুসলমান জন্মভূমির অনুরাগে ধর্ম্মবিদ্বেষ পরিত্যাগ ক'রে পরস্পর মঙ্গল-সাধনে প্রবৃত্ত হয়, উচ্চস্বার্থে চালিত হ'য়ে সাধারণের মঙ্গলের সহিত আপনার মঙ্গল বিজড়িত জ্ঞান করে, যদি ঈর্ষ্যা, বিদ্বেষ, নীচপ্রবৃত্তি দলিত ক'রে স্বদেশ-বাসীর অপমান আপনার অপমান জ্ঞান করে—তবেই আশা, নতুবা সব নিষ্ফল।"

বাস্তবিক, ক্ষমাশীল, সাহসী, প্রজাবৎসল নবাবকে গিরিশ এমন জাতীয় মনোভাবসম্পন্ন রক্তমাংসের মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন যে মনে হয়, সিরাজ যেন আমাদের যুগেরই মানুষ—আমরা যেন তাঁহাকে প্রত্যক্ষই দেখিতে পাইতেছি।

এ দিকে আবার ব্যক্তিগত স্বার্থের যূপকাষ্ঠে জাতীয়তাকে বলিদান করিলে দেশের কি ভয়ানক সর্ব্বনাশ সাধিত হয় তাহাও দেখাইবার জন্য তৎকালীন ঘটনাকে এ যুগের উপযোগী করিয়া গিরিশচন্দ্র জহরার মুখে বলিতেছেন—

"মিরজাফর বল, ইয়ারলতিফ বল, রাজবল্লভ বল, সকলেই নবাবীর জন্য ব্যস্ত,—রাজ্যের মঙ্গলার্থ নয়, দুর্দ্দান্ত নবাবকে দমন ক'রবার জন্য নয়, প্রজার শান্তির জন্য নয়, স্বার্থের জন্য।"

'সিরাজুদ্দৌলা' নাটকে ইংরেজের জাতীয় গুণগুলি—তাহাদের কর্ম্মকুশলতা, স্বদেশপ্রেম, স্বজাতিপ্রীতি, রাজনৈতিক

দূরদৃষ্টি ও বীরত্ব সমস্তই খুব সুন্দর হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিশ্বাসঘাতক অনুচরবর্গের চক্রান্তেই যে সিরাজের সর্ব্বনাশ সাধিত হয়—বাঙ্গালার সিংহাসন তাঁহার হস্তচ্যুত হয়, তাহা সকলেই অবগত আছেন। সিরাজের পতনে Julius Ceaser নাটকের Antonyর কথাগুলি স্বতঃই আমাদের মনে পড়ে—

O, what a fall was there my countrymen !
Then I and you and all of us fell down
Whilst bloody treason flourished over us.

গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজুদ্দৌলা' নাটকখানি পাঠ করিতে করিতে সেক্সপিয়রের "রিচার্ড দি সেকেণ্ড"এর কথা পাঠকের স্মৃতিপথে উদিত হয়। উভয় নাটকেই নিরীহ রাজা বিশ্বাসঘাতক আত্মীয়বর্গের ষড়যন্ত্রে রাজ্যভ্রষ্ট ও নিহত হন। উভয় নাটকেই করুণরসের উৎস প্রবাহিত হইয়াছে। কিন্তু একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, রিচার্ড দি সেকেণ্ড অপেক্ষাও গিরিশের সিরাজ-চরিত্রের পরিকল্পনা অধিকতর মনোহর হইয়াছে। বস্তুতঃ জন্মভূমির জন্য সিরাজের অন্তর্ব্যথা, তাঁহার শোকাবহ পরিণামকে এমন আর্দ্ররসাভিষিক্ত করিয়াছে যে, রিচার্ড দি সেকেণ্ডের করুণরসও এখানে ম্লান হইয়া যায়। রাণীর প্রতি রিচার্ডের করুণোক্তিতে—

Join not with grief, fair woman, do not so,
To make my end too sudden ; learn, good soul,
To think our former state a happy dream ;
From which awak'd the truth of what we are
Shows us but this.

Richard II, Act V, Sc, i.

সিরাজের বিষাদপূর্ণ উক্তিই প্রতিভাত হইয়া উঠে। রিচার্ডের -

And my large kingdom for little grave—
A little, little grave, an osbcure grave.

এই উক্তি ভগবানগোলা হইতে পুনর্যাত্রারতা লুত্‌ফ্‌উন্নিসার প্রতি ক্ষুৎপিপাসাতুর সিরাজের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়—

নাহি আর সম্ভাবনা তার—
নাহি হয় আশার সঞ্চার,—
মহা ভয় উদয় হৃদয়ে
হেরি ভবিষ্যৎ ছবি তমোময়।
যদি কেহ আশ্রয় প্রদানে বালিকায়,
দোঁহে মিলি প্রবেশি সলিলে।
ধরাবাস কারাবাস সম—
হেরি মোরে নতশির হ'ত রাজগণে
এবে দেবস্থানে বসিয়ে নির্জ্জনে
আতঙ্কে কম্পিত প্রাণ।
ভোজ্য হেতু পর-উপাসনা,
একমাত্র সুখকর মরণ-কল্পনা।

রিচার্ড যেমন নিজ অবস্থার কথা বলিতেছেন—

O that I were a mockery king of show!

ভগবানগোলায় আশ্রয় লইবার সময় নিঃসহায় সিরাজের অনুতাপও সেরূপ মর্ম্মস্পর্শী ও বীরজনোচিত,—

প্রিয়ে ফুরায়েছে রাজ-অভিনয়
কল্পনায় না হয় উদয়—

* * * *

বঙ্গসিংহাসন না জানি কি কুহকে গঠন।

অধিকারী বর্ত্তন তাহার, কুহক প্রভাবে যেন।

* * * *

শুনি অষ্টাদশ জন পাঠান আসিয়ে

লইল কাড়িয়ে লক্ষ্মণ সেনের গদি।

বসিল পাঠান যবে হিন্দু সিংহাসনে

বঙ্গবাসিগণ না করিল অঙ্গুলি-চালন ;

এবে দূরদেশী মুষ্টিমেয় বিদেশী যুঝিল,

* * * *

রণস্থলে সশস্ত্র দাঁড়ায়ে

অভিনয় নেহারিল বিপুল বাহিনী।

হয় অনুভব—

বঙ্গের এ জলবায়ু-মৃত্তিকা-প্রভাব।

রাজলক্ষ্মী চঞ্চলা সতত ;

কহে যত হিন্দুগণে,

সে চাঞ্চল্য প্রকাশিত বঙ্গভূমে যথা

নাহি হেন অন্য কোন স্থানে।

পুত্রের মমতা নাহি

বঙ্গমাতা-হৃদে।

এই নাটকে করিম চাচা ও জহরা এই দুইটি চরিত্র গিরিশ-চন্দ্রের অপূর্ব্ব সৃষ্টি। দুইটি চরিত্রই কাল্পনিক হইয়াও বাস্তবে পরিণত হইয়াছে। জহরা-চরিত্রই তাৎকালীন বাঙ্গালার রাজনৈতিক অবস্থার প্রতিবিম্ব ; আর করিম চাচা যেন অঙ্গুলি-সঙ্কেতে বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ চিত্রটি দেখাইয়া বলিতেছেন, "জুতোর

মহিমা তখন বুঝ্‌তে পারলুম না.........। এখন ভদ্রলোক ছোটলোক জুতোয় পরিচয় দিবে।" করিম যেমন রাজভক্ত ও স্বদেশ প্রেমিক, তেমনি আবার দূরদর্শী। কি ছোট কি বড় কাহাকেও সে সত্য কথা বলিতে কুণ্ঠিত হয় না। তাহার চরিত্রে ভয়ের লেশমাত্রও নাই। তাহার অন্তর্ভেদী দৃষ্টি রসিকতার আবরণে লুক্কায়িত। সেক্সপীয়রের 'As you like it'এর Jaques ও 'King Lear'এর Kent-চরিত্র একত্র করিলেও করিম চাচার সহিত তুলনা হয় না। দার্শনিক Jaques অপ্রিয় সত্য শুনাইবার জন্য ভাঁড় সাজিতে চাহেন, "I am ambitious for a motley coat." আবার অন্য দিকে সে Lear নাটকের Kentএর ন্যায় রাজভক্ত, স্পষ্টবক্তা ও সাহসী। বিশ্বাস-ঘাতকদের সম্বন্ধে Kent যেমন বলিতেছেন—

Such smiling rogues as these
Like rats oft bite the holy cords a-twain
Which are too intrinsic t' unloose
smooth every passion
That in the nature of their lords rebel.

করিমচাচাও, মিরজাফর তাহাকে বেইমান বলিয়া সম্বোধন করিলে, খুব সরস ভাষায়ই নির্ব্বিকার চিত্তে উত্তর প্রদান করেন—

"বেইমানি তো আমার একচেটে নয়, আমি তো হংসমধ্যে বকো যথা। বেইমানির যদি সাজা থাক্‌তো, তা হ'লে সারিসারি মুণ্ড গড়াতো।"

গিরিশচন্দ্র স্বয়ং এই ভূমিকায় অবতরণ করিতেন।

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি জহরা বাঙ্গালার তদানীন্তন

অবস্থার প্রতিবিম্ব-স্বরূপ। এ পর্য্যন্ত এরূপ অদ্ভুত চরিত্র কেহ সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। রিচার্ড দি থার্ডের Queen Margaret-চরিত্রে জহরার কিঞ্চিৎ সৌসাদৃশ্য দেখা গেলেও, জহরার পরিকল্পনা সমধিক মহত্তর। বিখ্যাত সমালোচক Hudson মার্গারেট-সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

Long suffering has deepened her fierceness into sublimity. At once vindictive and broken-hearted, her part runs into a most impressive blending of the terrible and pathetic.

জহরা-সম্বন্ধে এই কথা সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য হইলেও, জহরা কেবল মার্গারেটের ন্যায় শত্রুর পরাজয় দেখিয়াই সন্তুষ্ট হইতে চাহেন না;

Here in these confines slily have I lurk'd
To watch the waving of mine enemies.
Richard III, Act IV, Sc. iii.

তাহার ক্ষিপ্রকারিতা, কর্ম্মকুশলতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযান চালাইয়া তাহাকে নিঃশেষে ধ্বংস করিবার আয়োজন করিতেই তিনি যেন সর্ব্বদা সচেষ্ট। সিরাজকে জনসমাজে সয়তানের অবতার বলিয়া ঘোষণা করিতে, সিরাজের বিরুদ্ধে ইংরাজের সহায়তা করিতে জহরা সর্ব্বদাই 'বায়ুর ন্যায় ক্ষিপ্রগতি।' জহরা ক্লাইভ ও ওয়াটসন্‌কে পরামর্শ দিতেছে, সিরাজের গুপ্ত-মন্ত্রণা বলিয়া দিয়া তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেছে, এ দিকে আবার মিরজাফরের প্রাণে আকাঙ্ক্ষার ক্ষুধা জাগাইয়া তুলিতেছে। "Bellona herself" বলিয়া ক্লাইভ তাহার যথার্থ পরিচয়ই প্রদান করিয়াছেন।

রঙ্গমঞ্চে যাঁহারা এই ভূমিকায় সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন তন্মধ্যে প্রখ্যাতনাম্না অভিনেত্রী শ্রীমতী তারাসুন্দরীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা।

জহরা-চরিত্র কল্পনাপ্রসূত হইলেও ঘেসেটি বেগম যে গোপনে ইংরাজকে অর্থ দিয়া সহায়তা করিয়াছিল তাহা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ঘটনা। গিরিশচন্দ্র জহরাকে এই গুপ্ত-সাহায্যের বাহিকারূপে উপস্থিত করিয়াও তাহাকে উজ্জ্বলভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন।

প্রতিহিংসা-পরায়ণতায় ক্ষীরোদপ্রসাদের 'ভীষ্ম' নাটকের অম্বা এবং অপরেশচন্দ্রের 'শ্রীকৃষ্ণ' নাটকের প্রাপ্তি—এই দুইটি চরিত্রে জহরার কিঞ্চিৎ ছায়া পড়িয়াছে। কিন্তু ইহা জহরার সামান্য একটা দিক্ মাত্র।

'সিরাজদ্দৌলা' নাটকের আর একটি চরিত্র উল্লেখ করা আবশ্যক। ইনি সিরাজপত্নী লুৎফ্ উন্নেসা। একমাত্র হেনরী দি ফোর্থ নাটকের Lady Percyর সহিত তাহার তুলনা হইতে পারে। কিন্তু লুৎফ্ Lady Percy অপেক্ষাও দুর্ভাগিনী। লুৎফ্ কবির অশ্রুবিন্দুতে সৃষ্ট। তাহার শেষ সঙ্গীতটি—

"ধীরে বহ সমীর........."

বড়ই মর্ম্মস্পর্শী।

এই নাটকে ক্লাইভ অন্যতম 'হিরো'। গিরিশচন্দ্র স্বদেশের বীরকে আদর্শ বীর চরিত্র-রূপে অঙ্কিত করিলেও বিদেশী বীর ক্লাইভ চরিত্রকে একটুকুও ক্ষুণ্ণ করেন নাই। চরিত্র-অঙ্কনে এইখানেই গিরিশচন্দ্রের কৃতিত্ব। উচ্চ লক্ষ্য, বীরত্ব, উদার-ভাব, জাতীয়তা এবং দুরদর্শিতা ক্লাইভ-চরিত্রকে মহিমমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে। এইরূপ চরিত্র-সৃষ্টি কেবল গিরিশচন্দ্রের

সিদ্ধ লেখনীতেই সম্ভব। আমাদের মনে হয় ইংরাজি নাটক Clive of Indiaতে Cliveএর চরিত্র যাহা ফুটিয়াছে তাহা ঠিক ইতিহাস-সম্মত নয়। 'বীরপূজা' অথবা 'Spirit of Hero Worship'এ উহা একটু অতিরঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু গিরিশ 'সিরাজদ্দৌল্লা'র ক্লাইভের নিখুঁত ঐতিহাসিক চিত্র আঁকিয়াছেন। তৎকালীন উদীয়মান অভিনেতা শ্রীযুত ক্ষেত্র-মোহন মিত্র মহাশয় এই চরিত্রটিকে রঙ্গমঞ্চেও অতি সুন্দররূপে পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছিলেন।

'মিরকাশিম' নাটক সিরাজদ্দৌল্লার সময়ের প্রায় দশ বৎসর পরের ঘটনা লইয়া রচিত। বাঙ্গালায় তখন অরাজকতার রাজত্ব বিস্তার করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের "আনন্দমঠে"র ভাষায় বলিতে হয়, "মিরজাফর তখন গুলি খায় ও ঘুমায়। ইংরেজ টাকা আদায় করে, আর ডেস্‌প্যাচ্‌ লেখে। বাঙ্গালী কাঁদে আর উৎসন্ন যায়।" এক দিকে লর্ড ক্লাইভের Double Government আর এক দিকে কোম্পানীর সাহেবদের এক-চেটিয়া বাণিজ্যের অন্যায় লোভ—দেশে ভয়ানক অশান্তির সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছিল। সেই সময় মিরকাশিম চাহিলেন বাঙ্গালার নবাব হইতে—নামে বা ঘুমাইয়া নবাব নয়, সত্যিকারের নবাব। বাঙ্গালার মসনদের স্বাধীনতা ও মর্য্যাদা পুনরুদ্ধারের জন্য মিরকাশিম একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিলেন। কিন্তু সেই মনুষ্যত্বের সংগ্রামে তাঁহাকে ব্যর্থমনোরথ হইতে হইল। এই ঘটনা লইয়াই 'মিরকাশিম' নাটক রচিত।

'সিরাজদ্দৌলা' ও 'মিরকাশিম' উভয় নাটকই জাতীয় ভাবে পরিপূর্ণ হইলেও উভয়ের ভাবধারা দুইটি পৃথক্ স্রোতে প্রবাহিত হইতেছে। সিরাজের পদ-মর্য্যাদা, তাঁহার মাতামহ আলিবর্দ্দী

খাঁর প্রসাদে। আর মিরকাশিমকে সব কিছুই নিজের বুদ্ধি ও বাহুবলে অর্জ্জন করিয়া লইতে হইয়াছিল। স্বদেশে ষড়যন্ত্র, প্রবাসে বিশ্বাসঘাতকতা, যুদ্ধে পরাজয়, সর্ব্বশেষে হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া ফকিরবেশে নানা স্থানে ভ্রমণ—অদৃষ্টের বিড়ম্বনা—এই সমস্তই বিভিন্ন মূর্ত্তিতে চারিদিক্ হইতে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ফেলিয়াছিল। বিশেষতঃ তাঁহার সময়ে ইংরেজ সিরাজের সময় অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে, মোহনলাল ও মীরমদনের মত বিশ্বাসী সেনানায়কও তাঁহার ছিল না, কৃতঘ্নতায় হিন্দু ও মুসলমান যেন সে সময়ে প্রতিযোগিতা করিয়া পরস্পরকে অতিক্রম করিবার প্রয়াস পাইতেছিল। এত শত্রুতা, এত বিপদ্ ও দুর্য্যোগের মধ্যেও মিরকাশিম যে সাহস ও ধৈর্য্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, গঠনমূলক কার্য্যে তাঁহার যে অসামান্য প্রতিভার প্রভাব ও আত্মমর্য্যাদা অক্ষুন্ন রাখিয়া তিনি যেরূপ স্ফীত বক্ষে ও উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা পৃথিবীর যে কোন দেশের শ্রেষ্ঠ জাতীয় নেতার পক্ষেই গৌরবের বিষয়।

'সিরাজদ্দৌলা' ও 'মিরকাশিম' অভিনয়ের চতুর্দ্দশ বৎসর পরে বাঙ্গালার সেই অতীতের ইতিহাসে বাঙ্গালী এইরূপ একজন আত্মত্যাগী মহাপুরুষকে আদর্শ নেতৃরূপে লাভ করিতে পারিয়াছিল। বাঙ্গালার ভাবধারার অগ্রদূত, গভীর অন্তর্দ্দৃষ্টি-সম্পন্ন নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ১৯০৬ খৃষ্টাব্দেই মিরকাশিম চরিত্র অঙ্কিত করিয়া ভাবী আদর্শ নেতার সন্ধান বাঙ্গালীকে দিয়াছিলেন। মিরকাশিম যেমন তাঁহার আড়ম্বর-শূন্য জীবন-সম্বন্ধে বলিতেন, "আমার রাজভোগ অতি সামান্য ব্যক্তিও ঈর্ষ্যা ক'রবে না," প্রজার দুঃখে তাঁহার হৃদয়

যেমন ব্যাকুল হইয়া উঠিত, নিজে আত্মত্যাগের পরা কাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া অনুচরবর্গকে আত্মগৌরব ও যশোলিপ্সা-ত্যাগের ব্রতে দীক্ষিত করিতেন, এই মহাপুরুষের জীবনেও সবই সেইরূপ ঘটিয়াছিল। মিরকাশিমের মহত্ত্বের কথা উল্লেখ করিয়া মেজর মন্‌রোর ন্যায় ইংরাজ যেমন বলিতেন "তিনি দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছেন সত্য, কিন্তু ইংরেজের চক্ষে তাঁহার মনুষ্যত্ব খর্ব্ব হয় নাই। তিনি ইংরেজদের একজন উপযুক্ত শত্রু, আমি অন্তরের সহিত তাঁহাকে মিরজাফর অপেক্ষা অধিক শ্রদ্ধা করি।" দেশবন্ধুর সম্বন্ধেও অনেক বিশিষ্ট ইংরাজ এইরূপ বলিতেন। এই উভয় নায়কের ভূমিকায়ই গিরিশচন্দ্রের পুত্র দানীবাবু ছিলেন অতুলনীয়।

মিরকাশিমের বেগমকেও গিরিশচন্দ্র প্রকৃত বীরাঙ্গনা করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। বেগম ঈশ্বরের নিকট স্বামীর মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে যুদ্ধে পাঠাইতেন, নিজ হস্তে স্বামীকে রণসজ্জায় সজ্জিত করিয়া দিতেন আর তিনি নিজেকে মনে করিতেন তাঁহার স্বামীর অধীন সৈন্যগণের জননী। বেগম মিরকাশিমকে বলিতেছেন, "আমি যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকবো, প্রয়োজন হয় স্বদেশবৎসল বীরগণের সহিত যুদ্ধে দেহত্যাগ করবো, আমি তোমার পত্নী, তুমি আমাকে বিলাসিনী রমণীজ্ঞানে উপেক্ষা ক'রো না।" এখানে Julius Cæser নাটকে Brutus এর প্রতি Portiaর কথা আমাদের মনে পড়িতেছে—

Am I your self,
But as it were, in sort or limitation
To keep with you at meals, comfort your bed
And talk to you sometimes?

মিরকাশিমের পত্নী যেমন বলিতেন—

"আমি তোমার পত্নী, আমায় উপেক্ষা ক'রো না।"

Portiaও তেমনি বলিয়াছেন—

I grant I am a woman, but withal
A woman that Lord Brutus took to wife.

বস্তুতঃ মিরকাশিম-বেগম আদর্শ নায়কেরই যোগ্যা সহধর্ম্মিণীরূপে চিত্রিত হইয়াছে।

'মিরকাশিম' নাটকেও গিরিশ ইংরাজের জাতীয়তার সুস্পষ্ট পরিচয় হে সাহেবের মুখে দিতেছেন—

"আমরা ঘরের ভিতর ঝগড়া করে, duel লড়ে, লেকেন দুসরা যখন দুষমন খাড়া হবে, সব ঘরোয়া ঝগড়া মিটিয়া যাইবে। হামাদের সব শিখিতে পারিবে, হামাদের এইটা ইণ্ডিয়া শিখিতে পারিবে না। জাতের দুষমন সবার দুষমন, এ ইণ্ডিয়ান লোক কখনও শিখিবে না।"

এইরূপ উক্তিতে সিরাজদ্দৌলা ও মিরকাশিম নাটক পরিপূর্ণ।

মিরকাশিমের পরবর্ত্তী নাটক 'ছত্রপতি শিবাজী'। শিবাজী একেবারে পূর্ণ বিকসিত চরিত্র। গিরিশ এখানেও ইতিহাসের মর্য্যাদা সম্পূর্ণরূপে বজায় রাখিয়াই শিবাজী-চরিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

এই সমস্ত নাটক-সম্বন্ধে Dowdenএর মতই বলিতে হয়—

The world represented in these plays is not so much the world of feeling or of thought, as the limited world of the practicable.

ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই শিবাজী ও রামদাস স্বামীর মধ্যে নিবিড় সম্বন্ধের কথা অবগত আছেন। মারুতির অবতার রামদাস স্বামী শিবাজীর কেবল দীক্ষাগুরুই ছিলেন না, শিবাজী তাঁহাকে তাঁহার সমস্ত কার্য্যেরই কর্ত্তৃস্বরূপ জ্ঞান করিতেন, ছত্রপতি হইয়াও তিনি আপনাকে রামদাস স্বামীর কিঙ্কর মাত্র মনে করিতেন। যে অবস্থার মধ্যে যে strategic pointএ এই মহাপুরুষ শিবাজীকে প্রথম দর্শন-দান করেন তাহাও বড় সুন্দর। শিবাজী হিন্দুর ন্যায় মুসলমান কুল-কামিনীকেও মাতৃজ্ঞানে সম্মান করিতেন। আর তিনি মনে করিতেন "স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষ মাত্রেই এক জাতীয়, স্বাধীনতায় তারা একসূত্রে আবদ্ধ।" তাই তাঁহার মনে হিন্দুমুসলমানে কোন ভেদ-জ্ঞান ছিল না। তাঁহার মন যখন হিন্দু-মুসলমানের ভেদ-জ্ঞান হইতে মুক্ত হইয়াছিল ঠিক সেই সময়েই রামদাস স্বামী সর্ব্বপ্রথম শিবাজীকে দর্শন দান করিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। তিনি বলেন, "তুমি কে আমি ধ্যানে অবগত আছি। ভূভার-হরণে স্বয়ং শঙ্কর তোমার মাতার নিকট প্রতিশ্রুত ছিলেন, কিন্তু পরীক্ষা ব্যতীত এতদিন আমার প্রাণে প্রত্যয় জন্মায় নাই। যখন তুমি সেই মুসলমান কুলনারীকে মাতৃ সম্বোধন ক'রলে, তখন আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয় নাই, তুমি জিতেন্দ্রিয় এই মাত্র ধারণা জন্মে। কিন্তু তোমার হৃদয় ভেদাভেদ-জ্ঞান-শূন্য, তুমি যে সমচক্ষে হিন্দুমুসলমানকে দর্শন করো, সে পরিচয় এখন প্রাপ্ত হলেম। বৎস, তুমি যে হও, আমি সন্ন্যাসী তোমায় আশীর্ব্বাদ করবার অধিকার আছে।"

শিবাজীর মৃত্যু-সময়ে রামদাস স্বামী যে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন তাহাও ইতিহাস-সঙ্গত ঘটনা। এই আশীর্ব্বাণীর

মধ্যে আমরা দেখিতে পাই স্বাধীনতার প্রতি সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীরও কি প্রগাঢ় অনুরাগ! রামদাস স্বামী বলিতেছেন, "যথায় স্বাধীনতার অভ্যুদয়, তথায় তোমার দেব-আত্মার উৎসব হবে, তথায় তুমি অলক্ষিতে শক্তি সঞ্চার ক'রবে, আমিও তোমার সম্মানে ভারতে সম্মানিত হব।"

এখন কি আমরা এরূপ স্বাধীনতার জন্য সর্ব্বত্যাগী ভারতীয় মহাপুরুষগণের সম্মান করিতে পারিব না?

এই অধ্যায় শেষ করিবার পূর্ব্বে গিরিশচন্দ্রের পরিকল্পিত আর একটি চরিত্র-সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা আবশ্যক। এই চরিত্রটি 'মিরকাশিম' নাটকের তকি খাঁ। বঙ্কিমচন্দ্র 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাস-গ্রন্থে তকি খাঁকে বিশ্বাসঘাতকরূপে অঙ্কিত করিয়া ইতিহাস বিকৃত করিয়াছেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্র তকি খাঁর ঐতিহাসিক চরিত্র উদ্ধার করিয়া তাহাকে বীরের যোগ্য মর্য্যাদা প্রদান করিয়াছেন। কাটোয়ার যুদ্ধে তকি খাঁ যে নিজের প্রাণ তুচ্ছ করিয়াও যুদ্ধ করিয়াছিল ইতিহাসে তাহার উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে, 'মিরকাশিম' নাটকে তাহা আরও উজ্জ্বলতর হইয়াছে। 'চন্দ্রশেখরে' তকি খাঁর জঘন্য দুর্ব্বৃত্ততার জন্যই দলনী বেগমের নির্ব্বাসন-দণ্ড এবং মৃত্যু-আলিঙ্গন। গিরিশচন্দ্র মিরকাশিম-বেগমের প্রতি তকি খাঁর গভীর মাতৃ-ভক্তির পরিচয় প্রদান করিয়া বঙ্কিমের তকি খাঁর অপরাধ স্খালন করিয়াছেন।

রঙ্গমঞ্চে অভিনীত সুপ্রসিদ্ধ কবি নবীন সেন মহাশয়ের 'পলাশীর যুদ্ধ' ব্যতীত সিরাজদ্দৌলা-সম্বন্ধে তৎকালে আর কোন নাটক ছিল না। সে অভাব একমাত্র গিরিশচন্দ্রই পূরণ করিয়াছিলেন। মিরকাশিম-সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর'

ব্যতীত ক্ষীরোদপ্রসাদ রচিত “পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত” উল্লেখযোগ্য নাটক। কিন্তু এই নাটকের মিরকাশিম অপেক্ষা গিরিশ-চন্দ্রের মিরকাশিম-চরিত্র অধিকতর সরস ও উজ্জ্বল। “নন্দকুমার”ও ক্ষীরোদপ্রসাদের আর একখানি শ্রেষ্ঠ নাটক। উহার অনেকাংশ স্বর্গীয় চণ্ডীচরণ সেন মহাশয়ের ‘মহারাজ নন্দকুমার’ অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে। কিন্তু উপরি-উক্ত নাটক কয়খানিই proscribed—গবর্নমেণ্ট উহাদের প্রচার ও অভিনয় বন্ধ করিয়া দিয়াছেন্। ক্ষীরোদপ্রসাদের “চাঁদবিবি”ও একখানি উল্লেখযোগ্য নাটক। চাঁদবিবির চরিত্র-অঙ্কনে গিরিশচন্দ্রের তূলিকাও কথঞ্চিৎ সঞ্চালিত হইয়াছিল। ক্ষীরোদ-প্রসাদের “গোলকুণ্ডা” পরবর্ত্তী কালে রচিত একখানি সাধারণ নাটক।

এই যুগে রচিত নাটকসমূহের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের ‘রাণাপ্রতাপ’, ‘মেবার পতন’, ‘সাজাহান’, ‘নূরজাহান’ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ নাটক সর্ব্বাধিক উল্লেখযোগ্য। এই সকল নাটকে বাঙ্গালার অবস্থা সূচিত না হইলেও ‘সিংহলবিজয়’ বাঙ্গালীরই গৌরব-কাহিনী। তবে উহা অনেক পরে রচিত হইয়াছে। জাতীয় পুরোহিত হিসাবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল এবং ক্ষীরোদ-প্রসাদের স্থানও অনেক উচ্চে। কিন্তু বাঙ্গালীকে নিজের সমস্ত অন্তর দিয়া অনুভব করিয়া, বাঙ্গালার প্রাণ নিজের প্রাণে সম্যগ্‌রূপে উপলব্ধি করিয়া, বাঙ্গালীর অভাব-অভিযোগ সমস্তই উপস্থিত করিয়া বাঙ্গালীকে দোষগুণে খাঁটি বাঙ্গালী করিয়া অঙ্কিত করিতে গিরিশচন্দ্র অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

এখানে আর একটি চরিত্রের মৌলিকতা-সম্বন্ধে উল্লেখ না করিলে এই অধ্যায় অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। ‘সিরাজদ্দৌলা’র

জহরা যেমন সেই যুগের রাজনৈতিক অবস্থার প্রতিবিম্ব, 'মিরকাশিমে'র তারাও তেমনি বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ অবস্থার আশারূপিণী আলোকরশ্মি। 'সৎনাম' নাটকের বৈষ্ণবী শত্রুর সহিত যুদ্ধে বিফলমনোরথ হইয়া ভবিষ্যৎ বাণী করিয়াছিলেন—

যতদিন কামিনী-কাঞ্চন
হিন্দুগণ করিয়ে বর্জ্জন
না করিবে দীন ভ্রাতৃ-সেবা,
ততদিন কামিনী-কাঞ্চন-সঞ্চালিত
স্বার্থপর বর্ব্বর-নিকর
রবে সবে পরাধীন বিধর্ম্মি-কিঙ্কর।

তাঁহার এই দীন ভ্রাতৃসেবার ভবিষ্যৎ বাণী সার্থক হইয়া উঠিয়াছে 'মিরকাশিম' নাটকের তারা চরিত্রে। দুঃখিনী বঙ্গ-মাতার দুঃখভার লাঘব করিবার জন্য সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া তারা সকলকে শিক্ষা দিতেছেন, "ভাইদের ধর্ম্মশিক্ষা দাও, বাঙ্গালার কৃতঘ্নতা দূর কর, বাঙ্গালার সেবায় নিযুক্ত হও। প্রেমে সকলকে বশীভূত কর।" তাঁহার প্রেমশক্তি-দর্শনে মেজর মনরোও কৃতজ্ঞ ও উৎফুল্ল হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছেন, "ঈশ্বর-প্রেরিতা রমণী, লড়াই শেষ হইলে দেখেন নাই, দেবদূতের মত আসিয়া সৈন্যদিগকে সেবা করিয়াছেন। তাহাতে ইংরেজ আর ভারতবাসী প্রভেদ করেন নাই। সকলকে সমান চক্ষে দেখিয়াছেন; আমি উহাকে দেবদূত জানিয়া সেলাম করি।" আজ ভারতে এইরূপ চরিত্রেরই একান্ত প্রয়োজন।

কবি ভবভূতি জানকীকে বলিয়াছেন 'করুণস্য মূর্ত্তিরিব', তারাও সেরূপ মূর্ত্তিমতী স্বদেশপ্রেমের উদ্দীপনা। Gorky's

'Mother'এও দেশপ্রেমের এরূপ সর্ব্বস্বত্যাগী চরিত্রের সন্ধান আমরা পাই না। 'তারা'-চরিত্রের ছায়া উত্তরকালের বহু নাটকে পড়িয়াছে, আজ তাহার সম্বন্ধে আমরা তকি খাঁর সহিত সমস্বরে বলিতে পারি—

"মায়ি, আজ তোর কাছে শিখলেম, ধর্ম্ম শিখলেম, কর্ম্ম শিখলেম, খোদার কার্য্য শিখলেম, জন্মভূমির কার্য্যে স্বার্থত্যাগ শিখলেম—"

স্বর্গীয়া তিনকড়ি দাসী তারার প্রকৃষ্ট রূপদান করিতেন।

গিরিশের ঐতিহাসিক নাটকের ধারা অনুসরণ করিলে স্বতঃই প্রতীতি হয় যে গিরিশ জাতীয় হৃদয় লইয়া ইতিহাসের সহিত রস-সাহিত্যের সংমিশ্রণ করিয়া জাতির অশেষ হিতসাধন করিয়াছেন। জাতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা না থাকিলে জাতীয়তার বিকাশ অসম্ভব। বস্তুতঃ গিরিশ প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধার করিয়া বাঙ্গালী সিরাজ ও মিরকাশিমকে তাহাদের স্বরূপমূর্ত্তিতে দেশবাসীর সম্মুখে উপাস্থত করিয়া কেবল যে অমর নাট্যসাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহা নয়, তিনি জাতি-গঠনেও কম সহায়তা করেন নাই। তাঁহার জাতীয় নাটকে স্বতঃই প্রতীতি হয় যে তিনি কেবল মহিমশালী নাট্যকার নহেন, বাঙ্গালার জাতিত্ব-সংগঠনেরও অন্যতম স্রষ্টা—A Great Nation-Builder.

সামাজিক নাটকে

চতুর্থ অধ্যায়

পৌরাণিক 'সীতার বনবাস' ও 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' হইতে ধর্ম্মমূলক 'বিল্বমঙ্গল' ও 'নসীরাম' প্রভৃতি নাটকে যেমন ক্রমবিকাশ, সেইরূপ পূর্ব্ব-রচিত পৌরাণিক এবং ধর্ম্মমূলক নাটক হইতে সামাজিক নাট্যরচনায়ও গিরিশ-প্রতিভার ক্রমাভিব্যক্তিই প্রতীয়মান হয় এ পর্য্যন্ত যে ধারায় নাটক রচিত হইয়াছে, সামাজিক নাটক তাহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নস্তরান্তর্গত। 'প্রফুল্লেই' আমরা নাট্যপ্রথার (technique) এরূপ পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই। কথোপকথনে স্বাভাবিকতা, নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতের (situation) সহজভাব, স্বগতোক্তির অনুপস্থিতি, পঞ্চসন্ধির সামঞ্জস্য এবং মিলনের স্থলে বিয়োগব্যথায় পরিসমাপ্তি ইত্যাদি বিষয়ে আমরা স্বতন্ত্রধারার নাটকে আসিয়া পড়ি। বস্তুতঃ 'প্রফুল্ল' হইতে গিরিশের নাটক romantic হইতে realismএর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। অতঃপর তিনি অধিকতর পরিণতবয়সে যে সমস্ত ঐতিহাসিক এবং এমন কি পৌরাণিক নাটকও লিখিয়াছেন—যেমন 'সিরাজদ্দৌলা', 'মিরকাশিম', 'অশোক' ও 'তপোবল' ইত্যাদি—সেগুলিতেও realismএরই প্রাচুর্য্য দেখিতে পাই।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে যখন "প্রফুল্ল" নাটক অভিনীত হয়, গিরিশের দ্বিতীয়া পত্নী সুরবালার বিয়োগব্যথা জ্ঞানদার মৃত্যুতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। প্রফুল্লের মর্ম্মঘাতী বিয়োগযন্ত্রণা

(tragedy) অসহনীয় বলিয়া মিলনান্ত 'হারানিধি' নাটকের অবতারণা। উভয় নাটকের নায়ক যোগেশ ও হরিশই চরিত্রবান্, নীতিপরায়ণ, কিন্তু ঝঞ্ঝা, বিপদ্, বিপর্য্যয় হইতে নীতি যে সর্ব্বদা রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না, এই দুই চরিত্রে সে সত্য প্রকটিত হইয়াছে। আবার নিছক সত্য ও সততার দোহাই দিয়া (absolute truth এবং absolute honesty) হৃদয় হইতে ক্ষমা অপসারিত করিয়া 'মায়াবসানে'র কালীকিঙ্কর যে ভুল করিয়াছিলেন, স্পষ্টভাবে নাট্যকার ভৃত্য শান্তিরামের মুখ দিয়া বুঝাইয়া বলিতেছেন—

"মনের পচা পাঁক উট্‌কে দেখলে কেউ কারুকে দুর্জ্জন বল্‌তো না।"

অতঃপর যে তিনখানি নাটক তিনি লেখেন 'বলিদান' ১৯০৫, 'গৃহলক্ষ্মী' ১৯০৭ এবং 'শাস্তি কি শান্তি' ১৯০৮, তাহাও ঘোর বিয়োগান্ত কিন্তু শিক্ষাপ্রদ। আমরা অতঃপর সংক্ষেপে চরিত্রাবলীর আলোচনা করিব।

অনেকে মনে করেন নাটকের চরিত্র হইতে নাট্যকার সম্পূর্ণ পৃথক্ থাকিবেন, তিনি যথানুযায়ী অবস্থাগত চরিত্র চিত্রিত করিবেন, অধ্যাপক বা ধর্ম্মযাজকের স্থান পূর্ণ করা তাঁহার কাজ নয়। সত্য বটে, কিন্তু ইহা কি সম্ভব? আপনার ছায়াকে কেহই লঙ্ঘন করিতে পারে না, সৃষ্টির অন্তরালেই স্রষ্টা, মাকড়সা যে জাল বুনে, সে তাহারই ভিতরকার জিনিষ। জগদ্বিখ্যাত সেক্সপীয়রের নাটকে কত স্থানে তিনি আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, ভিক্টর হিউগো প্রাণের দরদ লইয়াই ভলজিনের অবস্থা দেখাইয়া অবস্থা-কাতর পরস্বাপহরকের প্রতি সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়াছেন। Realistic schoolএর প্রধান উপাসক ইব্‌সেন

তাঁহার Ghosts নাটকে দৃঢ়ভাবে প্রচার করিয়াছেন—পিতার পাপ পুত্রে বর্ত্তে। Doll's House এবং The Wild Duck এর পিতামাতার স্নায়বিক বিকার এমন কি দৈহিক দৃষ্টিক্ষীণতা পর্য্যন্ত পুত্রকন্যায় তিনি সঞ্চারিত করিয়াছেন। The Lady from the Seaর মত একখানি পঞ্চাঙ্ক নাটক লিখিবার প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল যে—সংসারানভিজ্ঞ অলস স্ত্রীকে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য প্রদান করিলে—তাহার উপর হইতে সামাজিক নীতিবন্ধন অপসারিত করিলে—সে স্বতঃই তাহার কর্ত্তব্য বুঝিতে পারিবে, তাহার মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া তাহাকে কর্ত্তব্যানুরক্তা পতিপরায়ণা করিয়া তুলিবে,—এই সত্য প্রচারের জন্য। The Wild Duckএও দেখিতে পাই যে নিছক সত্য ও সরলতার বাড়াবাড়িতে পারিবারিক অশান্তি বৃদ্ধি বই কিছুই নয়, আর An Enemy of the Peopleএ প্রমাণিত হইয়াছে যে The strongest man in the world is he who stands most alone. ইব্‌সেন Doll's House and Ghostsএ ideal-এর উপরে truthকে স্থান দিতে চাহিয়াছেন, ক্রমে নিজের ভুল বুঝিয়া The Wild Duckএ প্রচার করেন যে "Ideal and the Practical can only be reconciled by compromise."

অতএব যিনি যত বড় realistic কবি বা নাট্যকারই হউন না কেন, লোকশিক্ষাও যে তাঁহার রচনার সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িতে থাকে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সেক্সপীয়রের কোনও social drama না থাকায় আমরা কোনরূপ তুলনা-মূলক সমালোচনা করিবার সুযোগ পাইলাম না। তবে King Learএর pathos এবং ওথেলোর কঠোরতা গিরিশের

সামাজিক নাটকের অনেক স্থলে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। Greek নাট্যকার Aristophanes এবং জগদ্বিখ্যাত ফরাসী নাট্যকার Moliere যে সমাজচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন উহা ব্যঙ্গ-হাস্যরসের চিত্র। এদিকে অদৃষ্টকে ভিত্তি করিয়াই Greek Tragedyর সৃষ্টি। মানুষ যে অদৃষ্টের ক্রীড়নক, Greek নাটক Œdipus তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বার্নাড্ শ John Bull's Other Island, Man and Superman, Apple Court, Major Barbara প্রভৃতি নাটকে অনেক অদ্ভুত চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন বটে, কিন্তু 'বলিদান' কি 'শান্তি কি শান্তি', 'গৃহলক্ষ্মী' কি 'মায়াবসানের' ন্যায় গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ও মর্ম্মস্পর্শী করুণচ্ছবি তাঁহার লেখনী হইতেও প্রসূত হয় নাই। বিশেষতঃ হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের শিষ্য শ মানবের ধর্ম্মবিশ্বাসকে সম্মানের চক্ষে দেখেন নাই, আর গিরিশের নাটকের ভিত্তিই ধর্ম্মে। গিরিশচন্দ্রও বাঙ্গালা দেশের প্রেমহীন স্বার্থপ্রসূত বিবাহ প্রথার তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন, ইব্‌সেনও The Wild Duck এবং অন্যান্য নাটকে পাশ্চাত্য সরলতাহীন সত্যলেশশূন্য বিবাহ-প্রথার প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিয়াছেন, কিন্তু বার্নাড্ শ বিবাহাদি সামাজিক বিষয়ে ঘোরতর বিদ্রোহী। তাঁহার নিকট বিবাহবন্ধন একটা অসার আড়ম্বর মাত্র—Marriage is one of the most licentious of human institutions. It is a contrivance of its own to secure the greatest number of children and the closest care of them. For honour, chastity and the rest of your moral figments it cares not a rap.—Man and Superman.

একমাত্র ইব্‌সেনের সামাজিক নাটকের সঙ্গেই গিরিশের সামাজিক নাটকের বিচার সম্ভব। ইব্‌সেন এবং গিরিশ্ উভয়েই Oscar Wildএর Art for Artএর দোহাই দিয়া নীতি বিসর্জ্জন দেন নাই, উভয়েই সামাজিক প্রথার নির্ভীক আলোচনা করিয়াছেন এবং উভয়ের নাটকেই idealism ও realismএর অপূর্ব্ব সমাবেশ দৃষ্ট হয়। তবে একথা সত্য যে উভয়ের আদর্শই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। নরওয়েজিয়ান নাট্যকার এক সময় হইতে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের লেখনী সম্পূর্ণভাবে প্রভাবান্বিত করিলেও গিরিশের আদর্শ বাঙ্গালী সমাজেরই উপযোগী, আমাদের নৈতিক অবস্থার অনুকূল। দৃষ্টান্তস্বরূপ Doll's Houseএর নায়িকার উল্লেখ করা যাইতে পারে। Mrs. Nora Helmer তাঁহার নারীত্ব বা নারীমর্য্যাদাকে অবজ্ঞাত হইতে দেখিয়া স্বামিগৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, উদ্দেশ্য— তাঁহার নিজের প্রতি কর্ত্তব্য নিজেই সম্পাদন করিবেন ('duties to myself'), তিনি নিজের শিক্ষার ভার স্বয়ংই গ্রহণ করিবেন ('I must try and educate myself'). ইতিপূর্ব্বে এই নোরাই স্বামীর অজ্ঞাতসারে জাল করিয়া তিনশত পাউণ্ড কর্জ্জ করিয়া স্বামীর বায়ুপরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা করিয়া তাঁহার হৃতস্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন এই স্বামীই জাল করায় অসন্তুষ্ট হইয়া নিজ পুত্রকন্যার শিক্ষাভার পর্য্যন্ত তাঁহার হাতে দিতে অসম্মত, নোরা স্বামী, সংসার এমন কি আপনার সুকুমার শিশুদের পর্য্যন্ত ফেলিয়া গৃহত্যাগ করিয়া যান। রবীন্দ্র-নাথ 'স্ত্রীর পত্রে' মৃণালকে, 'বোষ্টমীর' বোষ্টমীকে এবং 'পয়লা নম্বরের' নায়িকাকেও গৃহত্যাগ করাইয়াছেন বটে, কিন্তু গিরিশের প্রফুল্ল শিশু যাদবের প্রাণরক্ষার্থ স্বামীর আরচণে বিদ্রোহী হইয়া

আত্মবিসর্জ্জন করে, কিন্তু গৃহত্যাগ করে নাই। নোরা স্বামীর সুখের জন্য জাল করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই, কিন্তু জোবী দৃঢ়স্বরে স্বামীকে বলে, "আমি চুরি ক'র্‌তে পারবো না।" প্রফুল্লও স্বামী রমেশের আদেশ উপেক্ষা করিয়া বলিতেছে, "আমি মিথ্যা কথা কইতে পার্‌বো না।" নোরা স্বামীর সহিত সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠার (self-development) জন্য বাহির হইয়া যায়, আর জোবা কদাচারী নিষ্ঠুর স্বামী ও হৃদয়হীনা শাশুড়ী কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়াও ভিক্ষা করিয়া স্বামীর সেবা করিয়াছে। এদিকে আবার পাশ্চাত্ত্য ইব্‌সেন যেমন Ghosts নাটকে যুবক Oswaldএর চরিত্রে সাময়িক মস্তিষ্ক-বিকৃতিতেও গর্ভধারিণীকে জীবনসঙ্গিনীর আসনে বসাইবার প্রবৃত্তি আরোপিত করিয়া বীভৎস রসের পরিচয় দিয়াছেন, গিরিশের নাটকে এরূপ বিকৃত ভাব কখনও স্থান লাভ করে নাই। তবে এক বিষয়ে গিরিশের সহিত ইব্‌সেনের সাদৃশ্য দেখা যায়—উভয়ের লেখনী হইতেই সমাজের নিখুঁত চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। ইব্‌সেনের সমৃদ্ধিশালী Peter Stockman, Werle গিরিশের রূপচাঁদ এবং মোহিনীর ন্যায়ই হৃদয়হীন, তাঁহার Norma Helmer, Mrs. Alving এবং Ellida Wangel প্রভৃতি চরিত্র জোবী, হরমণি, অন্নপূর্ণা, রঙ্গিণী প্রভৃতি চরিত্রের রূপান্তর এবং সন্তাপিত Hjalmar, Wangel, Torvald Helmer প্রভৃতির প্রতি গিরিশের শোকতাপক্লিষ্ট চরিত্রেরই ন্যায় সকলের সহানুভূতি উদ্রেক হয়। অথচ উভয় নাট্যকারের মধ্যে কেহ কাহাকেও কোনপ্রকারেই অনুকরণ বা অনুসরণ করেন নাই।

গিরিশচন্দ্রের পূর্ব্বে আমাদের দেশে সামাজিক নাটক খুব

কম ছিল। রামনারায়ণের 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' ও 'নবনাটক' সামাজিক চিত্র-বিশেষ, উহাতে নাটকত্ব বড় কম।

উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবাবিবাহ' ও চিরঞ্জীব শর্ম্মার 'নববৃন্দাবন'ই প্রথম সামাজিক নাটক; দীনবন্ধুবাবুর 'নীল-দর্পণে' নীলকরদিগের অত্যাচারে বাঙ্গালার তৎকালীন সামাজিক জীবন কিরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল তাহা সুস্পষ্টভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। কিন্তু বাহিরের দুর্ঘটনার আঘাতে যে দুঃখ উপস্থিত হয় তাহাতে খাঁটি tragedyর সৃষ্টি হয় না। নীলকরদিগের অত্যাচারের আঘাতে বাঙ্গালী জাতির একটা প্রধান অংশ বাঙ্গালার কৃষকসমাজ বিশেষ ভাবে আহত ও পর্য্যুদস্ত হইয়াছিল। কিন্তু আঘাতটি আসিয়াছিল বাহির হইতে outside influences, সমগ্র বাঙ্গালা জাতির অন্তর্নিহিত দুর্ব্বলতার ঘাতপ্রতিঘাতে এই নাটকের ঘটনা-বৈচিত্র্য ফুটিয়া উঠে নাই। তাই নাটক হিসাবে 'নীলদর্পণের' স্থান উচ্চে নয়। দীনবন্ধুবাবুর 'সধবার একাদশী', 'জামাই বারিক' ও 'বিয়ে পাগলা বুড়ো', মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো-শালিকের ঘাড়ে রোঁ', অমৃতলাল বসুর 'বিবাহ বিভ্রাট', 'বেল্লিক বাজার' প্রভৃতি কয়েকখানি সামাজিক প্রহসন ছাড়া আর কোন সামাজিক নাটক তৎকালে ছিল না। একমাত্র শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের 'নয়শো রূপেয়া' ও উপেন্দ্রনাথ দাসের 'শরৎ-সরোজিনী' ও 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' সামাজিক নাটক নামে পরিচিত ছিল। কিন্তু এই কয়খানি নাটকেও নাট্যকলা ভাল করিয়া ফোটে নাই। অতঃপর বর্ত্তমান হাতীবাগানের ষ্টার-থিয়েটারে 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসখানি 'সরলা' নামে নাটকে রূপান্তরিত হইয়া অভিনীত হইবার কিছুদিন-মধ্যেই গিরিশচন্দ্রের

লেখনী হইতে তাঁহার অমর সামাজিক নাটক 'প্রফুল্ল' প্রসূত হয়। ইতিপূর্ব্বে সামাজিক নাটক লিখিবার ইচ্ছা যে গিরিশ-চন্দ্রের ছিল না তাহা নহে। কিন্তু অভাব ছিল উপাদানের। গিরিশচন্দ্র তাঁহার (১৯০১ সালে রচিত) 'পৌরাণিক নাটক' প্রবন্ধে সামাজিক নাটক সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—

"দোষগুণ লইয়া নাটক রচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাঙ্গালার গুণ দূরে থাকুক বড় রকমের একটা দোষও নাই। দোষের মধ্যে বড় জোর নাবালককে ঠকাইয়াছে, কেহ মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে, কৌন্‌সুলির জেরাতে হটে নাই, গৃহে অস্ত্রহীন দুই একজন পাইক ছিল, তাহাদের মারিয়া ডাকাইতি করিয়াছে, এইমাত্র দোষের চিত্র। লাম্পট্য দোষের বিবরণ—দুই একটা বেশ্যা রাখিয়াছে, কেহ বা পরিবারস্থ থাকিয়া কুলাঙ্গনাকে বাহির করিয়াছে, কেহ বা পড়সীর কুলাঙ্গনা বাহির করিতে সমর্থ হইয়াছে। গুণের কথা—বড় জোর কেহ পিতৃশ্রাদ্ধে কাঙালী ভোজন করাইয়াছিল; রাস্তা নির্ম্মাণের জন্য টাইটেলের আশে রাজাকে চাঁদা দিয়াছে। যাহারা বাঙ্গালার বড় বড় চরিত্র তাহারা পলিসি বাজ, স্বয়ং গোপনে থাকিয়া একজন পোনর টাকার মাহিনার প্রিণ্টারকে খাড়া করিয়া মানহানির কয়েদ খাটা তাহার উপর দিয়া কোন এক ম্যাজিষ্ট্রেটের অত্যাচার বর্ণনাপূর্ব্বক প্রবন্ধ লেখেন। এই সকল উচ্চ চরিত্র অদ্যাবধি রাজদ্বারে সত্যকথা বলিতে কেহ সমর্থ হন নাই। যাহা কাগজে লিখিয়াছেন, তাহার থুতু খাইয়া মার্জ্জনা চাহিয়া দণ্ড হইতে রক্ষা পাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।"

বাঙ্গালীর জীবনে সুখদুঃখের অভাব নাই। তাহার জীবনও ক্ষণিক আশার আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠে আবার বিষাদের

অন্ধকারে নিমেষে ডুবিয়া যায়। কিন্তু বাঙ্গালীর জীবনে নাট্যকলার উপযোগী বৈচিত্র্য খুব বেশী নাই। সত্য বটে Materlink যাহাকে "silent tragedy" বলিয়াছেন বাঙ্গালীর জীবনে তাহা যথেষ্টই আছে। তবে গল্পে, উপন্যাসে, রোমান্সে বাঙ্গালী জীবনের সেই tragedy যেমন সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠে ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে নাটকের বাঁধা-ধরা নিয়মের মধ্যে তেমন হৃদয়গ্রাহী ও সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিতে পারে না। ঔপন্যাসিক নানাভাবে বিনাইয়া বিনাইয়া চরিত্র বিশেষের মনোভাব বিশ্লেষণ করিবার সুবিধা পান। নাট্যকারের সেই সুযোগ খুবই কম। মনস্তত্ত্ব লইয়া উপন্যাস লেখা চলে কিন্তু শুধু উহা লইয়া নাটক রচিত হইতে পারে না। Tennyson, Arnold, Shelly, Byron, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর কবি নাটক লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা নাটক হয় নাই, নাটক আকারে সুন্দর কাব্য হইয়াছে মাত্র। "Cence" বা "Manfred" যতই সুন্দর হউক না কেন, নাটক হয় নাই। Manfredএ Marlowe র কবিত্ব Faust অপেক্ষা অনেক বেশী প্রস্ফুটিত হইলেও Faust একখানি জীবন্ত নাটক আর Manfred একখানি নাট্যকাব্য। এমন কি ইব্‌সেনেরও যে নাটকে মনস্তত্ত্ব অধিক আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, মঞ্চে তাহা হৃদয়গ্রাহী হয় নাই। গিরিশচন্দ্র কবি ও নাট্যকার উভয়ই। তাঁহার নাটক নাটকই, তাহাতে কবিতা নাই। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত বহু অসুবিধা লইয়া তাঁহাকে সামাজিক নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। তাঁহার নিজস্ব অভাবও একটি প্রধান ছিল। গ্রামের নিত্য অনুষ্ঠিত দলাদলি, আমাদের গ্রাম্যজীবন প্রভৃতি সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা ছিল কম। পক্ষান্তরে বাগবাজার প্রভৃতি অঞ্চলে একান্নবর্ত্তী পরিবার

আজও যেমন বর্ত্তমান আছে গিরিশচন্দ্রের প্রায় নাটকেই সেইরূপ চিত্র পরিস্ফুট দেখিতে পাওয়া যায়।

গিরিশচন্দ্রের প্রায় অধিকাংশ সামাজিক নাটকই tragedy —বাঙ্গালার দুঃখের কাহিনী, গৃহস্থের শোচনীয় পরিণাম। বাঙ্গালী সংসারের দুঃখের গীতিকা লইয়াই গিরিশচন্দ্রের tragedy. "সরলা" জনসাধারণের হৃদয় এত বেশী অধিকার করিয়াছিল যে "প্রফুল্ল" প্রথমে তাঁহাদের হৃদয়কে বড় বেশী আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল "প্রফুল্ল" ততই জনসাধারণের হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে "সরলা" অপেক্ষা "প্রফুল্লই" সকলের অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হইয়া উঠে।

গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকের প্রত্যেকটিই এক একজন নায়ককে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। 'প্রফুল্ল' যোগেশকে, 'হারানিধি' হরিশকে, 'মায়াবসান' কালীকিঙ্করকে, 'বলিদান' করুণাময়কে, 'শাস্তি কি শান্তি' প্রসন্নকুমারকে, 'গৃহলক্ষ্মী' উপেন্দ্রনাথকে অবলম্বন করিয়া পরিণতি লাভ করিয়াছে। একথা অবশ্যই সত্য যে রমেশ, মোহিনী, নীরোদ ও প্রকাশকে পরবর্ত্তী নায়ক বলিয়া ধরা যাইতে পারে এবং তাহারাও নায়কের তুল্য-পরিণামই প্রাপ্ত হইয়াছে। তথাপি গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকের মূল কেন্দ্র যে প্রথমোক্ত নায়ক-চরিত্র তাহাতে সন্দেহ নাই পরবর্ত্তী নায়ক কেবল পারিপার্শ্বিক অবস্থা পূর্ণ করিয়াছে। গিরিশচন্দ্র নিজেই বলিতেন, "আমি আগে নায়ক-চরিত্র কল্পনা করি, তাহার পর সেই চরিত্র ফুটাইতে ঘটনা প্রভৃতি সৃষ্টি করি।"

'প্রফুল্ল' নাটকও এইরূপ একটি মর্ম্মভেদী tragedy. এই

tragedyর বীজ যোগেশের হৃদয়েই অঙ্কুরিত হইয়া উঠিয়াছিল, বাহিরের ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে উহা ক্রমশঃ পরিপুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। Tragedyর বীজ Macbethএর হৃদয়েই লুক্কায়িত ছিল। তাই ডাকিনীরা তাঁহাকে "All hail Macbeth, thou shalt be king hereafter" বলিয়া সম্বোধন করিবামাত্র তিনি চমকিত হইয়া উঠিলেন, তাঁহার মনের কোণে লুক্কায়িত দুরাকাঙ্ক্ষা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং উহাই ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া তাঁহার বিনাশের কারণ হইয়া দাঁড়াইল। Learএর স্নেহের দৌর্ব্বল্য, ওথেলোর সন্দেহ, কোরিওলেনাসের গর্ব্বিত ভাব, Hamletএর ভাববিহ্বলতা, Antony-Cleopetraর সম্ভোগবাসনা-রূপ দুর্ব্বলতা এবং ইব্‌সেনের Gregers Werleএর absolute sincerity-রূপ দুর্ব্বল সূত্রই বহির্ঘটনার সংঘাতে এই সমস্ত নাটককে tragedyতে পরিণত করিয়াছে। যোগেশেরও অন্তর্নিহিত দুর্ব্বলতা—তাহার সুনাম-সুযশের আকাঙ্ক্ষাই প্রফুল্ল নাটকে tragedyর কারণ। মিথ্যাপবাদেও এই যে অতিরিক্ত ব্যাকুলতা ও আত্মবিস্মৃতি উহাই সুনাম-রূপ একটা abstractionএর উপাসক যোগেশকে সংযম ভ্রষ্ট করিয়া নাটকখানিকে ট্রাজিডিতে পরিণত করিয়াছে। কঠোর কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, সংসারধর্ম্ম প্রতি-পালনের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম, অটল আত্মসংযম—কোনটাই তাহার অন্তর্নিহিত ভাব-প্রবণতাকে সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করিতে পারে নাই। যে আত্ম-প্রত্যয়ের বলে সুনাম, যশ, মান, অপমান, নিন্দাস্তুতি সব ভুলিয়া মানুষ দুস্তর সংসারসাগর অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় সেই আত্ম-প্রত্যয় যোগেশের থাকিলে এই ট্রাজিডি হয়ত হইত না। হ্যামলেটের অন্তর্নিহিত

দুর্ব্বলতাই যেমন ঐ নাটকখানিকে ট্রাজিডিতে পরিণত করিয়াছে —পিতৃহত্যার প্রতিহিংসার কথা একটা উপলক্ষ্য মাত্র, তেমনি শিথিল-প্রত্যয় যোগেশের মানসিক দুর্ব্বলতাই প্রফুল্ল নাটকের ট্রাজিডির কারণ, যোগেশ অতিরিক্ত মদ্যপানে আসক্ত না হইলেও তাহা ঘটিতে পারিত।

দুই একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া আমরা এখানে যোগেশের দুর্ব্বলচিত্তের পরিচয় প্রদান করিব। প্রথম ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ার দুঃসংবাদে যোগেশ অতিশয় বিচলিত হইয়া পড়িলেন, মুহূর্ত্ত-মধ্যে তিনি বুঝিয়া লইলেন ব্যাপারীদের দেড় লক্ষ টাকা দেনা শোধ করিবার কোন উপায়ই আর রহিল না—ইন্‌সলভেন্সি লইতেই হইবে। আজন্ম সঞ্চিত সুনাম ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কায় তিনি অধীর হইয়া উঠিলেন—দুশ্চিন্তা বিস্মৃত হইবার জন্য মদ খাইতে আরম্ভ করিলেন। ওথেলো নাটকের Cassio-চরিত্রের কথা মনে পড়ে "Reputation, reputation, reputation! O, I have lost my reputation! I have lost the immortal part, sir, of myself and what remains is bestial (Act II, Sc. iii). যোগেশও 'সুনাম' 'সুনাম' করিয়া বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি যখন একে একে সমস্ত ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন, এমন কি জেল খাটিয়াও ঋণ পরিশোধ করিতে তিনি ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন, এমন সময় সংবাদ আসিল সুরেশ চুরির দায়ে গ্রেপ্তার হইয়াছে। আবার তাঁহার সুনামে আঘাত লাগিল! আবার তিনি সুরাদেবীর শরণাপন্ন হইলেন। যোগেশ পুনরায় ব্যাপারীদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। কিন্তু যখন শুনিলেন রমেশ বেনামী মর্টগেজখানা ব্যাপারীদিগকে দেখাইয়াছেন তখন জোচ্চোর

প্রমাণিত হইয়াছেন বুঝিয়া পুনরায় মদের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ব্যাঙ্ক আবার টাকা দিতে আরম্ভ করিয়াছে জানিয়া যোগেশ পীতাম্বরের সঙ্গে ব্যাঙ্কে চলিলেন। ব্যাপারীরা তাঁহাকে গালাগালি দিতে লাগিল—"এমন জুচ্চুরিটে কর্ত্তে হয়।" জনৈকা ইতর জাতীয়া স্ত্রীলোক তাঁহাকে গালাগালি দিয়া চলিয়া গেল—"জোচ্চুরির আর জায়গা পাওনি।" যোগেশ আপন মনে নিজের পথেই চলিতে লাগিলেন, উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া শেষে রাস্তার মাতালদের সঙ্গে নাচিতে আরম্ভ করিলেন। এই যে ভাববিহ্বলতা উহাই হইল যোগেশের দুর্ব্বলতা। তারপর আঘাতের পর আঘাত পাইয়া তাঁহার উন্মত্ততা উপস্থিত হয়। ট্রাজিডি-সংঘটিত হয় উহাতেই—মদ কেবল সহায় মাত্র। বাস্তবিক সুনাম-লোপের আশঙ্কায়, জোচ্চোর অখ্যাতির ভয়ে তাঁহার হৃদয়ে আত্মগ্লানির যে অনল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল মদ কেবল সেই অনলে ইন্ধন যোগাইয়াছিল মাত্র। এই কথাটিই নাট্যকার যোগেশের মা উমাসুন্দরীর কথায় স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়াছেন—"আমার ধর্ম্মভীতু ছেলে, লোকে জোচ্চোর বলবে, এই অভিমানেই মদ খাচ্ছে, আমি আবাগীই এই সর্ব্বনাশের হেতু।"

'হারানিধির' হরিশও সচ্চরিত্র, নীতিবান্ এবং পরোপকারী। বন্ধুকে অত্যন্ত বিশ্বাস করিয়া বিপদের সময় তাঁহার জামিন হইয়াছিলেন। কিন্তু পরে বন্ধুর কৃতঘ্নতাতেই সর্ব্বস্বান্ত হইলেন। উপযুক্ত পুত্র বর্ত্তমান থাকাতেও তাঁহার softening of the brain আরম্ভ হয়, তিনি অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়েন। হরিশের জীবনে ট্রাজিডি ঘটিয়াছিল তাহার জন্য, যোগেশের ন্যায় মদের প্রয়োজন হয় নাই। যোগেশ যেমন সুনামের হানিতে

অধার হইয়া উঠিয়াছিলেন হরিশও তেমনি "ঋণের দায়ে লুকুতে হবে, নয় ইন্‌সলভেন্সী নিতে হবে, জোচ্চোরকে কে চাক্‌রী দেবে," বলিয়া অস্থির হইয়া উঠেন। পুত্র নীলমাধব এবং পত্নী হৈমবতী যখন তাঁহাকে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইতে বলিলেন তখন হরিশ বলিয়া উঠিলেন "কোথায় ঈশ্বর? ঈশ্বর নাই, এ দৈত্যের সংসার, নীলমাধব, আজ তুমি পিতৃহীন।" তাঁহার এই মানসিক যন্ত্রণাই ক্রমে তাঁহাকে উন্মত্ত করিয়া তুলে। তবে নাটকখানির পরিণতি মৃত্যুতে নয়, মিলনে এবং এই মিলন সংঘটিত হয় অন্যতম নায়ক হারানিধির ক্ষিপ্রকারিতায় ও বুদ্ধিতে। এইরূপ এক একটা দুর্ব্বল সূত্র থাকিলেই tragedy হয়, মদ প্রভৃতি কারণ নয়, সহায়তা মাত্র।

'মায়াবসানের' কালীকিঙ্কর সর্ব্বগুণালঙ্কৃত হইয়াও কঠোর নীতিবাদী। Kant-এর Categorical Imperative-এর কঠোর নীতি-অনুবর্ত্তন-কারী কালীকিঙ্করের সত্যপ্রিয়তা এত বেশী যে, অপরের প্রাণরক্ষার জন্য মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করাও যে শাস্ত্রসম্মত, করুণা-ধর্ম্মের এই মঙ্গল-বিধানটিও তিনি পালন করিতে কুণ্ঠিত। এইরূপ কঠোর নীতিবাদ সংসারে বহু অনর্থের সৃষ্টি করিয়া থাকে। পিতৃমাতৃহীন যাদব ও মাধব যখন অনুতপ্ত হৃদয়ে সাহায্য প্রার্থনা করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "রক্ষা করিবার কি কেহ নাই?" তখন কঠোর নীতিবাদী কালীকিঙ্কর বলিয়াছিলেন, "দুর্জ্জনের সাজা হওয়াই উচিত।" গিরিশচন্দ্র তাঁহার এই ভ্রম অপনোদন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন রঙ্গিণীর সাহায্যে। রঙ্গিণী কালীকিঙ্করকে বুঝাইতেছেন—

"পাপের দণ্ড! মার্জ্জনা নাই? তবে তো মানবদেহ-ধারণ মহা বিপদ্! যদি মার্জ্জনা না থাকে, কোথায় যাব, কোথায়

দাঁড়াব। এ জীবন কেবল কার্য্যপ্রবাহ, সকল কার্য্যই কলুষিত, এর যদি দণ্ড হয়, যদি মার্জ্জনা না থাকে, এ কার্য্যফল যদি ভোগ হয়, তা হ'লে তো অনন্তকালেও নিস্তার নাই।"

রঙ্গিণী ও শান্তিরামের কথায় কালীকিঙ্করের প্রাণে কঠোর নীতিবাদের সহিত করুণার দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল। এই দ্বন্দ্বযুদ্ধে কঠোর নীতিবাদকে পরাজিত করিয়া করুণাই জয়লাভ করিল—কালীকিঙ্কর বুঝিলেন ভক্তমাত্রেরই প্রার্থনা হওয়া উচিত—

"The mercy I to others show
That mercy show to me."

বুঝিলেন "মার্জ্জনাই মনুষ্যত্ব, দেবত্ব, ঈশ্বরত্ব।"

কালীকিঙ্করের পরিণামও যোগেশের মতই হইত যদি অন্তর্যুদ্ধে যুঝবার সামর্থ্য ও সুবিধা তাঁহার না থাকিত। যোগেশ অপেক্ষা কালীকিঙ্করের সুবিধা ছিল অনেক বেশী। কালীকিঙ্করের যেমন শান্তিরাম ছিল, যোগেশের তেমনি ছিল পীতাম্বর। কিন্তু রঙ্গিণীর মত উচ্চভাবসম্পন্না নারীর সাহায্য যোগেশ পান নাই বরং পরামর্শদাতা রমেশ ছিল তাঁহার ভ্রাতৃরূপে ভয়ঙ্কর শত্রু।

কালীকিঙ্করের চিত্তবিকারের পুনঃ প্রকাশ আমরা দেখিতে পাই পঞ্চম অঙ্কে। তাঁহার সংসারে সর্ব্বপ্রকার দুর্য্যোগ উপস্থিত হইল, গৃহের সকলেই অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে, কালীকিঙ্কর সমস্তই শূন্য দেখিলেন—"সব শূন্য, সব শূন্য, তিনি একা দাঁড়িয়ে।" এই যে অন্তর-বাহিরের শূন্যতা তাহাই তাঁহার প্রাণে নৈরাশ্য জাগাইয়া তুলিল—"বিদ্যার গৌরব, ধর্ম্মের গৌরব, চরিত্রের গৌরব, কথার গৌরব মাত্র—নিষ্ফল কাকবিষ্ঠা!

জীবনে দুঃখই সার্থক। ভূমিষ্ঠ হ'য়ে দুঃখ, আজীবন দুঃখ—মরণে দুঃখ।" এখানে কালীকিঙ্কর একেবারে সোপেন-হায়ারের মতাবলম্বী। যোগেশের মত তাঁহারও নিশ্চেষ্টতা আসিল, তিনি সব ছাড়িয়া দিলেন—"আমি কারুর নই, আমার কেউ নাই!" তাঁহার অবস্থাও হয়ত যোগেশের মতই হইত, যদি না তিনি রঙ্গিণীর নিকট হইতে সত্যের আভাস পাইতেন—"জীবন সুখের জন্য নয়, জীবন সাধনার জন্য।"

সত্যের যে দীপশিখা রঙ্গিণী কালীকিঙ্করের অন্ধকার-প্রাণে জ্বালাইয়া দিলেন তাহাতে তিনি দেখিতে পাইলেন "নিষ্কম্প দীপশিখা সম্ভব, আত্মত্যাগে সম্ভব।" আত্মত্যাগের মধ্যেই তিনি শান্তি খুঁজিয়া পাইলেন—"সুখ-আশায় পরহিত করেছি, আত্মোন্নতির জন্য পরহিত করেছি, ফল-কামনায় পরহিত করেছি। আজ গঙ্গাজলে 'ফল' বিসর্জ্জন দিয়ে পরকার্য্যে রইলেম; রইলেম কি জগতে মিশলেম।"

একদিকে নীতির কঠোরতা ও কর্ম্মের অহঙ্কার, আর একদিকে নিষ্কাম কর্ম্ম—কর্ম্মফল-বিসর্জ্জন। এই উভয় দিকের দ্বন্দ্বে বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়া কালীকিঙ্করের চরিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে।

'বলিদান' নাটকে গিরিশচন্দ্র করুণাময় বসুকে একেবারে সমাজের যূপকাষ্ঠে উৎসৃষ্ট করিয়াই উপস্থাপিত করেন নাই। মনুষ্যত্ব ও আত্মসম্মান রক্ষার জন্য মধ্যবিত্ত গৃহস্থ জীবন-সংগ্রামে কিরূপ তিলে তিলে নিষ্পেষিত হয়, বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার সংঘর্ষে পরাজিত হইয়া অবশেষে কি মর্ম্মন্তুদ দুরবস্থায় উপনীত হয় করুণাময়-চরিত্রে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। গিরিশচন্দ্র জাষ্টিস সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের অনুরোধে

সমাজচিত্র দেখাইবার জন্যই 'বলিদান' নাটক রচনা করিলেও করুণাময়-চরিত্রে এমন নিদারুণ করুণ রসের সৃষ্টি করিয়াছেন। যোগেশ বা হরিশের মত করুণাময়ের অবস্থা তাঁহার আত্মকৃত নহে, কালীকিঙ্করের মত কঠোর নীতিবাদও তাঁহাকে বিকৃত করে নাই। শুধু বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার প্রাবল্যেই করুণাময় চরিত্র পরিণতি লাভ করিয়াছে।

'গৃহলক্ষ্মীর' উপেন্দ্রনাথও সত্যবাদী ও ন্যায়নিষ্ঠ। সহোদর শৈলেন্দ্রকে কখনও তিনি প্রবঞ্চনা করেন নাই, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃ-বধূর সমস্ত বিষয় দানপত্রমূলে হাতে পাইয়াও পুনরায় তাহাকে সমস্ত প্রত্যর্পণ করিতে একটুকুও দ্বিধা করেন নাই। কিন্তু King Learএর কন্যাস্নেহের ন্যায়, ভ্রাতৃস্নেহই ছিল তাঁহার চরিত্রের দুর্ব্বলতা। তাঁহার এই দুর্ব্বলতাই নাটকখানিকে ট্রাজিডিতে পরিণত করিয়াছে। ভ্রাতৃস্নেহে আঘাত লাগিলেই উপেন্দ্রনাথ উত্তেজিত হইয়া উঠিতেন, ধৈর্য্য হারাইয়া ফেলিতেন। এই অধীরতাই ট্রাজিডির মূলসূত্র।

'শাস্তি কি শান্তির' প্রসন্নকুমার চরিত্রও ট্রাজিডির পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী। তাঁহার জীবনে অনেক দুঃখ-বিপর্য্যয় ঘটিলেও অত্যধিক ভাবপ্রবণতা, বিবেচনাহীন উদ্যমই নাটকখানিকে বিয়োগান্তে পরিণত করিয়াছে। গিরিশচন্দ্র 'গৃহলক্ষ্মী' নাটকের চারি অঙ্ক পর্য্যন্ত লিখিয়া গিয়াছেন। পঞ্চম অঙ্ক পরিসমাপ্ত করেন প্রবীন সাহিত্যরথ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়।

গিরিশের সামাজিক নাটকে তিনটি প্রশ্নের অবতারণা দেখা যায়। প্রথম বরপণ ও বাল্যবিবাহ, দ্বিতীয় বিধবা-বিবাহ, তৃতীয় নারীকল্যাণকর সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠায় নারীর নিরাশ্রয়তা

দূর করিবার প্রচেষ্টা। সকল নাটকেই এবং তাঁহার উপন্যাস "চন্দ্রা"তে নারীর প্রতি সহানুভূতি পরিলক্ষিত হয়। স্বার্থ-প্রসূত বন্ধন যে প্রায়ই অনর্থ উৎপাদন করে, একাধিক বার তিনি তাহা দেখাইয়াছেন।

গিরিশচন্দ্রের মহাপ্রস্থানের পরে দ্বিজেন্দ্রলালের 'পরপারে' ও 'বঙ্গনারী' ব্যতীত আর কোনও গ্রন্থকারের লেখনী হইতে উল্লেখযোগ্য সামাজিক নাটকের পরিচয় আমরা পাই নাই। স্থানে স্থানে এই দুই নাটকও গিরিশচন্দ্রের প্রভাবমুক্ত নয় বলিয়া মনে হয়।

যাহা হউক মনস্তত্ত্ব ও ট্রাজিডি লইয়া গিরিশের সামাজিক নাটক এবং এই সমস্ত নাটকে বাঙ্গালী জীবনসংগ্রামরত মধ্যবিত্ত গৃহস্থের দুঃখগীতি ও অস্ফুটক্রন্দনই মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

চরিত্র-সৃষ্টি

গিরিশচন্দ্র বলিতেন, "জীবনে যে কখনও দুঃখের আঘাত পায় নাই, কবিতার সাধনা তাহার পক্ষে বিড়ম্বনা, বিশেষ নাটক-রচনা। নাট্যকারকে অনেক অবস্থায় পড়িয়া সত্য উপলব্ধি করিতে হয়; প্রকৃত কবি নিজে যাহা অনুভব করেন না, তাহা লেখেন না। ঈশ্বরের কৃপায় আমি ঘৃণ্য বেশ্যা ও লম্পট-চরিত্র হইতে জগৎপূজ্য অবতার-চরিত্র পর্য্যন্ত দর্শন করিয়াছি।"

এই বিশাল অভিজ্ঞতা লইয়া তীক্ষ্ণ মনোবীক্ষণের বলে গিরিশ চরিত্রসৃষ্টি করিয়াছেন। সংসারে এমন চরিত্র বিরল যাহার প্রতিচ্ছবি তাঁহার রচনায় দেখিতে পাওয়া যায় না। কোন চরিত্রের মধ্যেই অসামঞ্জস্য বা অস্বাভাবিকতা নাই, প্রত্যেক চরিত্রেই স্বাভাবিক বিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক

চরিত্রেই বৈচিত্র্য আছে। হয়তো চরিত্রবিশেষ পূর্ব্ববর্তন কোন চরিত্রের ক্রমাভিব্যক্তি হইতে পারে, কিন্তু কোনটিই অপরটির অনুকরণ নহে। এক কথায় গিরিশচন্দ্রকে চরিত্র-সৃষ্টির একচ্ছত্র সম্রাট্ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

আমরা যোগেশ, হরিশ, উপেন্দ্র, কালীকিঙ্কর প্রভৃতি চরিত্রের আলোচনা করিয়াছি। সবগুলিই গাম্ভীর্য্যমণ্ডিত ভাববান্। কিন্তু একের সহিত অপরের যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যোগেশের সবই অন্তরায়, তাই তাহার পরিণতি হৃদয়বিদারক। কিন্তু হরিশ পাইয়াছিল পুত্র নীলমাধব ও জামাতা অঘোরকে। তাই পরিণতি সংঘটিত হয় মিলনে। ত্যাগনিষ্ঠ কালীকিঙ্করের প্রাণেও যেটুকু মলিনতা ছিল, তাহা রঙ্গিণীর সংশিক্ষায় দুরীভূত হয়। এইখানে তাঁহার সহিত যোগেশ, হরিশের পার্থক্য। প্রসন্নকুমার ও করুণাময় উভয়কেই সমাজের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইয়াছে, কিন্তু করুণাময়ের স্থৈর্য্য এবং সহিষ্ণুতা যেমন বেশী ছিল, সংগ্রামও করিতে হইয়াছিল সেইরূপ অধিকই।

প্রফুল্ল অবগুণ্ঠনবতী বধূ বলিয়া জোবির মত এত কাজ করা তাহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। আবার জোবি স্বামী ছাড়িয়া মধুসূদনের পদতলে আশ্রয় লইতে গেল বটে, কিন্তু কর্ম্মশেষ না হওয়ায় হরমণি ('শাস্তি কি শান্তি') আসিয়া তাহার অবশিষ্ট কাজটুকু শেষ করিয়া দিল। 'হরমণি' গৃহনিবদ্ধাও নয়, অভিজ্ঞতাও তাহার বেশী, তাই তাহার সাহসও যেমন বেশী, কাজও করিতে পারে সেইরূপ অধিক। প্রফুল্লই জোবির মধ্য দিয়া ক্রমে হরমণিতে পরিণতি লাভ করিয়াছে।

হিরণ্ময়ী স্বামিহীনা, পিতার কণ্টক, কর্ম্মশূন্যা, তাই তাহার

পরিণতি আত্মহত্যায়, আর প্রমদা হরমণির আশ্রয় লাভ করিয়া তাহার আশ্রমে কর্ম্মের প্রভাবে আপনার জীবন সার্থক করিয়া তুলিল।

'মায়াবসানের' রঙ্গিণী ও 'গৃহলক্ষ্মীর' ফুলী উভয়েই নীচকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও অবিবাহিত থাকিয়া পবিত্র ও কর্ম্মময় জীবন-যাপন করিয়াছে। মায়ের দোষগুণে রঙ্গিণী যেমন সর্ব্বদা সহজ পথ অবলম্বন করিত, ফুলী কিন্তু অনাচার দমন করিবার জন্য ঋজুপথ অবলম্বন করিতেও দ্বিধা করে নাই। শিক্ষা-প্রণালীও ছিল আবার উভয়ের পৃথক্। রঙ্গিণীর ভালবাসা কতকটা Platonic গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতাপূর্ণ, কিন্তু ফুলীর প্রেম রক্তমাংস-জড়িত হইতে চাহিলেও, প্রেমিককে সে সর্ব্বদা রক্ষাই করিত, তাহার সহিত বাহ্য মিলনে কখনও যত্নবতী হয় নাই।

বিরজা, সুন্দরা, মুঞ্জরা, মাধুরী সকলেরই ভালবাসা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উৎকর্ষলাভ করিয়াছে।

শিক্ষিতা, অভিমানিনী 'চন্দ্রা' মনে মনে যাহাকে স্বামিত্বে বরণ করিয়াছে, নিজের জীবন বিপন্ন করিয়াও তাহার প্রাণ রক্ষা করিল বটে, কিন্তু সংশয়প্রবণ প্রেমিককে আজীবন তাহার দর্শন-সুখেও বঞ্চিত করিল।

বার্নাড্ শ Annকে (Man and Superman) Tanner-এর প্রতি তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও বিবাহ-প্রার্থিনী করিয়া কথাপ্রসঙ্গে সেক্সপীয়রের চরিত্রাবলীর দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু 'চন্দ্রার' ন্যায় এরূপ চরিত্র সাহিত্যে বিরল।

অন্যত্র স্বামীর পদসেবা করিবার জন্য সরস্বতী (বিপ্লব) দাম্পত্যের বাড়ীতেও তাহার অনুসরণ করিয়াছিল। স্বামীকে

সাধনপথে সহায়তা করার জন্য সুনেত্রা (তপোবল) বেদমাতার আশ্রয় গ্রহণ করে। স্বামীর হিতার্থে দেবরপুত্রকে রক্ষা করিবার জন্য পদ্মাবতী চণ্ডালের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করে, স্বামীর সহাযতা করিবার জন্য মিরকাশিম-বেগম যুদ্ধক্ষেত্রেও তাঁহার অনুগামিনী হয়।

অন্যদিকে আবার জনা, জিজিবাই ও সুভদ্রার মাতৃত্ব, বৈষ্ণবী ও তারার স্বদেশপ্রেম, ফুলী ও রঙ্গিণীর আত্মবিসর্জ্জন, জহরা, চঞ্চলা ও গুলসানার প্রতিহিংসা, সুন্দরা ও চন্দ্রাব আত্মগৌরব, পতিতা সোণা, কাদম্বিনী ও ভুবনমোহিনীর উদারতা ও প্রতিহিংসা বৃত্তি অতি উজ্জ্বলভাবেই চিত্রিত হইযাছে। কাদম্বিনী সাধারণ গৃহস্থ ঘরের অশিক্ষিতা স্ত্রীলোক, আব ভুবনমোহিনী বড় ঘরের মেয়ে ও বধূ, তাই উভযের বিতৃষ্ণা-ভাবের মধ্যেও পার্থক্য আছে। Galswarthyর Wanda * যেমন বলিতেছেন, "Oh, Sir, may I come because I have been bad, I was only sixteen when that man spoiled me?" কাদম্বিনীও সেরূপ উন্নত আদর্শলাভ করিয়া পবিত্র হন, সোণা নসীরামের কৃপায় পরমানন্দ লাভ করেন এবং ভুবনমোহিনীও কর্ম্মের পথে অগ্রসর হইতেছিল। গিরিশ বাঙ্গালী জীবনের বিভিন্ন দিক্ হইতে চরিত্রগুলির বিশেষত্ব অতি স্বাভাবিকভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন।

গিরিশচন্দ্র যেমন গাম্ভীর্য্যমণ্ডিত ভাববান্ চরিত্র-সৃষ্টিতে অতুলনীয় ছিলেন তেমনি লঘুতর চরিত্র-সৃষ্টিতেও খুব সিদ্ধহস্তই ছিলেন। তবে তাঁহার লঘুতারল্যের অন্তরালে ভাবরত্ন প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।

* The Last নাটকে।

সংস্কৃত নাটকের বিদূষক রাজবয়স্য, লীলাসহচর, রাজার প্রণয়-ব্যাপারে সাহায্যকারী। Middle Ageএর পাশ্চাত্য Fools অত্যন্ত সরস। কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেন Fools বিদূষকের অনুরূপ। এ সম্বন্ধে সত্য যাহাই হউক, Fools-সৃষ্টিতে সেক্সপীয়র যে অদ্বিতীয় ছিলেন তাহা সর্ব্ববাদি-সম্মত। কিন্তু পূর্ব্বাপর আলোচনা করিয়া গিরিশচন্দ্রের বিদূষক-সম্বন্ধে অসাধারণ পণ্ডিত ও বিজ্ঞবর শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে "গিরিশসৃষ্ট বিদূষক-চরিত্র কোন জাতির কোন নাটকে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।"

'ধ্রুব' নাটকের বিদূষকে কোন বিশেষত্ব নাই, 'নলদময়ন্তীর' বিদূষকের প্রণয়ব্যাপারে সহায়তা এবং মিষ্টান্নপ্রীতি সংস্কৃত নাটকের বিদূষকেরই অনুরূপ। কিন্তু 'জনার' বিদূষক এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। সত্যই কোন ভাষার নাটকেই এরূপ চরিত্র দৃষ্ট হয় না। 'একবার কৃষ্ণনাম নিলে বৈকুণ্ঠলাভ'—এই জ্বলন্ত বিশ্বাস—জনার বিদূষকে প্রকটিত। বাহিরে তারল্য, অন্তরে ভক্তি ও বিশ্বাস—এই আশ্চর্য্যভাব গিরিশচন্দ্র যেমন অদ্ভুত ভাবে তুলিকায় চিত্রিত করিয়াছেন, তেমনি স্বয়ংই অদ্ভুত ভাবে অভিনয় করিয়াও দেখাইতেন।

'তপোবলের' বিদূষক সদানন্দ-চরিত্রের বিশেষত্ব, দুর্দ্দিনেও রাজসঙ্গ সে পরিত্যাগ করে নাই, বরং রাজার প্রাণরক্ষা করিতে, নিরাশ্রয় বালকের প্রাণরক্ষার্থ নিজ দেহদানেও কাতর হয় নাই।

'সিরাজদ্দৌলার' বিদূষক করিমচাচা একদিকে নবাবের জন্য প্রাণ দিতে যেরূপ প্রস্তুত, অন্যদিকে তাঁহার দেশপ্রীতিও অনন্যসাধারণ। লঘুতার অন্তরালে ভক্তি বা পরহিতব্রত বা স্বদেশপ্রেম পূর্ব্বোক্ত তিনটি চরিত্রের বিশেষত্ব।

Falstaff সেক্সপীয়রের এক অদ্ভুত সৃষ্টি। ডাক্তার জনসন বলেন, Falstaff is the summit of Shakespeare's comic invention. বার্নাড্ শ-ও বলেন, "Shakespeare's Falstaff is more vivid than any of those serious reflective characters."

সেক্সপীয়রের সম্মুখে এক জীবন্ত রহস্যমূর্ত্তি বিদ্যমান ছিল। Tarlton নামে খর্ব্বাকৃতি, খর্ব্বনাসিকা, স্থূলদেহ জনৈক রহস্যপ্রিয় ব্যক্তি হাস্যরস সৃষ্টি করিতে এতই পটু ছিল যে, হৃদয়ের গুরুভার লাঘব করিবার জন্য স্বয়ং সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথও তাহার শরণাপন্ন হইতেন। এই বাস্তব চরিত্র সেক্সপীয়রের নিপুণ তুলিকায় আরও সরস হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে; কিন্তু এরূপ চরিত্র বীরবল, গোপালভাঁড়ে সম্ভব হইলেও পরাধীনতার যুগে বাঙ্গালা দেশে তাহার সম্ভাবনা কোথায়? তথাপি পূর্ব্বোক্ত সৃষ্ট চরিত্রাবলী ব্যতীতও সিদ্ধহস্ত গিরিশের লেখনীতে যে Falstaff-এরও অনুরূপ চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায় না তাহা নহে।

'মুকুলচাঁদের' বরুণচাঁদ Falstaffএর মত যেরূপ বাক্পটু, তেমনি তাহার উপস্থিত বুদ্ধি। Henry IVএর First Partএ দ্বিতীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে Prince Henryর সম্মুখে Falstaff-এর অভিনয়ের ন্যায় মুকুলমুঞ্জরার অনুরূপ অভিনয়ও চমৎকার ও মনোরম। হ্যাজলিট্ যেমন Falstaff-সম্বন্ধে বলিয়াছেন, বরুণও সেইরূপ আপনি হাসে না, পরকে হাসায়। তবে রহস্যালাপই কেবল বরুণের কর্ম্ম নয়। ধর্ম্মজ্ঞান বলিয়া Falstaffএ কিছুই নাই, কিন্তু আফিঙের মাত্রা বৃদ্ধি হইলেও বরুণ বলে, "আফিং না দাও বাবা, নেই দেবে; খামকা যে অবলার জাতকুল খাব, তা পারবো না।"

অন্যত্র রহস্যপটু বরুণ বলিতেছে, "আফিং খেলে নেশা হবে না, পাপ কর্ত্তে গেলে মন ধুক্ ধুক্ ক'রবে না, তা হ'লে এসব করাই কেন বাবা।" বরুণের ধর্ম্মভাবও যে কিরূপ প্রবল তাহার দৃষ্টান্ত আমরা অন্যত্র পাই—"সিদে পথের চেয়ে পথ নেই, যারা সোজা পথে চলে, তাদের ঘোড়ার চালও ভাবতে হয় না, ব'ড়ের চালও ভাবতে হয় না।"

স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী এই ভূমিকায় এত অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখাইতেন যে অতঃপর জনসাধারণে তিনি Indian Sir John Falstaff নামেই অভিহিত হইতেন। বস্তুতঃ Falstaff-ভূমিকায় তাঁহার অপেক্ষা অন্য কোন বিলাতী অভিনেতা অধিকতর দক্ষতা প্রদর্শন করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ।

অন্যত্র আমরা "নয়শো রূপেয়া" নাটকে সাতুলালের চরিত্র দেখিয়াছি। সাতুলাল ও বরুণচাঁদে পার্থক্য অনেক। বরুণচাঁদ-চরিত্র যেমনি dignified তেমনি তাহাব comic রহস্যপ্রিয়তাও অতি উচ্চাঙ্গের। বস্তুতঃ বরুণচাঁদ গিরিশের অপূর্ব্ব সৃষ্টি। দীনবন্ধুর নিমচাঁদের সহিত তাহার কোন সামঞ্জস্য নাই।

অন্যান্য comic চরিত্রের মধ্যে দুলালচাঁদ ও জগন্নাথ একই রকমের চরিত্র প্রতীয়মান হইলেও উহাদের মধ্যে পার্থক্য খুব বেশী। উভয়েই মূর্খ ও দুষ্টবুদ্ধি। তবে জগন্নাথ কাব্য-রসিক। জগন্নাথের মাতামহ সর্ব্বদা তাহাকে সংযত করিয়া রাখিত আর পিতামাতার অত্যধিক আদরে দুলালের চরিত্র ও জিহ্বা দুই-ই অসংযত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার সরলতা এবং অন্তরের উদার ভাব তাহার নিজস্ব, আর সমস্ত দোষের জন্য দায়ী ব্যভিচারী পিতার চরিত্র-প্রভাব ও মাতার অত্যাদর। কেবল

তাহার প্রকৃতিই বিকৃত নহে, দেহও বিকল। কিন্তু জগন্নাথ বিম্বাবতীকে বিবাহ করিতে গিয়া নাকাল হইল, আর জোবির শিক্ষায় সরল দুলালের প্রাণ 'জ্বলজলাট্' হইয়া গেল। যাঁহারা গিরিশচন্দ্রের পুত্র দানীবাবুকে দুলাল ও জগন্নাথ উভয় ভূমিকায় অভিনয় করিতে দেখিয়াছেন, তাঁহারাই হাস্যরসাবতারণায় গিরিশ-চন্দ্রের অপূর্ব্ব ক্ষমতা দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছেন। আর গিরিশচন্দ্র স্বয়ং 'জনার' বিদূষক ও 'সিরাজদ্দৌলার' করিমচাচা হইয়া প্রমাণিত করিয়াছেন রহস্যের অন্তরালেও কত বিশ্বাস ও অশ্রুবিন্দু এই দুইটি চরিত্রে লুক্কায়িত আছে। 'মায়াবসানের' গণৎকার এবং 'করমেতিবাই'এর আলোক ও টুক্‌রো চরিত্রও হাসি ও গাম্ভীর্য্য-সংমিশ্রণে গঠিত।

Falstaff প্রেমালাপে কিরূপ সুদক্ষ সেইরূপ একটি চিত্র অঙ্কিত করিতে রাণী এলিজাবেথ সেক্সপীয়রকে অনুরোধ করায় তিনি Merry Wives of Windsorএ এইরূপ একটি চিত্র অঙ্কিত করেন; এবং Mrs. Ford ও Mrs. Pageএর দ্বারা তাহাকে বাক্সে বন্ধ করিয়া দেন। "নবীনতপস্বিনী" নাটকে দীনবন্ধু জলধরকে লইয়া এইরূপ একটি দৃশ্যের অবতারণা করেন। মায়াবসানেও সাতকড়ি চাটুয্যেকে লইয়া এইরূপ একটি চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, বোধ হয় উহা সেক্সপীয়রের Parody.

'পূর্ণচন্দ্র' নাটকে সুন্দরা ও সারি কর্ত্তৃক দামোদরকে বাঁদর সাজানো দৃশ্যটিও খুবই হাস্যোদ্দীপক। "বাসরে" বিম্বাবতীর সহিত প্রেম করিতে যাইয়া জগন্নাথের রন্ধনশালায় চাবি বন্ধ অবস্থার দৃশ্যটীও খুব সরসভাবে ফুটিয়াছে। উভয় চরিত্রেই Falstaffএর ছায়া পড়িয়াছে।

হীরুঘোষাল, রমানাথ, শুভঙ্কর, দামোদর, মদনদাদা প্রভৃতি চরিত্রেও রসজ্ঞতার যথেষ্ট পরিচয় দৃষ্ট হয়। 'মায়াবসানের' গণৎকারও খুবই সরস চিত্র।

ভজহরি, অঘোর এবং হলধর তিনটি চরিত্রই যেমন চটুল তেমনি গম্ভীর। এইরূপ পরিহাসপটু গাম্ভীর্য্যোদ্দীপক চরিত্রাঙ্কন গিরিশপ্রতিভার একটা বিশিষ্ট দিক্।

"ভ্রান্তির" রঙ্গলাল এবংবিধ সমস্ত চরিত্র অতিক্রম করিয়াছে। রঙ্গলাল যেমন নির্ভীক তেমনি প্রফুল্ল, যেমন পরসেবারত, তেমনি সরস। যেমন আপামর সাধারণকে সমভাবে সেবাদানে তাহার তৃপ্তি, অন্য দিকে নবাবকেও তেমনি বলিতেছে, "তোমার মত গোলামী আমি চাইনে।" যেমন গঙ্গাবাইকে বলিতেছে, "তুমি একবার তোমার জেতের বুলি ধ'রে গান গাও"—তেমনি আবার পরক্ষণেই কি ভাবগভীর উক্তি—"গঙ্গা, একটী ছোট ফুল ফুটে কি কথা কয়, তা কি তুমি শুনেছ? মেঘের মুখে কি প্রেম তা কি তুমি দেখেছ, চাঁদে তারায় নীরবে কেন ভেসে যায় তা কি তুমি ভেবেছ? * দেবতার প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি মানুষকে তুমি ঠাওর করেছ?"

'মায়াবসানের' শান্তিরামও একটি সরস চিত্র; তাহার "মনের পচা পাঁক উট্‌কে দেখ্‌লে কেউ কারুকে দুর্জ্জন বল্‌তোনি"—সেক্সপীয়রের উক্তিটিই স্মরণ করাইয়া দেয়—

Use every man after his desert, and who should 'scape whipping? *Hamlet*, Act, II, Sc. ii.

* Wordsworth in Ode on the Imitation of Mortalityতে বলিয়াছেন—

" To me the meanest flower that blows and pines
Thought that do often lie too deep for tears,"

'আনন্দ রহোর' বেতাল এবং গৃহলক্ষ্মীর অবধূত হেঁয়ালীতে কথা কয়। উভয়েই গাঁজাখোর, কিন্তু উভয় চরিত্রই সরস। বেতালচরিত্রে 'মন্ত্রশক্তির' প্রভাব দেখিতে পাই। বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ না করিলে চরিত্র দুইটির বিশেষত্ব সহজে ধরা পড়ে না।

গল্প এবং উপন্যাসে 'হাবার' বিশ্বনাথ, 'বাঙ্গালের' হরেন্দ্র, 'বড়বৌর' প্যারীমোহনও খুব সরস চরিত্র। কিন্তু 'চন্দ্রায়' গাঁজাখোর, বিচারশূন্য, স্নেহশীল, বলবান্ রামচাঁদ কি অবস্থার ভিতর দিয়া সিপাহীবিদ্রোহকালে সরকারের গোয়েন্দায় পরিণত হইয়াছে, সে চিত্র অতি অদ্ভুত।

লম্পট শরৎ, দালাল হীরুঘোষাল এবং অন্যান্য হীনচরিত্র— সর্ব্বেশ্বর, রমানাথ, ঘেঁচি প্রভৃতিও অতি সুন্দরভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। মোহিত পরে ভাল হইয়াছিল, কিন্তু ঘেঁচির বর্ব্বরতা ক্রমেই বাড়িয়া গেল। রমানাথ ক্রমেই হীন হইয়া চলিল কিন্তু হেবো সৎকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিল, শুভঙ্কর ও কালী-ঘটকের অপকার্য্য ক্রমেই বাড়িতে লাগিল, আর গণৎকার ও মদনদাদা শোধরাইল; এই সব চরিত্রের পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় মনের সারল্য অন্তর্হিত না হইলে সে চরিত্র শোধরাইবার আশা ও উপায় আছে।

এইরূপ মোহিনী ও রমেশ উভয়ই villain, কিন্তু মোহিনীর কন্যাস্নেহরূপ একটা ক্ষীণসূত্র ছিল, কিন্তু রমেশ 'কারুর নয়'। গিরিশ সেক্সপীয়রের Edward IVএর সহোদর Richard Thirdকে যোগেশের সহোদর রমেশরূপে পরিণত করিয়া দেখাইয়াছেন—

"He has no mixture of common humanity,

no regard for kindred nor posterity. He owes no fellowship with others, he is himself alone."

জাল উইলসৃষ্টি, পিতার মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটানো, ভ্রূণহত্যার প্রয়াস, বিধবার সম্পত্তিহরণ, বিধবার সর্ব্বনাশ-সাধন, স্ত্রীকে ঘরের বাহির করিয়া লম্পটের বাগানবাড়ীতে লইয়া যাওয়া—প্রভৃতি সমস্ত চিত্রই গিরিশের নাটকে আছে। তখন বৈজ্ঞানিক উপায়ে দেহে বিষ প্রবেশ করাইবার উপায় উদ্ভাবিত হয় নাই। শালিবাহনকে ছয়মাসে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে টানিয়া আনার মধ্যে slow poisoningএর crude methodএর পরিচয় পাওয়া গেলেও যাদবের হত্যাপ্রচেষ্টায় নূতনত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

সর্ব্বপ্রকার বারাঙ্গনা-চরিত্রও অতি সুন্দরভাবে গিরিশ-নাটকে চিত্রিত হইয়াছে। থাকমণির কদর্য্যতা, কুমুদিনীর জঘন্যতা, উজ্জ্বলার হিংসা যেমন সরসভাবে বারাঙ্গনা-চরিত্র পরিস্ফুট করিয়াছে, সেইরূপ অপরদিকে সোণা ও কাদম্বিনীর উদারতা, গঙ্গার আত্মোৎসর্গ, চিন্তামণির ভগবদ্‌প্রেমও আশ্চর্য্য-ভাবে প্রকটিত হইয়াছে। গিরিশচন্দ্রের তূলিকায় কি হীন লম্পট-চরিত্র, কি বারাঙ্গনা-চরিত্র বা কি অবতার-চরিত্র সমস্তই অদ্ভুত কৌশলে পরিস্ফুট হইয়াছে। অনাথনাথ, কালাপাহাড়, বিল্বমঙ্গল, অশোক, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি চরিত্র কিরূপে নানাপ্রকার অবস্থার মধ্যদিয়া বিভিন্ন ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে ক্রমে ভগবদ্‌প্রেমের অধিকারী হইয়াছেন তাহাও যেমন তাঁহার অতুলনীয় লেখনীতে চমৎকার হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, তেমনি সনাতন ও পূর্ণচন্দ্র-চরিত্রও উজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। আবার সোমগিরি, চৈতন্য, নসীরাম, চিন্তামণি, 'মনের মতনের' ফকির, বশিষ্ঠ,

উপগুপ্ত ও শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি ভক্ত ও জ্ঞানীদের চরিত্রও তাঁহার কলাকুশল তুলিকাপাতে মনোরমভাবে চিত্রিত হইয়াছে। গিরিশচন্দ্র যেমন রাবণ, দুর্য্যোধন প্রভৃতি চরিত্র-অঙ্কনে তেমনি বৃহন্নলা, ভীষ্ম ও প্রবীর-চরিত্র-অঙ্কনেও তাঁহার অসাধারণ কলানৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। আবার শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ এবং মহাদেবের অবতার গোরক্ষনাথ-চরিত্র-অঙ্কনেও তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

ঘটনাসৃষ্টিতে গিরিশচন্দ্রের দক্ষতা ছিল অদ্ভুত। সেক্সপীয়র সম্বন্ধে Dowden বলিয়াছেন—

"Shakespeare, though remarkable for his power of creating character, is not distinguished among dramatists for his power of inventing incident."

কিন্তু গিরিশচন্দ্র-সম্বন্ধে একথা মোটেই বলা চলে না। ঘটনাবলীর আশ্চর্য্য সমাবেশ করিতে তাঁহার দক্ষতা যে অপূর্ব্ব তাহার অধিক পরিচয় পাঠককে দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে তাহা অবগত আছেন। গৃহলক্ষ্মী, শাস্তি কি শান্তি, জনা, তপোবল প্রভৃতি প্রায় সমস্ত নাটকেই বিভিন্ন ঘটনা-প্রবাহ পরিপুষ্ট হইয়া নাটকের মূল ঘটনা কিরূপে অপূর্ব্ব শৃঙ্খলার সহিত ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, কিরূপে Theory of Utility, ফরাসী বিদ্রোহের ছায়া, Theory of Evolution প্রভৃতি এবং আবুহোসেনের বিচার এবং পাগলাগারদ প্রভৃতি দৃশ্য সংযোজিত হইয়াছে তাহা সত্যই বিস্ময়কর।

কোন কোন চরিত্রের পরিকল্পনা গিরিশচন্দ্র তাঁহার প্রত্যক্ষ

দৃষ্ট ব্যক্তি হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন। এ সম্বন্ধে সুহৃদ্বর অবিনাশচন্দ্রের নিকট হইতে প্রাপ্ত দুই-একটি দৃষ্টান্ত এখানে প্রদত্ত হইল।

জনৈক সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পুত্রশোকে কাতর হইয়া ক্ষণিক সান্ত্বনা লাভের জন্য বুদ্ধদেব অভিনয় দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব-চরিত্রে বর্ণিত আছে জনৈকা পুত্রহারা রমণী বুদ্ধদেবের নিকটে আসিয়া মৃতপুত্রের জীবন প্রার্থনা করিলে বুদ্ধদেব তাহাকে বলিলেন—"যে বাটীতে মৃত্যু হয় নাই—সেই বাটী হইতে কিঞ্চিৎ কৃষ্ণতিল লইয়া আইস।" রমণী বহু অনুসন্ধান করিয়াও ঐরূপ বাড়ী না পাইয়া বুদ্ধদেবের নিকটে ফিরিয়া আসিলে বুদ্ধদেব তাহাকে বলিলেন—

তবেই বুঝ—

মৃত্যুহস্তে ত্রাণ কভু কেহ নাহি পায়।
অতএব ধৈর্য্যমাত্র মহৌষধি শোকে।

বুদ্ধদেবের নিকটে এই উপদেশ লাভ করিয়া রমণী বলিয়াছিলেন:—

পিতঃ তব উপদেশে
ধৈর্য্যের বন্ধন দিব প্রাণে;
আসি নাই পুত্র-আশে—
আসিয়াছি তব দরশনে!
কিন্তু নয়ন-আনন্দ ছিল নন্দন আমার!

ডাক্তারটি উদ্গ্রীব হইয়া রমণীর উত্তর শুনিতেছিলেন। কিন্তু 'নয়ন-আনন্দ ছিল নন্দন আমার' এই কথাটি শুনিবামাত্র

আত্মহারা হইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং গিরিশচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া উত্তেজিতভাবে বলিলেন—

"মহাশয়, আপনি এ প্রাণের কথা কেমন করিয়া বাহির করিলেন! কত লোকে কত সান্ত্বনা দিয়াছে, কিন্তু আমার প্রাণের কথা তো কেহ বুঝিতে পারে নাই, সে যে

'নয়ন-আনন্দ ছিল নন্দন আমার।'

আর একটিমাত্র উদাহরণ দিয়াই এ অধ্যায় শেষ করিব। 'রূপ-সনাতন' নাটকে (৪র্থ অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক) চৈতন্যদেব কাশীধামে চন্দ্রশেখরের বাটীতে বৈষ্ণবগণের পদধূলি গ্রহণ করিয়া বলিতেছেন—

"আমি কৃষ্ণ বিরহে বড় কাতর, তাই ভক্তবৃন্দের পদরজ অঙ্গে ধারণ করছি, ভক্তের কৃপা হবে।"

এই দৃশ্য দেখিয়া কোন কোন গোস্বামিপ্রভু ক্ষুব্ধ হইয়া গিরিশচন্দ্রকে কটূক্তি করিয়াছিলেন। তিনি তাহাতে ভ্রূক্ষেপও না করিয়া বলিতেন, "আমি নিজে বিশেষরূপ উপলব্ধি না করিয়া কোনও কথা লিখি না। এক দিন কোনও এক ভক্তের বাটীতে ভগবৎ-প্রসঙ্গ এবং সঙ্কীর্ত্তনাদির পর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব সেই স্থানের ধূলি লইয়া অঙ্গে প্রদান করিলেন। ভক্তগণ ব্যস্ত হইয়া নিবারণ করিলে ঠাকুর বলিলেন, 'কি জানো, বহু ভক্তের সমাগমে এবং ঈশ্বরীয় কথা ও নামসংকীর্ত্তনে এই স্থান পবিত্র হইয়াছে। হরিনাম হইলে হরি স্বয়ং তাহা শুনিতে আসেন। ভক্তের পাদস্পর্শে এই স্থানের ধূলি পর্য্যন্ত পরম পবিত্র হইয়াছে।"

গিরিশচন্দ্রের যাবতীয় চরিত্রই এইরূপ অভিজ্ঞতা-মূলক।

গিরিশচন্দ্র প্রেমের কবি। 'দক্ষযজ্ঞে' তিনি দেখাইয়াছেন প্রেম ছাড়া সৃষ্টি অচল—"প্রেমডুরি সৃষ্টির বন্ধন।" 'মুকুল মুঞ্জরায়' প্রেমে মুকুল মুঞ্জরিত—তাহার তৃতীয় নয়ন উন্মীলিত, 'বলিদানে' প্রেমে দুলাল দেবতা, 'বিষাদে' সরস্বতীর "লাঞ্ছনা-গঞ্জনা—প্রেমের আভরণ," আর প্রেমেই অন্নদার আত্মবিসর্জ্জন (ভ্রান্তি)। প্রেমেই গুলসানা পিতৃহত্যার প্রতিহিংসানল নির্ব্বাপিত করিয়াও বন্দী রণেন্দ্রের সহিত এক শয্যায় শয়ন করিতে পারে, প্রেমে ইমান্ দেওয়ানা, প্রেমে মেনকা স্বর্গ ছাড়িয়া ধরায় আসিয়াছে, প্রেমে সনাতন ধূলায় গড়াগড়ি দিয়াছে, প্রেমে নিতাই "ঠেকে গেছেন প্রেমের দায়ে,"* প্রেমে বিল্বমঙ্গলের "কৃষ্ণদর্শনের ফল কৃষ্ণদর্শন!" প্রেমই গিরিশ-নাটকের কেন্দ্র—তাঁহার প্রায় সমস্ত নাটকই প্রেমকে কেন্দ্র করিয়াই পরিণতি লাভ করিয়াছে।

এইরূপে সমস্ত চরিত্র-বিশ্লেষণে সত্যই উপলব্ধি হয় যে চরিত্র-সৃষ্টিতে গিরিশচন্দ্রের সমকক্ষ স্রষ্টা সাধারণতঃ দৃষ্টিগোচর হয় না।

---

* "চৈতন্যলীলায়" নিতাইয়ের গান।

গিরিশের নূতন ছন্দ

পঞ্চম অধ্যায়

সকলেই জানেন গিরিশচন্দ্রের সৃষ্ট ছন্দই এখন বাঙ্গালা নাটকে প্রচলিত। ছন্দের জন্য তাঁহার সমসাময়িক ও পরবর্ত্তী বাঙ্গালার নাট্যকারগণ সকলেই গিরিশচন্দ্রের নিকট অল্লাধিক পরিমাণে ঋণী। রঙ্গভূমির সংস্রবে থাকিয়া তাঁহাকে নূতন ছন্দ সৃষ্টি করিতে হইয়াছিল—উৎকৃষ্ট নাটক রচনার জন্য, অভিনয়ের সুবিধার জন্য—অধিকন্তু রঙ্গালয়ের উন্নতির জন্য।

গিরিশচন্দ্র প্রথমে যে কয়খানি নাটিকা প্রণয়ন করেন—যেমন, আগমনী, মায়াতরু, আলাদিন, মোহিনীপ্রতিমা প্রভৃতি—সমস্তই গদ্যে রচিত। তিনি তাঁহার প্রথম নাটক 'আনন্দরহো'ও গদ্যে রচনা করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের যে সমস্ত উপন্যাস তিনি নাটকে রূপান্তরিত করেন তাহাও গদ্যেই করিয়াছেন। অথচ নাটক-রচনায় একটা ছন্দের আবশ্যকতা তিনি সর্ব্বদাই মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেন। এ সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র নিজেই বলিয়াছেন, "ছন্দোবদ্ধ ব্যতীত আমরা ভাষা কথা কইতে পারি না। চেষ্টা করলেও ভাষা কথা কইতে গেলেই ছন্দ হবে। সেই জন্য ছন্দ কথা নাটকের উপযোগী।" বস্তুতঃ মানব-মনের গভীর ও মর্ম্মস্পর্শী বাণীর মধ্যে কবিত্বের একটা ঝঙ্কার শুনিতে পাওয়া যায়। সাধারণ কথায় একটা ভাব

প্রকাশ করিতে গেলেও আমরা যেন ছন্দে কথা কহিয়া থাকি; যেমন, কেহ যদি কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীর জন্য শোক প্রকাশ করেন—

কোথায় গেলে গো
আমায় ফেলে গো
আমায় নিয়ে যাও গো…

ইহা সুর হইলেও অস্বাভাবিক মোটেই নয়। আবার একজন যদি ক্রুদ্ধ হইয়া বলেন, 'ভাল দেখে লব কত অহঙ্কার;' অথবা যদি বলেন—

আচ্ছা
এক দিন দেখিতে পাইবে
কি ফল হইবে ইহাতে…

তাহাও অস্বাভাবিক হয় না। এই কথাগুলি ছন্দেরই (Rhyme) একটা অংশ। সুতরাং আমরা যদি আমাদের মনের গভীর ভাবগুলিকে স্থল-বিশেষে ছন্দে প্রকাশ করি তাহা হইলে উহা আরও শ্রুতিমধুর ও মর্ম্মস্পর্শী হয়। এই জন্যই নাটকে poetry বা কবিতা, বা ছন্দ অবান্তর তো নহেই বরং উহার একান্ত প্রয়োজনীয়তাই আছে।

ইতিপূর্ব্বে মাইকেলের 'মেঘনাদ-বধ' কাব্য নাটকে রূপান্তরিত হইয়া Bengal Theatre রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইত। এই অভিনয়ে দেখা গেল যে কবির চতুর্দ্দশ অক্ষরে গ্রথিত

অমিত্রাক্ষর ছন্দ বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী ও অভিনব বাক্যভঙ্গীতে ভিন্ন রকম অদ্ভুত আকার পরিগ্রহ করিয়াছে ; যেমন—

নিশার স্বপন সম	(নিদ্রার ও স্বপ্নের ভঙ্গী)
তোর এ বারতা	(মুখ দেখাইয়া)
রে দূত	(অঙ্গুলি হেলন)
অমর-বৃন্দ	
যার ভুজবলে	
কাতর	(কম্পন)
সে ধনুর্দ্ধরে	
রাঘব-ভিখারী	
বধিলা সম্মুখ রণে	
ফুলদল দিয়া	
কাটিলা কি বিধাতা	
শাল্মলী	
তরুবরে।	

এইভাবে ছন্দকে ভাঙ্গিয়া গদ্যের মত করিয়া ইঁহারা মনে করিতেন যে কবিতার আবৃত্তি স্বাভাবিক হইতেছে এবং উহাতে সুর মোটেই নাই। কিন্তু পদ্যকে গদ্য করিতে যে অস্বাভাবিক হস্তপদ-সঞ্চালন করিতে হইত তাহাতে যে কেবল ছন্দেরই বিনাশ হইত তাহা নহে, ভাষায় এবং ভাবেও অত্যন্ত বিসদৃশ হইয়া উঠিত। অস্বাভাবিক সুর যেমন বিসদৃশ তেমনি প্রকৃত ছন্দের সুর না করিলে ভাব একেবারেই নষ্ট হইয়া যায় ; যেমন, রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রাণী'তে কুমার সেনের মুখে "বল্ বোন, বল্, তার চেয়ে মৃত্যু ভাল" এই কথাগুলি, অথবা

প্রফুল্ল নাটকের সেই হৃদয়-বিদারক কথা "আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল" সাদা কথায় বলিলে যেমন বিসদৃশ শুনা যায় আবার কবিতার প্রকৃত ছন্দ ব্যবহার না করিয়া গদ্যের মত বলিলেও ঠিক তেমনি অস্বাভাবিক হইয়া পড়ে।

অতঃপর মাইকেলের মেঘনাদ-বধ-কাব্য নাটকে রূপান্তরিত হইয়া গ্রেট্ ন্যাশনেল থিয়েটারে অভিনীত হয় (১৮৭৭)। এই নাটকে গিরিশচন্দ্র মাইকেলের উদ্ভাবিত অমিত্রাক্ষর ছন্দের যতি এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ রক্ষা করিয়া অভিনয় করেন। মেঘনাদ-বধের প্রথম অভিনয়ের জন্য তিনি যে প্রস্তাবনা রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে তদানীন্তন ছন্দোভঙ্গের প্রতি যথেষ্ট কটাক্ষ পাত করা হইয়াছে। পাঠকের অবগতির জন্য প্রস্তাবনাটির কতকাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

গভীর তুলিয়া তান, মধুর মধুর গান
গদ্য পদ্য মাঝে এই মনোহর সেতু ;
শেষাক্ষরে মিল নাই, গদ্য যদি বল তাই
পদ্য বলা যায় যতি-বিভাগের হেতু।
হ'লে কাব্য অভিনয়, জীবন সঞ্চার হয়,
কোন্ অনুরোধে যতি করিব বর্জ্জন ?
পাষাণে বাঁধিয়া প্রাণ সে যতিরে বলিদান
নাহি দিব, হই হব নিন্দার ভাজন।
যাঁর মনে উঠে যাহা তিনি বলিবেন তাহা
আমার যা কার্য্য আমি করিব এখন।

বস্তুতঃ অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রকৃত রূপ দান করিয়া গিরিশই প্রথমে মাইকেলের কবিতার যথার্থ আবৃত্তি-ধারা প্রবর্ত্তিত করেন।

ইহাতে লোকে ঐ নূতন কবিতা যেমন বুঝিতে পারে, রঙ্গমঞ্চ হইতে কাব্যকলারও তেমনি প্রভূত সৌকর্য্যসাধন হয়। বস্তুতঃ গিরিশচন্দ্রের আদর্শ আবৃত্তি-ধারা বাঙ্গালার সাহিত্যক্ষেত্রে এবং রঙ্গমঞ্চে এক শ্রেষ্ঠ অবদান। অমিত্রাক্ষর ছন্দে গিরিশের পঠনপ্রণালীই অতঃপরে বিদ্যালয়ে প্রবর্ত্তিত হয়।

কিন্তু গিরিশচন্দ্র, মহেন্দ্রলাল, অমৃত মিত্র এবং বিনোদিনী প্রভৃতির ন্যায়, অন্যান্য প্রায় সকল অভিনেতাই উচ্চারণপটু ও সুকণ্ঠ ছিলেন না। সকল সময়ে দীর্ঘ পঙ্ক্তির গতিপ্রকৃতিও রক্ষিত হইত না। তাই একদিকে দীর্ঘছন্দ ও দীর্ঘযতির আবৃত্তির দোষে যেমন রসভঙ্গ হইত, অন্য দিকে আবার প্রতিদ্বন্দ্বী রঙ্গালয়ে কাব্যের কবিত্ব-বিনাশে তিনি ব্যথিত হইয়া উঠিলেন। এই অনুভূতিই গিরিশচন্দ্রকে নূতন ছন্দঃপ্রবর্ত্তনে প্রেরণা প্রদান করিল।

ভাবের পরিপূর্ণ অভিব্যঞ্জনা ছন্দ ব্যতিরেকে হয় না। ছন্দই ভাবপ্রকাশের সরলতম বাহন। ছন্দই ভাষার মধ্যে একটা সাবলীল গতিসঞ্চার করিয়া উহাকে সুখপাঠ্য করিয়া তোলে, আবৃত্তিও তাই সরস হয়। জগতের শ্রেষ্ঠ নাট্যকারগণ সকলেই নাটকের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কবিত্বের অবতারণা করিয়াছেন। ফরাসী দেশের Poetic Drama এই কারণেই রচিত হয়। কিন্তু ইংলণ্ডে মিল-ছন্দ (পয়ার) তেমন জমে নাই। আমাদের 'ভদ্রার্জ্জুন' নাটকে প্রথমে পয়ার ছন্দ ব্যবহৃত হয়, কিন্তু নাটক-হিসাবে উহা মূল্যহীন। ইহার অল্পদিন পরেই মাইকেল মধুসূদনের প্রাদুর্ভাব। এই মাইকেলের সহিত ইংলণ্ডের মিলটনের খুবই সৌদৃশ্য দৃষ্ট হয়। কিন্তু মিলটনই ইংরাজী কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রথম প্রবর্ত্তক নহেন।

প্রসিদ্ধ সনেট-রচয়িতা আর্ল অব্ সারে-ই উহার প্রথম প্রবর্ত্তনা করেন। তখন এই ছন্দের শিশু-অবস্থা, অতঃপরে স্যাক্ভিলও অমিত্রাক্ষর ছন্দে গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু নাট্যকার মার্লো-ই ইংরাজী নাটকে উক্ত ছন্দের প্রয়োগে বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করেন, আর উহা চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে সেক্সপীয়রের নিপুণ হস্তে। তিনি বাঁধাধরা গণ্ডী অতিক্রম করিয়া উহাকে সম্পূর্ণ ও সুগঠিত আকার প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার ভাষা সম্পূর্ণ নাটকোপযোগী—কোথাও সহজ, কোথাও অলঙ্কৃত, কোথাও বা গুরুগম্ভীর, কোথাও ভাবঘনবহুল, কোথাও বা তরল, চটুল ও রসাঢ্য। কিন্তু মিল্টনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। তিনি কেবল চসার এবং স্পেন্সারের ছন্দের 'মিল'ই বর্জ্জন করেন নাই, তাঁহার ভাষাও সর্ব্বত্রই গুরুগম্ভীর। ভাষার গম্ভীরতার সহিত তাঁহার গভীর ভাবপ্রবাহ তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়া, তালে তালে নৃত্য করিতে করিতে রণবাদ্যের ন্যায় উদাত্ত সুরে হৃদয়কে স্পন্দিত, সন্ত্রস্ত ও বিমোহিত করিয়া ফেলে। 'Paradise Lost'-এর উন্নত ভাষায় কাহার হৃদয় না আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে :

—I thence
Invoke thy aid to my adventurous song
That with no middle flight intends to soar
Above the Ionian mount, while it pursues
Things unattempted yet in prose or rhyme.

কিন্তু এইরূপ গুরুগম্ভীর দীর্ঘস্তবক নাটকের পক্ষে কখনও উপযোগী হয় না বলিয়া মিল্টন Samson Agonistis-এ

Paradise Lost-এর ছন্দ ব্যবহার করেন নাই। তবে এই নাটকীয় ছন্দের স্রষ্টাও যে সেক্সপীয়র, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সে ভাষা Paradise Lost-এর ভাষার ন্যায় এত শক্তিমান্ না হইতে পারে, কিন্তু ভাষা খুবই সরল ও নিখুঁত (genuine).

সেক্সপীয়রের অমিত্রাক্ষর প্রায়শঃ মুক্ত, কোথাও বা যুক্ত-মিশ্রিত, কিন্তু মিল্‌টনের ছন্দ একেবারে যুক্ত। মিল্‌টনের ছন্দের ন্যায় বাঙ্গালার মধুসূদনের যুক্ত ছন্দেও বাঙ্গালা কবিতা ভাবের গভীরতায় তালে তালে নৃত্য করিত। কিন্তু নাটকের ভাষা প্রবর্ত্তিত করার গুরুভার গিরিশের উপরই নিয়োজিত হইয়াছিল, তবে পার্থক্য এই—সেক্সপীয়র যেমন মিল্‌টনের পথপ্রদর্শক ছিলেন, গিরিশ সেরূপ নহেন। তিনি মাইকেলেরই পদাঙ্কানুসরণ করিয়া মাইকেলের ছন্দ হইতে সম্পূর্ণ এক নূতন ছন্দ প্রবর্ত্তিত করেন। বাঙ্গালার অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তক মধুসূদন তাঁহার সৃষ্টি-চাতুর্য্য-সম্বন্ধে নিজেই সগৌরবে লিখিয়াছেন—

রচিব এ মধুচক্র
গৌড় জন যাহে
আনন্দে করিবে পান
সুধা নিরবধি।

অতঃপরে হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে এই ভাষা ও ছন্দের পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছেন। হেমচন্দ্রের অমিত্রাক্ষর ছন্দ মাইকেল অপেক্ষাও অধিকতর যুক্ত (অমুক্ত) এবং সংস্কৃত অলঙ্কার-বিশিষ্ট। নবীনচন্দ্রের অমিত্রাক্ষর যুক্ত এবং মুক্ত উভয়েরই মধ্যবর্ত্তী। তবে ঐ

ছন্দের সংস্কার-সাধন করিবার পুরস্কার একমাত্র গিরিশচন্দ্রেরই প্রাপ্য।

মাইকেল 'পদ্মাবতী' নাটকের সামান্য কয়েকটি ছত্রে নাটকীয় ভাষার একটু পরিবর্ত্তন-সাধন করিয়াছেন :—

কলি—(স্বগত) ঐ শুন
বীরদর্পে তা সবার সঙ্গে যুঝে এবে
ইন্দ্রনীল। (চিন্তা করিয়া)
এই অবসরে যদি আমি
রাণী পদ্মাবতীরে লইতে পারি হরি
তা হ'লে কামনা মোর হবে ফলবতী—
প্রেয়সী-বিরহ-শোকে ইন্দ্রনীল রায়
হারাইবে প্রাণ, ফণী মণি হারাইলে
মরে বিষাদে। এ হেতু সারথির বেশে
আসিয়াছি হেথা আমি। (পরিক্রমণ)
কি আশ্চর্য্য! অহো!
এ রাজকুলের লক্ষ্মী মহাতেজস্বিনী,
এর তেজে এ পুরীতে প্রবেশ করিতে
অক্ষম কি হইনু হে? (সহাস্য বদনে)
কেনই বা না হব?

কিন্তু ইহাও নাটকের পক্ষে উপযোগী নহে, আর ইহাতে ভাবেরও গাম্ভীর্য্য নাই। গিরিশচন্দ্র অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন সেই ভাষারই জন্য—যে ভাষার গতি অব্যাহত, আবৃত্তি যাহার সহজ, কবিত্বে যাহা মধুর, শ্রোতার হৃদয় যাহা স্পর্শ করে—প্রাণে সাড়া জাগাইয়া দেয়। ঠিক এই সময়

কালীপ্রসন্ন সিংহের "হুঁতোম প্যাঁচার নক্সার" প্রচ্ছদপৃষ্ঠায় মুদ্রিত নিম্ন-লিখিত কয়টি ছত্র তাঁহার নয়নপথে পতিত হয়—

হে সজ্জন !
স্বভাবের সুনির্ম্মল পটে,
রহস্য-রসের রঙ্গে,
চিত্রিনু চরিত্র দেবী সরস্বতী-বরে,
কৃপা-চক্ষে হের একবার—
শেষে বিবেচনা মতে,
তিরস্কার কিংবা পুরস্কার যাহা হয়,
দিও তাহা মোরে,
বহু মানে লব শির পাতি।

গিরিশচন্দ্রের নিকট এই কয়েকটি লাইন হইল Archimedes-এর *Eureka*।

এই কবিতার ছন্দই হইল গিরিশচন্দ্রের আদর্শ, কিন্তু তাঁহার হস্তে পরিমার্জ্জিত হইয়া উহা একেবারে নূতন ছন্দে পরিণত হইয়া গেল, নূতন রূপে বাঙ্গালা নাটকের সম্পূর্ণতা সাধন করিল—বাঙ্গালা ভাষা বিশিষ্টরূপে সমৃদ্ধ হইল। কালীপ্রসন্নের ক্ষণিক নক্ষত্রালোক গিরিশ-প্রতিভার উজ্জ্বল দীপ্তিতে পূর্ণচন্দ্রের মত জ্যোতিষ্মান্ হইয়া উঠিল। 'রাবণবধ' হইতে আরম্ভ করিয়া গিরিশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ এবং শেষ অবদান 'তপোবল' পর্য্যন্ত সমস্ত নাটকই এই ছন্দে রচিত। 'ম্যাক্‌বেথের' অতুলনীয় অনুবাদও তিনি এই ছন্দেই করিয়াছেন।

গিরিশচন্দ্রের প্রথম নাটক 'রাবণ-বধেই' এই ছন্দের

অব্যাহত সাবলীল গতি আমরা দেখিতে পাই। রাবণ-বধের পর সীতা এই ছন্দেই দৃপ্তস্বরে রামকে বলিতেছেন—

সতী নারী আমি কহি, চন্দ্রসূর্য্য সাক্ষী করি,
সাক্ষী মম দিবস শর্ব্বরী,
সাক্ষী রুক্ষকেশ মলিন বসন,
সাক্ষী শীর্ণকায়,
সাক্ষী আপাদ মস্তক বেত্রাঘাত,
সাক্ষী বয়ানে রোদন-চিহ্ন,
সাক্ষী দেখ নয়নের নীর
ঝরিতেছে অবিরল,
সাক্ষী পবননন্দন হনু,
সাক্ষী বিভীষণ—
সাক্ষী নাথ তোমার অন্তর।

—রাবণ-বধ, ৫ম অঃ, ৫গঃ

এই ছন্দেই বুদ্ধদেব বলিদানের বিরুদ্ধে বিম্বিসারকে প্রেরণা দিতেছেন—

বাক্যহীন নিরাশ্রয় দেখ ছাগগণে,
কাতর প্রাণের তরে মানব যেমতি
মানবের প্রায়!
অস্ত্রাঘাতে ব্যথা লাগে কায়
বেদনা জানাতে নারে!
বধি তারে ধর্ম্ম উপার্জ্জন
না হয় কখন,
বিচক্ষণ বুঝ মনে মনে।

কিন্তু যদি বলিদান বিনা
তুষ্টা নাহি হন ভগবতী—
দেহ মোরে বলিদান ;
দ্বাদশ বৎসর ক'রেছি কঠোর তপ
যদি তাহে হয়ে থাকে ধর্ম্ম-উপার্জ্জন,
করি রাজা, তোমারে অর্পণ—
সুপুত্র হউক তব।
যদি তব থাকে কোন পাপ
পুত্র বিনা যার হেতু পেতেছ সন্তাপ—
ইচ্ছায় সে পাপ আমি করিব গ্রহণ—
বধি রাজা আমার জীবন
নিরাশ্রয় ছাগগণে কর প্রাণদান।

ভাবের সঙ্গে নৃত্য করিতে করিতে পাগলিনী এই ছন্দেই ভগবানের বিভিন্ন রূপের কল্পনা করিতেছেন—আর প্রতি রূপ-কল্পনার সঙ্গে সঙ্গে চিন্তামণির অপরূপ রূপমাধুরী তাঁহার মানস-চক্ষে মূর্ত্ত হইয়া উঠিতেছে—

চিন্তামণি কভু এলোকেশী
উলঙ্গিনী ধনী,
বরাভয়-করা ভক্ত মনোহরা
শবোপরে নাচে বামা।
কভু ধরে বাঁশী
ব্রজবাসী বিভোর সে তানে

কভু রজত ভূধর
দিগম্বর জটাজূট শিরে,
নৃত্য করে বম্ বম্ বলি গালে।
কভু রাস রসময়ী প্রেমের প্রতিমা
সে রূপের দিতে নারি সীমা—
প্রেমে ঢলে, বনমালা গলে
কাঁদে বামা—
"কোথা বনমালী" ব'লে।
একা সাজে পুরুষ প্রকৃতি
বিপরীত রতি,
কেহ শব কেহ বা চঞ্চলা।
কভু একাকার
নাহি আর কালের গমন।
নাহি হিল্লোল কল্লোল
স্থির—স্থির সমুদয়;
নাহি—নাহি, ফুরাইল বাক্;—
বর্ত্তমান বিরাজিত।

এই ছন্দ এমনি সহজ ও স্বচ্ছন্দ গতিতে বহিয়া চলিয়াছে—কথায় কথায় এমনি স্বাভাবিক মিল গড়িয়া উঠিয়াছে যে এইরূপ শ্রুতিমধুর ছন্দই গিরিশচন্দ্রের এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। এই ছন্দের আর একটি বিশেষত্ব পাঠকবর্গ সহজেই লক্ষ্য করিতে পারিবেন যে, ইহা সর্ব্বদিকে মুক্ত হইলেও মাঝে মাঝে কথাগুলিতে আশ্চর্য্য রকম মিল আছে। যেমন—মণি, জিনি, ধনি; করা,

হয়া ইত্যাদি। নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটিতে পাঠক এই ছন্দের অমিলের মধ্যে আশ্চর্য্য মিল দেখিতে পাইবেন—

আরে মন, একি তোর প্রতারণা
তুমি বারাঙ্গনা—বেশভূষা পরায়ণা
মলিন বসনা বিভূষনা
পাগলিনী সম হতে চাও ?

এই সহজ ও স্বচ্ছন্দগতি ছন্দেই বিশ্বামিত্র তপোবলের প্রভাবে সকল বৈষম্য দূরীভূত করিবার জন্য সমগ্র হিন্দুজাতিকে আহ্বান করিয়াছেন,—

হে মানব,
ব্রহ্মর্ষিত্ব দেবদ্বিজ কৃপায় লভিয়ে
আকাঙ্ক্ষা নহেক সম্পূরণ।
আকাঙ্ক্ষা আমার—
নরত্ব দুর্লভ অতি বুঝুক মানব।
নাহি জাতির বিচার
লভে নর উচ্চপদ তপোবলে।
তপ দৃঢ় সহায় জীবনে ;
প্রভাবে যাহার
ঘুচে নীচ সংস্কার,
মলিনত্ব হয় বিদূরিত ;
জন্মে আত্মবোধ
ঘুচে তায় জনম-মরণ-ভ্রম
উচ্চ হ'তে উচ্চতর স্তরে
তপোবলে করে আরোহণ।

কোন প্রতিভাশালী ব্যক্তি নূতন কিছু সৃষ্টি করিলেই জনসাধারণ তাঁহার প্রতি বিরূপ হইয়া উঠেন। মাইকেল মধুসূদন যখন সর্ব্বপ্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দ বাঙ্গালা ভাষায় প্রবর্ত্তন করেন তখন ঈশ্বর গুপ্তের মত কবি ও মনীষীরাও তাঁহাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং গিরিশচন্দ্র যখন মুক্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তন করিলেন, তখন অনেকেই যে তাঁহার বিপক্ষতা-আচরণ করিয়াছিল তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। কেহ কেহ গিরিশচন্দ্রের প্রবর্ত্তিত ছন্দকে বিদ্রূপ করিবার অভিপ্রায়ে বলিতেন, "শ্লেটে গদ্য লিখিয়া তাহার দুই দিক মুছিয়া দাও, দেখিবে গৈরিশী ছন্দ হইয়াছে।" কেহ কেহ বলিয়াছেন, "ইহা জলবৎ তরল," আবার কেহ কেহ বলিয়াছেন, "এরূপ উচ্ছৃঙ্খল রচনা ছন্দের অন্তর্গতই নহে।" যাঁহারা এখনও এইরূপ মত পোষণ করেন তাঁহাদিগকে আমরা মিল্টনের 'স্যামসন এগোনিস্‌টিস্‌' পড়িতে অনুরোধ করি। সেক্সপীয়রে অমিত্রাক্ষর ছন্দই আছে কিন্তু তাহার অনেক স্থল গদ্যভাবাপন্ন। কিন্তু গিরিশের ছন্দ সম্পূর্ণরূপে পদ্যভাব বিশিষ্ট—তাঁহার নাটকের এক একটি কথা যেন কবিত্বের এক একটি তরঙ্গ। তদানীন্তন মনস্বী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই ছন্দের ঐকান্তিক প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছেন—

"আমরা গিরিশচন্দ্রের নূতন ধরণের অমিত্রাক্ষর ছন্দের বিশেষ পক্ষপাতী। ইহাই যথার্থ অমিত্রাক্ষর ছন্দ। ইহাতে ছন্দের পূর্ণ স্বাধীনতা ও মিষ্টত্ব উভয়ই রক্ষিত হইয়াছে। কি মিত্রাক্ষরে, কি অমিত্রাক্ষরে অলঙ্কার-শাস্ত্রোক্ত ছন্দ না থাকিয়া হৃদয়ের ছন্দ প্রচলিত হয়। ইহাই আমাদের একান্ত বাসনা

ও ইহাই আমরা করিতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছি। গিরিশবাবু এ বিষয়ে আমাদের সাহায্য করাতে আমরা অতিশয় সুখী হইলাম।”

—ভারতী, মাঘ ১২৮৮

গিরিশচন্দ্রের ছন্দ-সম্বন্ধে “সাধারণী”-সম্পাদক সাহিত্যরথ অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ও আনন্দ-সহকারে লিখিয়াছিলেন, “এত দিনে নাটকের ভাষা সৃজিত হইয়াছে।” ছন্দঃ-প্রবর্ত্তন-সম্বন্ধে কবিবর নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট গিরিশচন্দ্র নিজে যে কৈফিয়ৎ দিয়াছেন নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা হইল :

“...... তুমি যুদ্ধ না করিলে কি হয়? আমি যুদ্ধ ক'রবো, যুদ্ধ আর কিছু নয়, ‘গৈরিশী ছন্দের’ একটা কৈফিয়ৎ। ‘গৈরিশী ছন্দ’ বলিয়া যে একটা উপহাসের কথা আছে, তার প্রতিবাদ। প্রতিবাদ এই, আমি বিস্তর চেষ্টা ক'রে দেখেছি, গদ্য লিখি সে এক স্বতন্ত্র, কিন্তু ছন্দোবন্ধ ব্যতীত আমরা ভাষা-কথা কইতে পারি না। চেষ্টা ক'রলেও ভাষা-কথা কইতে গেলেই ছন্দ হবে। সেই জন্য ছন্দে কথা—নাটকের উপযোগী। উপস্থিত দেখা যাক্ কোন্ ছন্দে অধিক কথা হয়। দীর্ঘ ত্রিপদী, লঘু ত্রিপদী বা যে যে ছন্দ বাঙ্গালায় ব্যবহার হয়, সকলগুলি পয়ারের অন্তর্গত। অমিত্রাক্ষর ছন্দ পড়িবার সময় আমার যেমন ভাঙ্গা লেখা, তেম্‌নি ভেঙ্গে ভেঙ্গে প'ড়তে হয়। যেখানে বর্ণনা, সেখানে স্বতন্ত্র, কিন্তু যেখানে কথাবার্ত্তা, সেইখানেই ছন্দ ভাঙ্গা। তারপর দেখা যাউক, কোন ছন্দ অধিক। দীর্ঘ ত্রিপদীর দ্বিতীয় চরণের সহিত শেষ চরণে মিলিত হইয়া অধিকাংশ কথা হয় :—

······ 'দেখিলাম সরোবরে কমলিনী বান্ধিয়াছে করা' ; লঘু-ত্রিপদীর দ্বিতীয় চরণ ও শেষ চরণ অনেক সময় মিলিত হয় :—

বিরস বদন রাণীর নিকট যায়।

এ সওয়ায় পয়ার, লঘু ত্রিপদীর এক এক পদ বিশেষতঃ শেষ পদ পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হয়। আমার কথা এই যে, এ স্থলে নাটকে চৌদ্দ অক্ষরে বাঁধা পড়া কেন? চৌদ্দ অক্ষরে বাঁধা পড়লে দেখা যায়—সময়ে সময়ে সরল যতি থাকে না।

বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে।

এরূপ হামেসাই হবে। বাঙ্গালা ভাষায় ক্রিয়া 'হইয়াছিল' প্রভৃতি অনেক সময়েই যতি জড়িত করিবে। কিন্তু গৈরিশী ছন্দে সে আশঙ্কা নাই। যতি সম্পূর্ণ করিয়া সহজেই লেখা যাইবে। আর এক লাভ, ভাষা নীচ হ'তে বিনা চেষ্টায় উচ্চস্তরে সহজেই উঠ্‌বে। সে সুবিধা চৌদ্দয় কিছু কম। কাব্যে তার বিশেষ প্রয়োজন নাই ; কিন্তু নাটকে অধিকাংশ সময়ে তার প্রয়োজন।"

বাস্তবিক এই প্রয়োজনীয়তা সেক্সপীয়র, মিল্টন ও গিরিশ ভালরূপ বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই নাটকে তাঁহারা ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রচলন করিয়াছেন। বস্তুতঃ গৈরিশী ছন্দে অভিনয় করা যেমন অভিনেতার পক্ষে সহজ হয় তেমনি আবার সর্ব্বসাধারণের কাছে উহা শ্রুতিমধুর এবং বোধগম্যও হয় সহজে। মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দে তাহা সম্ভব নহে।

গৈরিশী ভাষাই এখন নাটকের ভাষা। এ সম্বন্ধে দুই-একটি উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হইবে। সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার রাজকৃষ্ণ রায় "হরধনুর্ভঙ্গ" নাটকে ও অন্যত্র এই ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

বিশ্বামিত্র। শুন, রাম রঘুমণি !
কন্দর্পের এ আশ্রম আছিল পূর্ব্বেতে,
অন্য নাম কাম তাঁর—
পূর্ব্বে তিনি ছিলা দেহধর।
একদিন
মহাদেব দেব ত্রিলোচন
সমাধি করিয়া শেষ
লয়ে দেবগণে
যাইতে ছিলেন সুখে বিলাসের স্থানে,—

এই রচনা যে কতকাংশে গদ্যভাবাপন্ন তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাতে গৈরিশী ছন্দের অনুসরণ করা হইয়াছে বটে কিন্তু এই অনুসরণ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই। অমৃতলাল বসু মহাশয় "আদর্শবন্ধু"তে যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ গৈরিশী ছন্দের অনুরূপ—ছন্দে তিনি গিরিশচন্দ্রের প্রদর্শিত পথই সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করিয়াছেন। এখানে তাহার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল—

শুন আবার—আবার।
অধিত্যকায় উপত্যকায়
হয় প্রতিধ্বনি।

সাগর-কল্লোল দিয়ে কোলাহলে যোগ,
কাঁপাইছে বসুমতী।
বল মোরে বল
স্বদেশ-বিদ্বেষী—
মাতৃদ্রোহী ক্রীতদাসদল
বল যারে মাতৃভূমি করেছ বিক্রয়
কোথা সেই দুর্দ্দান্ত রাজন ?

পঞ্চম অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক

দ্বিজেন্দ্রলাল 'তারাবাই,' 'সোরাবরুস্তম,' 'ভীষ্ম,' 'সীতা' ও 'সিংহলবিজয়ে' আংশিক ভাবে অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার করিয়াছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই তিনি চৌদ্দ অক্ষরযুক্ত ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন; তবে কোথাও যে সে নিয়মের ব্যতিক্রম করেন নাই তাহা নহে। ভাষার উপর আশ্চর্য্য অধিকার থাকা সত্ত্বেও তাঁহার চৌদ্দ অক্ষরযুক্ত ছন্দের অনেক স্থলে গদ্যের আভাস পাওয়া যায়। আর যেখানে তিনি ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন সেখানে তাঁহার ভাষা স্বচ্ছন্দ গতি লাভ করিতে পারে নাই। "সিংহলবিজয়ে" কুবেণী বলিতেছে—

পিতৃহীনা আমি মাতা, ভাবিয়াছিলাম
মাতা আছে, তাঁর ক্রোড়ে পাইব আশ্রয়,
তাঁর বক্ষে সিক্ত মুখ লুকায়ে কাঁদিব
ভাবিয়াছিলাম, তবু আছে একজন
আমার সংসারে, পারি কহিতে যাহারে
নিভৃতে প্রাণের কথা। দেখিলাম নাই—

কেহ নাই সংসারে আমার। পিতা নাই—
ছিল মাতা, তাও নাই। জানো কি জননি—
জানো কি ? না, তুমি কি জানিবে ? এত ভাল
বাসিতে না কভু, ভালবাসিতে শিখনি—

এখানে আমরা মাইকেলের উদাত্ত স্বরও শুনিতে পাই না, আবার গৈরিশী ছন্দের তরঙ্গায়িত ভাষাও ইহাতে নাই। অবশ্য ভাবও আছে, করুণ রসও আছে, নাই কেবল কবিত্বের মধুর ঝঙ্কার। তাঁহার "সীতা"য়ও এইরূপ ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে। কয়খানি নাটকই তুলনা করিলে প্রতীতি হইবে যে গিরিশচন্দ্রের ছন্দ বন্ধনমুক্ত, ভাষা স্বচ্ছন্দগতি—তাঁহার ভাব, ভাষা এবং ছন্দ স্তরের পর স্তর অতিক্রম করিয়া উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে আরোহণ করিয়াছে। সিরাজদ্দৌলা বলিতেছেন—

স্বেচ্ছাচারে চলিত জীবন
হিতাহিত ছিলনা বিচার—
মদ্যপানে করিয়াছি
শত শত দুর্নীত ব্যাভার।
কিন্তু কহি স্বরূপ বচন—
বসি বৃদ্ধ নবাবের মরণ-শয্যায়
শেষ বাক্যে তাঁর
জন্মিয়াছে ধারণা আমার,
রাজকার্য্য নহে স্বেচ্ছাচার।
নবাব প্রজার ভৃত্য, প্রভু প্রজাগণে;
প্রজার মঙ্গল-সাধন
নবাবের উদ্দেশ্য জীবনে।

দ্বিজেন্দ্রলাল বলিয়াছেন, '"তারাবাই" প্রকাশিত হইবার পর স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র সেনকে তাঁহার অনুরোধে এক কপি পাঠাই। তিনি পড়িয়া এই মত প্রকাশ করেন যে এ নূতন ধরণের অমিত্রাক্ষর—মাইকেলের মাধুরী ইহাতে নাই—এ অমিত্রাক্ষর ইহাতে চলিবে না। সেই সঙ্গে স্বর্গীয় মাইকেল মধুসূদনের দৈববাণী মনে হইল যে, অমিত্রাক্ষর নাটক এখন চলিতে পারে না। দীর্ঘ বক্তৃতা অমিত্রাক্ষরে চলে। কিন্তু দ্রুত কথোপকথনে কথা ত গদ্যের মত হইতেই হইবে।............দেখিলাম সেক্‌স্‌পিয়রে খানিক গদ্য খানিক পদ্য, তথাপি দুইটি খাপ্ খাইতেছে, কারণ ইংরেজী ভাষায় সেরূপ অবস্থা আসিয়াছিল। বাঙ্গালায় তাহা চলে না।............লোকে কথাবার্ত্তা পদ্যে করে না, গদ্যে করে। অতএব পদ্যে নাটক রচনা করিলে অস্বাভাবিক ঠেকিবেই।............এই সকল বিবেচনা করিয়া নাটকগুলি গদ্যে রচনা করিতে মনস্থ করিলাম।" দ্বিজেন্দ্রলালের 'রাণাপ্রতাপ', 'দুর্গাদাস', 'নুরজাহান', 'মেবারপতন', 'সাজাহান', 'পরপারে' ও 'বঙ্গনারী' গদ্যে রচিত এবং অমূল্য নাট্যগ্রন্থ। গিরিশচন্দ্রেরও ছয়খানি সামাজিক নাটক, ঐতিহাসিক নাটক সবগুলি, পৌরাণিক নাটকেরও অনেক স্থান, 'বাসর' এবং 'হরগৌরী' প্রভৃতি নাটক গদ্যে রচিত। তথাপি তাঁহার পৌরাণিক ও ধর্ম্মমূলক নাটকে যে ছন্দোমাধুরী দেখা যায় তাহা গিরিশচন্দ্রের সম্পূর্ণ নিজস্ব। তাঁহার এই ছন্দোমাধুর্য্যের ধারাপ্রবাহ 'তপোবল' পর্য্যন্ত সমানভাবে প্রবাহিত হইয়াছে। তাঁহার প্রবর্ত্তিত ছন্দোমাধুর্য্যের জন্যই বর্ত্তমান যুগের 'কর্ণার্জ্জুন' ও 'সীতা' সাধারণের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে।

ক্ষীরোদপ্রসাদও 'রঘুবীর', 'ভীষ্ম' ও 'নরনারায়ণ' প্রভৃতি নাটকে কখনও চৌদ্দ অক্ষরযুক্ত অমিত্রাক্ষর, কখনও বা মুক্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন। অধিকাংশ স্থলে তিনি নিয়মের বন্ধনকে এড়াইয়া চলিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নাটকীয় কবিতার ভাষা দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষা অপেক্ষা অধিকতর তেজোব্যঞ্জক। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। দুর্য্যোধন গান্ধারীকে বলিতেছেন—

আবার সে পুরাতন কথা! মা, মা!
নির্জ্জনে বসিয়া চিন্তা করিতেছি আমি
পাণ্ডবের বধের উপায়।
এ সময় অর্থহীন উপদেশে
বাধা দিতে এসো না আমারে।
যদি আশীর্ব্বাদে ইচ্ছা থাকে, কর।
নহে মাতা গৃহে ফিরি' লওগে বিশ্রাম।
সমরে হইয়া জয়ী
যে দিন ফিরিব মাতা
প্রণমিতে চরণে তোমার, সেই দিন
অর্থহীন যত বাক্য আছে অভিধানে
একান্তে বসিয়া—
নিঃশেষে ঢালিও তুমি সন্তানের কাণে।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু "ওথেলোতে", অমৃতলাল বসু মহাশয় "যাজ্ঞসেনী" নাটকে, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ণার্জ্জুন, শ্রীকৃষ্ণ ও শকুন্তলা প্রভৃতি নাটকে, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র

চৌধুরী 'সীতায়', শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী মহাশয় 'কচ ও দেবযানী'তে এবং বর্ত্তমানে ভূপেন্দ্রনাথ, মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিশ্চন্দ্র সান্যাল-প্রমুখ নাট্যকারগণ প্রায় সকলেই গিরিশচন্দ্রের প্রবর্ত্তিত ছন্দ ব্যবহার করিয়াই তাঁহাদের রচনা-কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন।

কেহ কেহ বলেন গিরিশচন্দ্র মাইকেল, নবীন ও হেমচন্দ্রের ন্যায় ভাষা-ব্যবহারে অপটু ছিলেন বলিয়াই ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। কিন্তু প্রয়োজন হইলে গিরিশচন্দ্র যে, ভাব ও চরিত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া তাঁহাদের অনুসৃত অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগেও সিদ্ধ হস্ত ছিলেন, তৎপ্রণীত 'চণ্ড,' 'মুকুল মুঞ্জরা,' 'কালাপাহাড়' প্রভৃতি নাটকই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। 'কালাপাহাড়' নাটকে চঞ্চলা বলিতেছে—

অনুরোধ রক্ষা কর হে রাজন্, হেন
জন নাহি ত্রিভুবনে—তার দরশনে
বঞ্চিত করিবে মোরে। টলে হিমাচল,
শোষে সিন্ধুজল, হীনবল সমীরণ
অনল শীতল, রবিশশী গ্রহতারা-
দল, নভস্থলে যদি নাহি ফোটে, টোটে
বিশ্বের বন্ধন, সাধু যদি ধর্ম্ম ত্যজে'
প্রেমিকায় বারে, শক্তি কেবা ধরে। প্রেম—
বল প্রেমিকার। যাও রাজা পুন দেখা
হবে, শক্তি প্রেমিকার বুঝিবে ভূপাল।
উচ্চকুল ধ্বংস— নারী অরির কারণ।

—৪র্থ অঙ্ক, ৩য় গর্ভাঙ্ক

মাইকেলের ভাবের গভীরতা এবং ভাষার গাম্ভীর্য্য গিরিশচন্দ্রের 'চণ্ড' নাটকেও আমরা দেখিতে পাই।—

হের ওই চিতোর নগর পুণ্যধাম—
উচ্চশির প্রাচীর-বেষ্টিত, ধরাধর
গর্ব্ব খর্ব্ব যাহে, সূর্য্যবংশ-অবতংশ
গৌরব আধার বাপ্পারাও, কীর্ত্তি যার
ব্যাপ্ত ধরাতলে, বসিতেন ওই পুরে ;
স্বর্গোপম গরীয়সী মম জন্মভূমা—
পিতৃ পিতামহ দেবালয়, আজি তথা
বিহরে রাঠোর—রম্য নন্দন কাননে
দুরন্ত দানবদল, রাণা সিংহাসনে
মারবার কিরাত বর্ব্বর, কেশরীর
গহ্বরে জম্বুক, বসে চণ্ডাল বেদাতে
রাজহস্তী ভুজঙ্গ-বেষ্টনে জর জর
সুন্দর চিতোর এবে পিশাচের ঘর।

'মুকুল মুঞ্জরা' নাটকেরও কোন কোন স্থানে গিরিশচন্দ্র মাইকেলী ছন্দ ও ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন।

উপরে গিরিশচন্দ্রের নাটক হইতে যে সকল স্থান আমরা উদ্ধৃত করিলাম তাহাতে ইহা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, তিনি যে শুধু মাইকেলী ছন্দের যতি ভঙ্গ না করিয়াও রঙ্গমঞ্চে কবি-মর্য্যাদা সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিতে সমর্থ ছিলেন তাহা নহে, প্রয়োজন হইলে অনুরূপ ছন্দের কবিতা অনায়াসে তিনি নাটকে প্রয়োগ করিতে পারিতেন। তবে গিরিশচন্দ্রের বৈশিষ্ট্যই হইল তাঁহার নবপ্রবর্ত্তিত অপূর্ব্ব ছন্দে, যে ছন্দে

তিনি নব নব ভাবের নূতন নূতন নাটক রচনা করিয়া মাতৃ-ভাষাকে নূতন সাজে সজ্জিত করিয়াছেন—যে ছন্দের প্রয়োগে ভাব গভীরতা প্রাপ্ত হইয়া, ভাষা স্বচ্ছন্দ গতি লাভ করিয়া উভয়েই বাঙ্গালা ভাষাকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছে। বস্তুতঃ এই গৈরিশী ছন্দ বাঙ্গালা ভাষার এক পরম সম্পদ্।

সেক্সপীয়র ও মিল্টনের ন্যায় মধুসূদন এবং গিরিশচন্দ্রও বাঙ্গালা ভাষায় অপূর্ব্ব মৌলিক ছন্দের স্রষ্টা। যতদিন বাঙ্গালা ভাষা জীবিত থাকিবে, ততদিন গৈরিশী ছন্দের বিজয়-বৈজয়ন্তী সগৌরবে উড্ডীয়মান থাকিয়া গিরিশচন্দ্রের অমরকীর্ত্তি ঘোষণা করিবে।

বিবিধ বিষয়ে

ষষ্ঠ অধ্যায়

গিরিশচন্দ্র কয়েকখানি গীতিনাট্যও রচনা করিয়াছিলেন। আবুহোসেন, মোহিনীপ্রতিমা, মায়াতরু, আলাদিন, স্বপ্নের ফুল, য্যায়সা কা ত্যায়সা প্রভৃতি তাঁহার প্রসিদ্ধ গীতিনাট্য। আবুহোসেনের duetই পরে "আলিবাবা"য় পূর্ণবিকশিত হইয়া দর্শকগণের মনোরঞ্জন করিয়াছে। "মলিনা-বিকাশে"র তরলা ও বিলাসের ডুয়েট্ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে দাই-মস্থুরে ; আর দাই-মস্থুরের ডুয়েট পরিপূর্ণরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে আবদালা-মর্জ্জিনায়। 'আলিবাবা'র অনেকগুলি গান গিরিশচন্দ্রের রচিত।

'স্বপ্নের ফুল' প্রভৃতিতে উচ্চতত্ত্ব প্রকটিত হইয়াছে। মোহের কাঁটা প্রেমের কাঁটা দিয়া গেল।

'সপ্তমীতে বিসর্জ্জন', 'বড় দিনের বক্‌শিস্', 'সভ্যতার পাণ্ডা' প্রভৃতি সুন্দর পঞ্চরং। অতুলকৃষ্ণ মিত্র গীতিনাট্যে সমধিক প্রসিদ্ধ। তবে গিরিশচন্দ্রের 'পারস্যপ্রসূন'ও খুব জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। 'মণিহরণ' কোনও এক রাত্রিতে প্রফুল্ল অভিনীত হইবার সময় রচিত হয়।

গিরিশচন্দ্র কয়েকখানি প্রহসনও লিখিয়াছেন। তাহাতে ব্যক্তিগত আক্রমণ অপেক্ষা সামাজিক রীতি-নীতির প্রতিই বেশী কটাক্ষপাত করা হইয়াছে। যদিও মাইকেলের তুইখানি প্রহসন, দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী' এবং অমৃতলাল বসুর অদ্ভুত প্রহসনগুলির সহিত তুলনা করিলে গিরিশচন্দ্রের প্রহসনগুলিকে

উচ্চতর স্থান দেওয়া যায় না, তথাপি তাঁহার "বেল্লিক বাজার" ও 'আয়না' এই দুইখানি যে উচ্চশ্রেণীর প্রহসন তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার প্রহসনে কোন ব্যক্তিগত আক্রমণ নাই, বিক্ষোভ সমাজের গ্লানি লইয়া। প্রহসন-রচনায় শিষ্যগণ-কর্তৃক এই আদর্শ রক্ষিত না হওয়ায় তিনি খুবই ক্ষুণ্ণ ছিলেন।

উপন্যাস ও গল্প লেখাতেও গিরিশচন্দ্র সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার গল্পগুলি এবং "চন্দ্রা" উপন্যাস অতি উচ্চশ্রেণীর কথা-সাহিত্য। সাহিত্য-হিসাবে ইহাদের স্থান খুব উচ্চে।

সমস্ত নাট্য-সাহিত্য পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় জগদ্বিখ্যাত সেক্সপীয়র বিয়োগান্ত নাটক লিখিতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন, আর মোলিয়ার ছিলেন মিলনান্তক নাটক রচনায়। কিন্তু কি বিয়োগান্ত কি মিলনান্তক—উভয় শ্রেণীর নাটক-রচনাতেই গিরিশচন্দ্রের বিশেষ দক্ষতা ছিল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে পৃথিবীর সমস্ত নাট্যকারগণের মধ্যে গিরিশচন্দ্রের উপর সেক্সপীয়রের প্রভাবই সমধিকরূপে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু তথাপি নাটক-রচনায় গিরিশচন্দ্রের যে অসাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই—তাঁহার ভাব, ভাষা ও বিষয় সমস্তই সম্পূর্ণ তাঁহার নিজস্ব। এমন কি গিরিশচন্দ্র সেক্সপীয়রের ম্যাক্‌বেথের ন্যায় একখানি শ্রেষ্ঠ বিয়োগান্ত ঐতিহাসিক নাটকের যে অনুবাদ করিয়াছেন তাহাতেও বৈশিষ্ট্য এমন ভাবে রক্ষিত হইয়াছে যে তিনি যদি নাটকখানিকে ম্যাক্‌বেথ নামে প্রচারিত না করিতেন এবং নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের নাম কাশ্মীর, পঞ্চনদ কিংবা রাজপুতনার লোকের নাম দিতেন তাহা হইলে কেহ বুঝিতেই পারিতেন না যে উহা সেক্সপীয়রের গ্রন্থ। স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছিলেন যে, 'উইচের' অনুবাদ

হওয়া অসম্ভব। কিন্তু পরে গিরিশচন্দ্রের অনুবাদ দেখিয়া তিনি স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন। এন্. এন্. ঘোষ বলিতেন, "Girish's translation has even surpassed the French rendering of the drama." স্যর গুরুদাস, স্যর চন্দ্রমাধব ও স্যর কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত বলিয়াছিলেন, "The translation is quite worthy of the original." এখানে দুই-একটি স্থল উল্লেখ করিয়া গিরিশচন্দ্রের অপূর্ব্ব অনুবাদ-কৌশলের নমুনা পাঠকগণকে উপহার দিব।

ম্যাক্‌বেথ নাটকের 'উইচ' তিন জনের একজন অপর দুই জনকে জিজ্ঞাসা করিতেছে—

When shall we three meet again—
In thunder, lightning or in rain ?

পূর্ব্বে ইহার অনুবাদ হইয়াছিল—

আবার মিলিব বল কোথা তিন জনে,—
বজ্রধ্বনি, দামিনী বা বারিবরিষণে ?

কিন্তু গিরিশচন্দ্র উহার অনুবাদ করিলেন—

দিদি লো, বল্‌না আবার
মিল্‌ব কবে তিন বোনে ?
যখন ঝরবে মেঘা ঝুপুর ঝুপুর
চক্ চকাচক্ হান্‌বে চিকুর
কড়্ কড়াকড় কড়াৎ কড়াৎ
ডাক্‌বে যখন ঝন্‌ঝনে ?

1. Where hast thou been sister ?
2. Killing swine !
3. Sister, where thou ?

1. A sailor's wife had chestnuts in her lap,
And munch'd, and munch'd, and munch'd.
'Give me,' quoth I:
'Aroint thee witch!' the rump-fed ronyon cries.
Her husband's to Aleppo gone, master o' the Tiger:
But in a sieve I'll thither sail,
And, like a rat without a tail,
I'll do, I'll do, I'll do.

গিরিশচন্দ্র ইহার অনুবাদ করিয়াছেন—

১ম—বোন্, কোথায় ছিলি ব'সে?
২য়—কচি কচি শোরের ছানা চিবুচ্ছিলেম ক'সে।
৩য়—তুই কোথায় ছিলি বোন্?
১ম—শোন্, বলি তবে শোন্,—
এলো চুলে মালার মেয়ে, ব'সে উদোম গায়,
ভোর কোঁচড়ে ছেঁচা বাদাম, চাকুম চাকুম খায়;
চাইতে গেলুম একটি মুঠো, পাড়াকুঁদুলি মাগী,—
নাক্‌টা নেড়ে দিলে তেড়ে, ব'ল্লে "দূর হ মাগী!"
তার ভাতার গ্যাছে বিদেশ ভুঁয়ে, নৌকা টেনে মরে,
সেইখানে তার কাছে যাব, চালুনীটা ধ'রে;
হয়ে ইঁদুর বেঁড়ে, নৌকা দেবো ফেঁড়ে,
আমি দেখ্‌ব তারে, দেখ্‌ব তারে, দেখ্‌ব।

'ম্যাক্‌বেথ' হইতে আরও একটি স্থান এখানে উদ্ধৃত করিয়া গিরিশচন্দ্রের কৃত অনুবাদ নিম্নে দেওয়া গেল—

Macbeth—Methought I heard a voice cry, 'Sleep no more!

Macbeth does murder sleep;' the innocent
sleep,
Sleep that knits up the ravell'd sleave of
care;
The death of each day's life, sore labour's
bath,
Balm of hurt minds, great Nature's second
course,
Chief nourisher in life's feast,—

Lady M.—What do you mean ?

Macb.—Still it cried, 'Sleep no more!' to all
the house :
'Glamis has murder'd sleep, and therefore
Cawdor
Shall sleep no more,—Macbeth shall sleep
no more!'

গিরিশচন্দ্রের অনুবাদ—

ম্যাক্‌বেথ।— যেন করিনু শ্রবণ, 'ঘুমাওনা আর!
হত্যাকারী নিদ্রা করে নাশ,'
নিদ্রা অবিরোধী—
চিন্তায় বিক্ষিপ্ত মন সংযত যাহাতে,
শান্তিপ্রদায়ক, দিনগত শ্রম-বিনাশক,
ক্ষত মনে মহৌষধি,
প্রকৃতির দ্বিতীয় প্রবাহ,
জীবনের ক্ষয় নিদ্রা করে সংপূরণ।

লেডি ম্যাক্‌বেথ।—একি ভাব তব?

ম্যাকবেথ।— কহিল আবার—
'ঘুমাওনা আর!' নিদ্রাগত গৃহবাসিগণে;
'গ্লমিসের অধিপতি নিদ্রা করে নাশ;
কদর না ঘুমাইবে আর;
ম্যাক্‌বেথ না ঘুমাইবে আর।'

অধিক উদাহরণ নিষ্প্রয়োজন। দেখুন, এই রত্ন আমাদের দেশেই আছে। ভাণ্ডারে বিবিধ অমূল্য রত্ন থাকিলেও আমরা সেগুলিকে উপেক্ষার চক্ষে দেখিতেছি, তাচ্ছিল্য করিতেছি। তবে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বাণী একদিন সফল হইবেই হইবে— একদিন পৃথিবীর সমস্ত সভ্যজাতিই ভারতের ধর্ম্ম, ভারতের দর্শন, সাহিত্য, কাব্য ও নাটকের আদর করিবেই করিবে, তখনই গিরিশচন্দ্র তাঁহার স্বরূপ মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইবেন।

প্রবন্ধ-রচনায়ও গিরিশের স্থান অত্যন্ত উচ্চ। শান্তি, কর্ম্ম, কাব্য ও দৃশ্য, অভিনয় ও অভিনেতা, সমাজসংস্কার, স্ত্রীশিক্ষা, সম্পাদক, পৌরাণিক নাটক, ধ্রুবতারা, ধর্ম্ম, বিশ্বাস, সাধন গুরু, রামদাদা ও শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রভৃতি প্রবন্ধে ধর্ম্ম, সমাজ ও সাহিত্য-সম্বন্ধে অত্যন্ত দুরূহ এবং গুরুতর বিষয় অতি সহজ কথায় গিরিশচন্দ্র বুঝাইয়াছেন।

'ষ্টাইল' মনের প্রতিবিম্ব। কি পদ্যে কি গদ্যে এই সহজ ভাষা ও ভাবই গিরিশ-রচনার বিশেষত্ব এবং নাটকের এই নূতন 'ষ্টাইল' বাঙ্গালা সাহিত্যের অপূর্ব্ব সম্পদ্।

দ্বিতীয় ভাগ

বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চে গিরিশের স্থান

রঙ্গমঞ্চ-গঠনে

প্রথম অধ্যায়

১। সধবার একাদশী ও পূর্ব্ব ইতিহাস

চব্বিশ বৎসর বয়সে, গিরিশ প্রথম অভিনয় করেন ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে। বাগ্‌বাজার মুখার্জ্জিপাড়া লেনে প্রাণকৃষ্ণ হালদারের বাড়ীতে 'সধবার একাদশী' নাটকে নিমচাঁদের ভূমিকায় তাঁহার প্রথম আবির্ভাব। অভিনয় এত সুন্দর হয় যে প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়াই তিনি দেখিলেন সমগ্র বাগ্‌বাজার-শ্যামবাজার পল্লী তাঁহার যশোগানে মুখরিত—

"নিমচাঁদ ভূমিকায় তুমি সুধীজন
নিদ্রাশেষে যবে তুমি হ'লে জাগরিত
দেখিলা জয়ের ধ্বনি কাঁপায়ে পবন
গৃহপথ রঙ্গমঞ্চ করে মুখরিত।" *

"সধবার একাদশী" দীনবন্ধু মিত্রের অপূর্ব্ব নাট্যগ্রন্থ। গিরিশ যেন তাহার জীবন্ত নিমচাঁদ। এই নিমচাঁদ লইয়াই বাঙ্গালার সাধারণ (Public Stage) থিয়েটারের জন্ম। আর গিরিশ উহার কেবল স্রষ্টাই ছিলেন না, প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া উহার পুষ্টিসাধনও করিয়াছিলেন।

* দীনবন্ধু মিত্রের সুযোগ্য পুত্র ৺ললিতকুমার মিত্রের রচিত কবিতা।

ইহার পূর্ব্বেও বাঙ্গালায় অনেক থিয়েটার হইয়াছে, আর এখনও লোকে তাহার যশ ঘোষণা করে। সর্ব্বপ্রথমে "কুলীন কুলসর্ব্বস্ব" লইয়া বাঙ্গালা থিয়েটারের সূচনা বলা যাইতে পারে (১৮৫৬)। তারপরে ছাতুবাবুর বাড়ীর "শকুন্তলা" (১৮৫৭), কালীপ্রসন্ন সিংহের বিদ্যোৎসাহিনী থিয়েটারে অভিনীত 'বেণীসংহার,' 'বিক্রমোর্ব্বশী' ও 'সাবিত্রী-সত্যবান্' (১৮৫৭-৫৮), বেলগাছিয়া থিয়েটারের 'রত্নাবলী' ও 'শর্ম্মিষ্ঠা' (১৮৫৮-৫৯) প্রভৃতি নাটকের অভিনয় নাট্যশালার ইতিহাসের প্রসিদ্ধ ঘটনা। কিন্তু এই সমস্তই অনুষ্ঠিত হয় কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি এবং তাঁহাদের বন্ধু-বান্ধবগণের মনোরঞ্জনের জন্য; সাধারণের প্রবেশাধিকার ঐগুলিতে ছিল না। মধ্যবিত্ত রামনারায়ণ ও মধুসূদনের রচনা লইয়াই ধনিগৃহে আমোদের আয়োজন হইত, কিন্তু সেখানে মধ্যবিত্ত দর্শকের নাট্যামোদ চরিতার্থ করিবার সুযোগ মিলিত না! তাহাদের নাট্যামোদ চরিতার্থ হইবার কোন ব্যবস্থাই ছিল না।

অতঃপর পাথুরিয়াঘাটা রাজবাড়ীতে ধারাবাহিকভাবে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ হইতে "বিদ্যাসুন্দর" ও অন্যান্য নাটকের অভিনয় চলিতে লাগিল। পরবৎসরেই জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে "নব-নাটক" এবং শোভাবাজার রাজবাড়ীতে "কৃষ্ণকুমারী" নাটক মহাসমারোহে অভিনীত হয়, কিন্তু ইহাতেও সাধারণের কোনও সুবিধা হইল না। বিশেষতঃ শেষোক্ত দুইটি থিয়েটারই অল্প-কাল স্থায়ী হয়। পাথুরিয়াঘাটা রাজবাড়ীর থিয়েটার প্রায় পঁচিশ বৎসর কাল পর্য্যন্ত রাজার বন্ধুবান্ধবগণ ও সময় সময় বিশিষ্ট ইংরাজ দর্শকের চিত্তবিনোদন করিত। কিন্তু সাধারণ গৃহস্থের

এই সমস্ত প্রাসাদোপম বাড়ী হইতে টিকিট সংগ্রহ করা বড়ই দুঃসাধ্য ছিল, কখনও কখনও লাঞ্ছনা, তিরস্কার, এমন কি দরোয়ানের গলাধাক্কা পর্য্যন্ত হজম করিতে হইত। তৎকালীন দর্শকগণ অভিনয়ের অজস্র প্রশংসা করিতেন, কতকটা নিজেদের সৌভাগ্য প্রচার করিবার জন্য, কতকটা বা পাছে লোকে অরসজ্ঞ মনে করে—এই ভয়ে। গিরিশচন্দ্রের জাতীয় মর্য্যাদা ও আত্মসম্মানে ইহাতে খুব আঘাত লাগে। তিনি পাড়ার লোকগণকে সম্বোধন করিয়া বলেন, "এক বৎসর মধ্যে তোমাদের থিয়েটার করিয়া দেখাইব।" এক বৎসরের মধ্যেই তিনি নিমচাঁদের ভূমিকায় আবির্ভূত হন।

যে সময়ে থিয়েটারের প্রথম প্রচলন হয় (১৮৫৬-৫৭) তখন জনসাধারণের মধ্যে কবি, যাত্রা, পাঁচালী, হাফ্ আখ্ড়াই ও কবুতরের লড়াই প্রভৃতিই সাধারণের মধ্যে প্রধান আমোদ বলিয়া পরিগণিত হইত। দাশরথি রায়, ঈশ্বর গুপ্ত তখন কবি, লোক তখন কবিতাপ্রিয়। হাফ্ আখড়াই, কবি ও পাঁচালীতে উচ্চস্তরের অনেক জিনিষ থাকিলেও শ্লেষ ও গালাগালিও খুব চলিত। আর তখনকার সমাজের অবস্থাই এরূপ ছিল যে সকলে আগ্রহের সহিত এই সমস্ত বিদ্রূপ ও গালাগালি শুনিত ও উপভোগ করিত। তখনকার যাত্রায় কথাবার্ত্তা বড় একটা ছিল না; কেবল গানই চলিত, সামান্য দুই একটি কথাবার্ত্তা হইলেও, "তবে প্রকাশ ক'রে বল দেখি," বলিয়া গান আরম্ভ হইত। সেই উচ্চাঙ্গ গানের আদর খুবই থাকিলেও, বিশেষ আদর ছিল সঙের। সঙ গালাগালিও কম দিত না। লোকে ঐ গালাগালি শুনিতে ছুটিয়া আসিত। তখনকার দিনে এইরূপ গালাগালিরই এত অধিক

আদর ছিল যে সম্পাদকে সম্পাদকে পর্য্যন্ত অকথ্য ভাষায় গালাগালি ও কবির লড়াই চলিত। যে সংবাদপত্রে যত বেশী শ্লেষোক্তি ও গালাগালি থাকিত, তাহার তত আদর হইত। মোট কথা, তখন কবির লড়াই-এর যুগই প্রবলবেগে চলিয়াছিল।

বাঙ্গালায় তখন খ্রীষ্টান মিশনরীগণের অসীম প্রভুত্ব। তাহাদের শিক্ষাদীক্ষার প্রভাব সমাজকে নানাভাবে আলোড়িত করিয়া তুলিত। সমাজের বক্ষের উপরে একটা প্রবল ভাবধারা প্রবাহিত হইয়াছিল।

ক্রমে কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ এইরূপ অকথ্য গালাগালি শুনিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিলেন। গালাগালি শুনিবার রুচিকে 'কুরুচি' বলিয়া তীব্র নিন্দা করিতে লাগিলেন এবং উহার প্রতিরোধ করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। ধনিগৃহে পূর্ব্বোক্ত নাট্য-কলার প্রসারও এই সংশোধিত মনোভাবের ফল। সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ ক্রমে নাটকাভিনয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। একদিন নবীনকৃষ্ণ বসু (১৮৩২-৩৫), প্রসন্নকুমার ঠাকুর (১৮৩১) প্রভৃতি মহানুভব ব্যক্তিগণের উৎসাহ ও ঔদার্য্যে যে শুভ আয়োজনের সূচনা হইয়াছিল, এখন তাহা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কালীপ্রসন্ন সিংহ, কেশবচন্দ্র সেন, রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, গৌরদাস বসাক, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি উন্নত রুচিসম্পন্ন সঙ্গতিশালী ব্যক্তিগণের সার্থক চেষ্টায় সমাজের মঙ্গলদায়ক হইল। ধীরে ধীরে নাট্যকলা সকলের প্রাণে প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল। বস্তুতঃ রঙ্গ-মঞ্চের ইতিহাসে প্রাসাদে-অভিনীত থিয়েটার এবং অভিনয়ও কম উল্লেখযোগ্য নয়।

তবে থিয়েটারের প্রসারে, অন্য দিকে ক্ষতিসাধনও যে কম হইল তাহা নয়। নবপ্রবর্ত্তিত পাশ্চাত্ত্য প্রথায় অভিনয়সৌকর্য্যে, লোকের মনে যাত্রা শুনিবার স্পৃহা হ্রাস পাইতে লাগিল। যাহা রহিল, তাহা নাটকের অনুকরণে অভিনীত নূতন যাত্রার প্রতি। ইহাতে অশ্লীল ভাঁড়ামি লোপ পাইল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বদন অধিকারী, গোবিন্দ অধিকারী প্রভৃতি যাত্রা-ওয়ালাগণের মধুর সঙ্গীতের রসপ্রবাহও শুষ্ক হইয়া গেল।

এ দিকে কিন্তু অশ্লীলতা ও ভাঁড়ামি হইতে ধনি-সম্প্রদায়ের থিয়েটারও একেবারে মুক্ত হইতে পারিল না। বেলগাছিয়ার বিদূষক কেশবচন্দ্র গাঙ্গুলীর গম্ভীর রহস্যালাপে লোকে নির্দ্দোষ আমোদ উপভোগ করিত, জোড়াসাঁকোর গবেশ অক্ষয় মজুমদারের চটুলহাস্যে দর্শক হাসিয়া লুটোপুটি খাইত বটে, কিন্তু থিয়েটারে কথঞ্চিৎ লঘুতা প্রবেশ করিল, আর ক্রমে কবির লড়াইও মাথাচাড়া দিয়া উঠিল। পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর বাড়ীতে প্রিয়মাধব বসু মল্লিকের "বুঝ্‌লে কিনা?" নামে একখানি প্রহসন অভিনীত হয় ১৮৬৬ সালের ডিসেম্বরে। এক বৎসরের মধ্যেই ইহার পাল্টা জবাবে "কিছু কিছু বুঝি" নামক একখানি কদর্য্য প্রহসনের (১৮৬৭, ২রা নভেম্বর) অভিনয় হইল জোড়াসাঁকোর হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে। হেমেন্দ্রনাথ অভিজাত বংশের সন্তান। এক দিকে তিনি যেমন পাথুরিয়াঘাটার শ্যামলাল ঠাকুরের দৌহিত্র, অপর দিকে তিনি আবার মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিতীয়া কন্যাকে বিবাহ করেন। কিন্তু সম্ভ্রান্ত পরিবারের হইয়াও এইরূপ নিকৃষ্ট প্রহসন লিখিবার জন্য কবি ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়কে নিয়োজিত করিতে তিনি দ্বিধাবোধ করেন নাই!

"বুঝ্‌লে কিনা" প্রহসনে একটি সঙ্গীতের এইরূপ পদ ছিল :—

ওরে নেশাতে ঢুলু ঢুলু ক'রে দুনয়ন
কোথায় রহিল আমার সে বিধুবদন।

ইহার বিদ্রূপ করিয়া অবিকল এই সুরে ও এই ভাবে "কিছু কিছু বুঝিতে" নিম্নলিখিত গানটি সখীদের মুখে সংযোজিত হয়—

ওরে নেশাতে ঢুলু ঢুলু ক'রে দুনয়ন
রাবণ মারিল রামে, কাঁদে দুর্য্যোধন।
না বুঝে করেছি নেশা
কোথায় আমার রৈল পেশা
এলোকেশে এলো কেশা করিবারে রণ;
দময়ন্তী ভয়ে কেঁচো
পদীরে পেয়েছে পেঁচো
বিছে হ'ল গর্ভবতী ঠাকুরের লিখন;
শিবের ঘরে কেষ্টার মেয়ে
পেঁচোর মত রৈল চেয়ে
শকুনি ঢাকা গঙ্গায় নেয়ে ক'রলে পলায়ন।
খেয়েছি অসহ্য মদ
দিয়েছি কার লেজে পদ
এতো নহে কম বিপদ্‌, কাম্‌ড়ে না এখন
একি হ'ল দাঁতের জ্বালা
লোকালয়ে বিষম জ্বালা
কাণেতে করিল কালা বিকট বদন।

গানটিতে তখনকার সমসাময়িক ও পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েকটি

থিয়েটারের উল্লেখ * থাকিলেও উহা অত্যন্ত কুরুচিদুষ্ট; বিশেষতঃ ইহাতে পাথুরিয়াঘাটার মহারাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ন্যায় একজন বিখ্যাত সঙ্গীতবিশারদের প্রতি ব্যক্তিগত ভাবে তাঁহার দাঁতের যন্ত্রণার অনর্থক বিদ্রূপ-প্রকাশ অত্যন্ত অশোভন হইয়াছে।

প্রিয়বাবুও অনেকগুলি পাল্টা গান রচনা করিয়াছিলেন। গানগুলি কবির লড়াইএর অনুরূপ; যেমন—

(১) ওরে হায় রে দেশের থিয়েটার!
আগে পদ্মফুলের মত তোমার শোভা ছিল চমৎকার;
কি ছিলে কি হ'লে তুমি, মনে ভাবি তাই
প'ড়ে হাড়হাব্বাতে ভুলোর হাতে
গেলে তুমি ছারখার।

(২) ভ্যালা ভ্যালা ভ্যালা মোর বাপরে,
রাজার বাড়ী বুঝলে কিনা
ও তার বুঝিস্ কাঁচকলা, ও তোর যায় না গুণ বলা,
কিছু কিছু বুঝি ব'লে লাগলো তোর হাঁপ রে!

তখনকার প্রচলিত আর একটি গান এতই রুচি-বহির্ভূত যে তৎকালিক সময়ের কিঞ্চিৎ আভাস আছে বলিয়াই দুই-একটি পদ উল্লেখ করিলাম।

আমি থিয়েটার হিষ্ট্রি;
গ্রীন চশমা নাকে দিয়া গো
দেখি গ্রীনরুমের মিষ্ট্রি!

* *Vide* Indian Stage, II, by the author, p. 144.

রাঙ্গা রাঙ্গা ছেলেগুলি সখী সাজে সব
করে নারীর মতন রব
তাদের আকার দেখলে আক্কেল গুড়ুম
ইচ্ছে হয় কিস্ করি............।

এই সমস্ত কদর্য্যাভিনয়ের প্রকৃষ্ট প্রত্যুত্তরই "সধবার একাদশীর" অপূর্ব্ব অভিনয়। ধনিগৃহের চাকচক্যময় পোষাক-পরিচ্ছদে চক্ষু ঝলসিত না হইলেও, অভিনয় দেখিয়া মধ্যবিত্ত গৃহস্থ চক্ষু সার্থক করিল, আর বলিতে লাগিল "হ্যাঁ, নির্দ্দোষ আমোদ বটে।" এই নির্দ্দোষ ও উচ্চাঙ্গ অভিনয়ের সর্ব্বত্রই ভূয়সী প্রশংসা হইলেও, এখানে সাধারণের অবগতির জন্য আমরা "বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের" স্তম্ভ-স্বরূপ মাননীয় বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের যৌবন-স্মৃতিরই লিপিটুকু মাত্র উল্লেখ করিব। সারদাবাবু সেবার এম্. এ. পরীক্ষা দিয়াছিলেন। উত্তরকালে "বঙ্গদর্শনে" (অগ্রহায়ণ, ১৩১২) দীনবন্ধু মিত্র শীর্ষক প্রবন্ধে সেই অভিনয়-স্মৃতি তিনি নিম্নলিখিতভাবে লিপিবদ্ধ করেন—

"কত ইংরাজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত নাটক পড়িয়াছি। কিছু কিছু মনে আছে, অনেক কথাই ভুলিয়া গিয়াছি। ক্রমে বয়সের সঙ্গে ভুলিয়া যাইবও। কিন্তু সে রাত্রির গিরিশবাবুর নিমচাঁদের ভূমিকা কখনও ভুলিব না। সে দিন হইতেই গিরিশচন্দ্রকে আমি শ্রদ্ধা করিতে আরম্ভ করি। আর এখনও তিনি আমার জ্যেষ্ঠ সহোদরের ন্যায় পূজ্য।"

আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক প্রবীণ সমালোচক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি, "আজও

গিরিশদাদার নিমচাঁদের ভূমিকার কথা মনে পড়ে। মনে হইয়াছিল যেন ইনি সত্যই নিমচাঁদ। ইনি যে আমার 'গিরিশদাদা,' তাহা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। এ পর্য্যন্ত সেরূপ অভিনয় আর কখনও দেখি নাই।"

'নিমচাঁদ' লইয়া গিরিশচন্দ্র যে ক্ষুদ্র সম্প্রদায় গঠন করেন, ক্রমে তাহাই মহীরুহের ন্যায় বিশাল ও যশস্বী হইয়া উঠিল, আব এই দিন হইতেই বঙ্গ-নটগুরুর অপ্রতিদ্বন্দ্বী আসন সুপ্রতিষ্ঠ হইয়া রহিল—

"মদে মত্ত টলে
নিমে দত্ত রঙ্গস্থলে ;
প্রথমে দেখিল বঙ্গ
নবনটগুরু তার—"

এই সম্প্রদায়ের গিরিশ যেমন স্রষ্টা, গুরু ও নট, দীনবন্ধুও সেইরূপ অপূর্ব্ব নাট্যকার। ধনি-সম্প্রদায়ের উপচার সংগ্রহ করিয়াছিলেন মধ্যবিত্ত রামনারায়ণ ও মধুসূদন, আর মধ্যবিত্তের আশ্রয় হইলেন দীনবন্ধু মিত্র। দীনের জন্য দীন গিরিশ দীনভাবে থিয়েটার স্থাপন করিলেন। আর রসদ জোগাইলেন সার্থকনামা দীনের আশ্রয় দীনবন্ধু। গিরিশ দীনবন্ধুর ঋণ জীবনে কখনও বিস্মৃত হন নাই। বার্দ্ধক্যে তিনি একটি মনোজ্ঞ কুসুমে দেবপূজা* করিয়াছিলেন।

বস্তুতঃ দীনবন্ধুর নিমচাঁদ লইয়াই অমৃতের রসভাণ্ড-হস্তে গিরিশ ভরত ঋষির ন্যায় রঙ্গমঞ্চাধিপের আসন গ্রহণ করিলেন।

* 'শাস্তি কি শান্তি'র উপহার।

কেবল অভিনেতৃরূপেই গিরিশের অখণ্ড যশোরাশি চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইল না। ঐ দিন হইতেই বাঙ্গালীর জাতীয় নাট্যশালারও প্রতিষ্ঠা হইল। গিরিশের ন্যায় খাঁটি বাঙ্গালী ভিন্ন সমদরদ লইয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্য কাহারও দ্বারা এই সৃষ্টি-রচনা সম্ভব হইত না। দীনবন্ধুর নাটক ভিন্ন গিরিশের আয়োজনও ব্যর্থ হইত; আর নিমচাঁদের ভূমিকায় অসাধারণ সাফল্য-ব্যতিরেকে নাট্যশালার প্রতি সকলের অনুরাগও স্থায়ী হইত না। তাই বলিতেছিলাম "সধবার একাদশী"ই বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চ-ইতিহাসের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ অধ্যায়। আর ঐ দিন হইতেই জাতীয় নাট্যশালার, সাধারণের আমোদ নিকেতনের এবং বাঙ্গালীর জাতীয় মঞ্চের দৃঢ়ভিত্তি প্রোথিত হইল।

এই "সধবার একাদশী"র অন্ততঃ সাত বার অভিনয় হইবার পর দীনবন্ধুরই "লীলাবতী" তাঁহারই অনুরোধে অভিনীত হয় ১৮৭১ সালের গ্রীষ্মকালে মে-জুন মাসে। "লীলাবতী"র সময় গিরিশচন্দ্র তাঁহার শ্যালক ব্রজেন্দ্রনাথ দেব-নির্ম্মিত পারিবারিক ষ্টেজটী সম্প্রদায়ের জন্য আনিয়া ইহার স্থায়িত্ব বর্দ্ধন করেন। থিয়েটারের নাম হইল "ন্যাশন্যাল থিয়েটার।" আর গিরিশই 'হিরো' ললিতের ভূমিকায় অভিনয় করেন।

ললিতের ভূমিকা এত সুন্দর হইয়াছিল যে দীনবন্ধু বলেন "আমার কবিতা যে এমন সুন্দরভাবে পড়া যায় তা' আমি জানতেম না।" ঠিক এই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র ও অক্ষয় সরকার মহাশয় চুঁচুড়ায় একটি থিয়েটার করিয়া "লীলাবতী" অভিনয় করেন। তুলনায় গিরিশ-সম্প্রদায়ের অভিনয়ই অধিক প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। দীনবন্ধু বলিলেন, "এবার চিঠি লিখ্‌বো, দুয়ো বঙ্কিম।"

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ধনি-সম্প্রদায়ের থিয়েটারের উল্লেখ করি নাই। পাথুরিয়াঘাটার থিয়েটার তখন পূর্ণোদ্যমে চলিয়াছে। কিন্তু স্বর্গীয় কানাইলাল দে মহাশয় "লীলাবতী"র অভিনয়-সাফল্যে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে গিরিশের থিয়েটারের সহিত তুলনা করিয়া বলেন, "আপনাদের থিয়েটার সোণার খাঁচায় দাঁড়কাক পোষা।"

গিরিশ এবার "নীলদর্পণ" রিহার্সাল আরম্ভ করিলেন।

২। পাব্‌লিক থিয়েটারে 'ভীমসিংহ'

ক্রমে সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিয়াছে, ন্যাশনেল থিয়েটারে সাধারণের প্রবেশাধিকারের সুবিধা প্রদান করিতে টিকেট বেচিবার প্রস্তাব হইল, সকলেই উদ্যোগী, কিন্তু গিরিশচন্দ্র বিরোধী হইলেন। তিনি বলিলেন, "এখনও সময় হয় নাই, টিকেট বেচিয়া এই সব কদর্য্য সিন ও পোষাক দেখাইলে লোকে কি বলিবে। ন্যাশনেল বলিতে সমগ্র জাতি বুঝায়, এমনি যা করিতেছ কর, কিন্তু এই সব দেখিলে ভিন্ন দেশের লোকের বাঙ্গালা জাতির উপর আরও অশ্রদ্ধা হইবে। একেইতো আমাদের কিছু দেখিলেই তাহারা মুখ বাঁকায়, কিন্তু ইচ্ছা করিয়া সেই সুযোগ আরও কেন আমরা প্রদান করি।"

কিন্তু কেহ শুনিল না; অগত্যা গিরিশচন্দ্রই দল ছাড়িলেন। নীলদর্পণ অভিনয় হইল, ১৮৭২, ৭ই ডিসেম্বর; লোকে প্রশংসাও করিল, কিন্তু দীনবন্ধু আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "গিরিশের অভাবে থিয়েটারের গাম্ভীর্য্যের গৌরব ম্লান হইয়াছে।" গিরিশ একটি যাত্রা-সম্প্রদায় খুলিলেন এবং "লুপ্ত বেণী বহিছে তেরো

ধার” গানটি রচনা করিয়া “জ্ঞান হয় বা দীনের গৌরব এত দিনে খসে” বলিয়া আক্ষেপ করিলেন।

এই গানটি শ্লেষাত্মক হইলেও অতি উচ্চাঙ্গের পরিচায়ক। ইহাতে বিন্দুমাত্র রুচি-বিকৃতি নাই, গালিবর্ষণ নাই, নিন্দা নাই। প্রতিদ্বন্দ্বী নেতা অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী মহাশয় বলিতেন—

“নাট্য-সম্প্রদায়ের সভাপতি হইতে গ্রন্থকর্ত্তা দীনবন্ধু নাম পর্য্যন্ত গানটী এমন কৌশলে গাঁথা যে শুনিলে গিরিশবাবুর কবিত্ব-শক্তি ও শব্দ-যোজনার ক্ষমতা প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না……ইহা লইয়া উভয় পক্ষে কোন শত্রুতা হয় নাই।” স্বর্গীয় অমৃতলাল বসুও বরাবর তাহাই বলিতেন। গিরিশের রচনায় প্রমাণিত হইল, মতভেদ হইলেই বিবাদ হয় না। নায়ক গিরিশের নেতৃত্বই তখন চলিয়াছিল, তাই ‘কবির লড়াইয়ের’ আর পুনরভিনয় হইল না।

ইতিমধ্যে সম্প্রদায় দীনবন্ধুর ‘জামাই বারিক’ ও ‘নবীন তপস্বিনী’ ও শিশিরকুমার ঘোষের ‘নয়শো রুপেয়া’ অভিনয় করিলেন এবং দুই মাসের মধ্যেই অর্দ্ধেন্দু প্রভৃতি সকলেই আবার গিরিশচন্দ্রকে মহাসমাদরে দলে নিয়া আসিলেন। দুইটি কারণে সম্প্রদায়ের গিরিশের সহায়তার আবশ্যক হয়। প্রথম, নাটক নাই, ‘কৃষ্ণকুমারী’ নাটক অভিনয় হইবে, কিন্তু ভীমসিংহের ভূমিকা গ্রহণ করিবার লোক নাই। দ্বিতীয়, টাকাকড়ি, সাজ-সরঞ্জাম প্রভৃতি লইয়া সম্প্রদায়ে গোল বাধিয়াছে, গিরিশের তত্ত্বাবধান আবশ্যক। তিনি ‘এমেচার’ [১] ভাবে আসিয়া ভীমসিংহের ভূমিকা গ্রহণ করেন। অভিনয়

১ গিরিশবাবু বলেন—“আমার নাম ‘এমেচিয়ার’ হিসাবে বিজ্ঞাপনে দিতে হইবে।” তাঁহারা নামের পিছনে ‘Distinguished amateur’ বলিয়া উল্লেখ করেন।

অতি চমৎকার হইলেও টাকা পয়সার গোল মিটিল না। এমন কি কেহ কেহ গিরিশের পূর্ব্ব মতভেদকে 'মনান্তর' নাম দিয়া বিরোধাগ্নিতে ঘৃতাহুতিই প্রদান করিলেন। সে বৎসর বর্ষাগম একটু আগে হওয়ায় সান্যাল-বাড়ীর থিয়েটার বন্ধ হয়।

এই সময় একটি সদনুষ্ঠান-উপলক্ষে চক্ষুর হাসপাতালে টাকা উঠাইবার জন্য ধর্ম্মদাস সুর গিরিশের সহায়তায় ন্যাশনেল থিয়েটার নামে 'নীলদর্পণের' অভিনয় করেন। ক্রমে অর্দ্ধেন্দু-বাবু প্রভৃতি "হিন্দু ন্যাশনেল" থিয়েটার নাম দিয়া ঢাকা চলিয়া যান, পরে ন্যাশনেলও উহার অনুবর্ত্তী হয়, কিন্তু গিরিশ যাইতে পারেন না। ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া উভয় সম্প্রদায়ই গৃহে ফিরিয়া আসে এবং সম্পদে বিভক্ত হইলেও বিপদ্ আবার তাহাদিগকে একীভূত করে। এই প্রকারে পুনর্মিলন সাধিত হয়।

ইতিমধ্যে ১৮৭৩ সালে দুইটি স্থায়ী রঙ্গশালার প্রতিষ্ঠা হয় —বেঙ্গল থিয়েটার, ১৬ই আগষ্ট এবং গ্রেট ন্যাশনেল থিয়েটার, ৩১শে ডিসেম্বর। ন্যাশনেল থিয়েটারের অভিনেতৃবর্গই ক্রমে গ্রেট ন্যাশনেলে অভিনয় করেন এবং ভুবনমোহন নিয়োগী উহার প্রতিষ্ঠা করেন। গিরিশ প্রথমে এই সম্প্রদায়ে ছিলেন না, কিন্তু যখন 'মৃণালিনী', 'কপালকুণ্ডলা' ও 'পঞ্চ রং' প্রভৃতি অভিনয় অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিল, তখন আবার তাঁহার আহ্বান হয়। না থাকিলেও সমস্ত পরামর্শের মধ্যেই তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব লক্ষিত হইল। এই ভাবে দুই বৎসর কোন রকমে চলে।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দটি থিয়েটারের পক্ষে বড় দুর্ব্বৎসর। বৎসর পড়িতে না পড়িতেই Ordinanceএর বলে 'গজদানন্দ' প্রহসন বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। নাট্যসম্প্রদায়ের মহারথগণ ধৃত হইয়া

বিচারার্থ প্রেরিত হন, এবং ভুবনমোহন ওয়ারেণ্টের ভয়ে কোথায় চলিয়া যান। অভিযোগ এই হয় যে, পরিচালক স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ দাসের 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' নাটকখানি অশ্লীলতা-দুষ্ট! বিচারে উপেন্দ্রবাবু এবং ম্যানেজার অমৃতলাল বসু মহাশয়ের একমাস করিয়া বিনাশ্রম কারাদণ্ড হয়, কিন্তু হাইকোর্টের আপীলে তাঁহারা মুক্তি লাভ করেন এবং নাটকখানি অশ্লীলতা দোষক্ষালিত হয় (১৮৭৬ মার্চ্চ)। মোকদ্দমা ও অপব্যয়িতায় ভুবনমোহনের অর্থ নিঃশেষিত হইয়া যায়।

৩। থিয়েটারে চাকুরীগ্রহণ ও অনন্য চিন্তা

এই বিপদের উপরে আবার অভিনয়-নিয়ন্ত্রণ আইন (Dramatic Performances Act) বিধিবদ্ধ হয়। ভুবনমোহন ত্রাসযুক্ত হন, উপেন্দ্রবাবু বিলাত চলিয়া যান, নগেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় থিয়েটার ছাড়িয়া দেন, অর্দ্ধেন্দুশেখর দেশভ্রমণে বহির্গত হন, অমৃতলাল বসু আন্দামান যাত্রা করেন, বিনোদিনী বেঙ্গল থিয়েটারে যোগদান করেন, খানসামাবেশে স্বামী বিলাত চলিয়া গেলে, সুকুমারী দত্তও বিষাদময় জীবন যাপন করিতে বাড়ী বসিয়া থাকেন এবং একে একে সমুজ্জ্বল নক্ষত্ররাজি খসিয়া পড়ায় থিয়েটার-মণ্ডল একেবারে নিষ্প্রভ হইয়া যায়। ন্যাশনেল থিয়েটারের এতবড় দুর্দ্দিন ইতিপূর্ব্বে আর কখনও হয় নাই।

অর্থ নাই, অভিনেতা নাই, নাটক নাই। নাট্যকার খুঁজিয়া বাহির করা শক্ত, উপন্যাস নিঃশেষিত, উপর্য্যুপরি বিজ্ঞাপন দেওয়া সত্বেও বাহির হইতে কোন নাটক আসিল না। ১৮৭৬-৭৭ সাল বঙ্গরঙ্গমঞ্চের তমসাচ্ছন্ন শ্রীহীন যুগ; ন্যাশনেল থিয়েটার বুঝি একেবারে বন্ধ হইয়া যায়।

কিন্তু বন্ধ হইল না। এই চরম দুর্দ্দিনে "সধবার একাদশীর" অধিনায়ক আর নীরব থাকিতে পারিলেন না, আবার তিনি নিমজ্জমান তরীর কর্ণধার হইলেন, কঙ্কালসার রঙ্গমঞ্চের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইল। প্রথমে তিনি জমিদার কেদার চৌধুরী এবং শ্যালক দ্বারকানাথ দেবের সহযোগিতায় নিজ নামে 'ন্যাশনেল' থিয়েটার লিজ লইয়া উহার পরিচালনা করিতে লাগিলেন। গিরিশচন্দ্র এখন একাধারে মঞ্চাধ্যক্ষ, শিক্ষক, অভিনেতা ও নাট্যকার। সুদীর্ঘ তিন যুগ ধরিয়া এই ভাবেই নাট্যকলার সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু জীবনে কখনও গিরিশ থিয়েটারের স্বত্বাধিকার গ্রহণ করেন নাই। কেন করেন নাই—ক্রমে তাহা বলিতেছি।

ন্যাশনেল থিয়েটারে গিরিশ প্রথমে মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ' কাব্য নাটকান্তরিত করিয়া অভিনয় করেন, এবং নিজেই রাম ও মেঘনাদ এই বিরুদ্ধ ভাবোদ্দীপক ভূমিকায় অপূর্ব্ব দক্ষতা প্রদর্শন করেন। অতঃপর 'পলাশীর যুদ্ধ' নাটকান্তরিত করিয়া তাহাতেও ক্লাইভের ভূমিকা গ্রহণ করেন; সে অভিনয়ও হইত অতুলনীয়। এইখানেই সুকণ্ঠ অভিনেতা অমৃতলাল মিত্র তাঁহার গুরু গিরিশচন্দ্রের সহিত সম্মিলিত হন। আর সঙ্গীত ও নৃত্য-বিশারদ রামতারণ সান্যালের সহযোগিতায় সম্প্রদায় বিশেষ পুষ্ট হইয়া উঠে। ইতিমধ্যে গিরিশের গীতিনাট্য 'আগমনী', 'অকালবোধন' ও 'দোললীলা' অভিনয়ের জন্য রচিত হয়। স্বাধীন রচনায় ইহাই তাঁহার প্রথম উদ্যম। ইহার পরে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' ও 'দুর্গেশনন্দিনী' নাটকান্তরিত করিয়া অভিনয় করেন। ইতিমধ্যে গ্রেটন্যাশনেল থিয়েটারের বাড়ী ভুবনমোহনের দেনার জন্য নীলামে উঠিলে, প্রতাপ

জহুরী নামে জনৈক মাড়ওয়াড়ী .৮৭৯ সালে উহার স্বত্ব ক্রয় করেন এবং থিয়েটার পরিচালনা করিতে মনস্থ করেন।

এই জহুরী খুব সুচতুর ও কর্ম্মকুশল অধিকারী ছিলেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন গিরিশচন্দ্র একেবারে খাঁটি সোণা, তিনি ব্যতীত রঙ্গালয় পরিচালনা করিবার যোগ্যতা অপর কাহারও ছিল না। নাটক-রচনা, মহলা-পরিচালনা, দক্ষ অভিনেতা অভিনেত্রীর শিক্ষাপ্রদান ও তত্ত্বাবধান, আয়ব্যয়ের হিসাব পরিদর্শন প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্যে ক্ষমতা ও ব্যক্তিত্ব-প্রভাবে সর্ব্বকর্ম্মে দক্ষতা একাধারে একমাত্র গিরিশচন্দ্রেরই ছিল এবং এই সব বিষয়ে তিনি অদ্বিতীয়। তাই গিরিশচন্দ্রকে তিনি একনিষ্ঠ সাধক হইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্র তখন পার্কার কোম্পানীর চাকুরীতে সুপ্রতিষ্ঠিত, মাসিক বেতন তখন তাঁহার দেড়শত টাকা। তখন চাকুরীর উন্নতির আশু সম্ভাবনা, তারপর প্রতাপ জহুরীর থিয়েটারই যে খুব ভাল ভাবে চলিবে, তাহারই বা বিশ্বাস কি। এ পর্য্যন্ত ন্যাশনেল থিয়েটারের সকল অধিকারীই দেউলিয়া খাতায় নামভুক্ত হইয়াছেন, তিনিও যে তাঁহাদের পদাঙ্কানুসবণ করিবেন না, তাহাই বা কে বলিতে পারে। কেন তিনি নিশ্চিত ছাড়িয়া অনিশ্চিতের পশ্চাদ্ধাবন করিবেন ?

এদিকে আবার গিরিশ রঙ্গালয়ের উন্নতির একটা প্রবল আশা হৃদয়ে পোষণ করিতেছেন, সে শুভস্বপ্ন সত্যে পরিণত করিবার, জীবনের সাধনা সফল করিবার, এই তো সুযোগ ;—স্থায়ী নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার প্রবল আগ্রহ তাঁহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। আবার ভাবিলেন বেতনভোগী হইয়া নটনটীর সাহচর্য্যে থাকিয়া কি উপেক্ষিত জীবন যাপন করিবেন! এক দিকে বন্ধুবান্ধব

আত্মীয়-স্বজনের নিষেধ, উদারমতি পার্কারের প্রবল চেষ্টা, সাহেব কোম্পানীতে উচ্চপদ, উন্নতির উচ্চাশা ও উন্নত সংসর্গ; আর অপর দিকে উপেক্ষিত জীবন-যাপন, কিন্তু রঙ্গালয়-সাধনার সুবর্ণ সুযোগ;—বিরুদ্ধভাবসংঘর্ষে গিরিশ মহাসঙ্কটে পড়িলেন। অবশেষে রঙ্গনাথের আহ্বানই প্রবল হইয়া উঠিল, গিরিশ দেড়শত টাকা বেতনের নিশ্চিত চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া, প্রতাপ জহুরীর জেদাজেদিতে একশত টাকাতেই থিয়েটারে অধ্যক্ষের অনিশ্চিত পদ গ্রহণ করিলেন।

রঙ্গালয়ে প্রথমে চাকুরী গ্রহণ করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে গিরিশ তাঁহার ব্রতসাধনার উল্লেখ করিয়াছেন—

"তিরস্কার পুরস্কার কলঙ্ক কণ্ঠের হার
তথাপি এ পথে পদ করেছি অর্পণ,
রঙ্গভূমি ভালবাসি হৃদে সাধ রাশি রাশি
আশার নেশায় করি জীবন যাপন।"

এ আশার নেশায়ই গিরিশ পদগৌরব, মান ও সম্ভ্রম ছাড়িয়া ন্যাশনেল থিয়েটারের একাগ্র সাধনার ব্রত গ্রহণ করিলেন। জহুরীর এই রঙ্গালয়েই গিরিশের প্রথম নাটক "আনন্দ রহো"র অভিনয়। এইখানেই তাঁহার নূতন অমিত্রাক্ষর (গৈরিশী) ছন্দের প্রথম প্রবর্ত্তনা, এইখানেই তাঁহার প্রসিদ্ধ পৌরাণিক নাটক রাবণবধ, সীতার বনবাস, সীতাহরণ, লক্ষ্মণবর্জ্জন, অভিমন্যুবধ ও পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস প্রভৃতির স্তবকরচনা। ক্রমে ন্যাশনেল থিয়েটারের প্রতিভা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

যাহা হউক পাকা ব্যবসায়ী হইলেও প্রতাপ অর্থব্যয়ে অনুদার ছিলেন। অভিনেতা ও অভিনেত্রীদিগের বেতন বৃদ্ধি লইয়া

তাঁহার সহিত গিরিশচন্দ্রের মতান্তর উপস্থিত হইল, তিনি প্রতাপ জহুরীর চাকুরী ছাড়িয়া দিলেন।

৪। ষ্টার থিয়েটার (বীডন ষ্ট্রীটে)

একবার নটের সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, গিরিশ বসিয়া রহিলেন না, ধীরপদক্ষেপে তিনি স্থায়ী রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হইলেন। এই সময়ে শিখ সম্প্রদায়ভুক্ত এক নবীন যুবক গুর্ম্মুখ রায়ের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়, তাঁহাকে থিয়েটার প্রতিষ্ঠায় তিনি ব্রতী করেন এবং তাহারই অর্থসাহায্যে গিরিশ ষ্টার রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এই মহাকার্য্যে গিরিশচন্দ্রের প্রথমা ও প্রধানা ছাত্রী প্রতিভাময়া অভিনেত্রী শ্রীযুক্তা বিনোদিনী দাসী প্রধান আয়ুধস্বরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন।

"দক্ষযজ্ঞ" নাটক লইয়া ষ্টার থিয়েটারের উদ্বোধন। গিরিশ দক্ষ সাজিতেন, সতী সাজিতেন বিনোদিনী আর মহাদেব অমৃত মিত্র। খুলিতে খুলিতেই ষ্টারের যেমন প্রশংসা হইল, অর্থাগমও হইতে লাগিল প্রচুর। কিন্তু স্বজাতির তাড়নায় গুর্ম্মুখ রায় আর অধিক দিন থিয়েটারের সংস্রবে রহিতে পারিলেন না, মোটে এগার হাজার টাকা পাইয়া ষ্টার থিয়েটারের স্বত্বাধিকার ছাড়িয়া দিলেন। গিরিশই তাঁহার শিষ্য-চতুষ্টয় অমৃত মিত্র, অমৃত বসু, হরিপ্রসাদ বসু এবং দাসু নিয়োগীর হাতে থিয়েটারের ভারপ্রদান করিতে মনস্থ করিয়া এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। গ্যারিকের পূর্ব্বে ইংলণ্ডের Drury Lane থিয়েটারের ত্রয়ী (Triumvirate) Cibber, Wilks এবং Doggettএর ন্যায় ইঁহারাও ভিন্ন ভিন্ন গুণ-বিশিষ্ট ছিলেন। নিয়োগী সাজসরঞ্জাম ও দৃশ্যপটাদিতে বিশেষজ্ঞ, হরিপ্রসাদ

পাকা ব্যবসাদার, অমৃত বসু নাটক-রচয়িতা ও রসজ্ঞ অভিনেতা, আর অমৃত মিত্র গুরুগম্ভার ভূমিকায় অদ্বিতীয়। নটশিরোমণি গিরিশের দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছিল যে রঙ্গালয়ের ভিতর হইতে রঙ্গালয় পরিচালনার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তির উদ্ভব না হইলে থিয়েটার স্থায়ী হইতে পারে না, বাহিরের স্বত্বাধিকারী অভিনেতৃমণ্ডলীর আশা, আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ বেদনা বুঝিতে পারে না। তাই তিনি সম্ভ্রান্তবংশ হইতে চারিদিকে অভিজ্ঞ এই চারি ব্যক্তিকে মনোনীত করেন। কিন্তু নিজে পূর্ব্বের ন্যায় বেতন-ভোগী হইয়াই রহিলেন।

কর্ত্তৃত্বভার পাইয়াও কেন গিরিশ স্বত্বাধিকার গ্রহণ করিলেন না,—ইহার উত্তর দিতেছি। গুর্ম্মুখ রায়ের একান্ত ইচ্ছা ছিল যে ষ্টার থিয়েটারে যেন বিনোদিনীরও স্বত্বাংশ থাকে। কিন্তু গিরিশ ঐরূপ হইতে দেন নাই এবং তজ্জন্য নিজেও তিনি উহার স্বত্ব গ্রহণ করেন নাই। তিনি নিজের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বিনোদিনীর মাতাকে সান্ত্বনা দিলেন, "বিনোদের মা, আমরা আদার ব্যাপারী, আমাদের জাহাজের খবরে কাজ কি? এই সব ঝঞ্ঝাটে গেলে কোনরূপ দায় আসিলেই সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইবে। আমরা কাজ করিব, বোঝা নিজে না ব'য়ে অন্যের ঘাড়ে চাপাইব।"

গিরিশ এইরূপে নিজে পথ প্রদর্শন করিয়া বিনোদিনীকেও স্বত্বাধিকার গ্রহণ করিতে বিরত করিয়া থিয়েটারের সম্ভ্রম অক্ষুণ্ণ রাখিলেন।

এই বিপুল স্বার্থত্যাগেই থিয়েটারের সৃষ্টি ও উন্নতি। এখানে গিরিশ তাঁহার শিষ্যগণকে একটি অমূল্য উপদেশ দিলেন—"ভদ্রসন্তান থিয়েটারে এসে কিরূপ লাঞ্ছিত হয় তা তোমরা

জানো, তোমাদের হাতে যেন কোন ভদ্রসন্তান লাঞ্ছিত না হয়।” এই শিষ্য-বাৎসল্যই গিরিশের বিশেষত্ব। অতঃপর গিরিশ আর নূতন নাটকের কোন ভূমিকায় এখানে অবতীর্ণ হন নাই, প্রধান শিষ্য অমৃত মিত্রের উপরেই সম্পূর্ণ প্রাধান্য ও ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। ষ্টারেও ‘দক্ষযজ্ঞের’ পরে গিরিশের ‘ধ্রুবচরিত্র’, ‘নলদময়ন্তী’, ‘কমলে কামিনী’, ‘বৃষকেতু’, ‘শ্রীবৎসচিন্তা’, ‘চৈতন্যলীলা’, ‘প্রহ্লাদচরিত্র’, ‘নিমাইসন্ন্যাস’, ‘প্রভাসযজ্ঞ’, ‘বুদ্ধদেব-চরিত’, ‘বিল্বমঙ্গলঠাকুর’ ও ‘রূপ-সনাতন’ প্রভৃতি অপূর্ব্ব ভক্তিমূলক নাটক রচিত হয়। এই সময় হইতেই গিরিশচন্দ্রকে পৌরাণিক নাটকের সম্রাট্ বলা হইত।

৫। থিয়েটার না ধর্ম্মমন্দির?

থিয়েটারে উপরি-উক্ত ‘স্বরাজ’ প্রতিষ্ঠার পরে এক অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। ধর্ম্মজগতেও ইহা যেমন স্মরণীয় ঘটনা, থিয়েটার-প্রতিষ্ঠাকল্পেও তাহা তেমনি গৌরবের বিষয়। একদিকে ব্রাহ্মধর্ম্ম, আর একদিকে নিরীশ্বরবাদ ও ‘ইয়ং বেঙ্গলের’ প্রবল সংঘাতে হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসংস্কারের মূলে যখন নিষ্ঠুর কুঠারাঘাত চলিতেছিল, তখন তিনদিক্ হইতে তিনটি স্রোত সেই প্রভাব শক্তিহীন করিতে সমর্থ হয়,—প্রথম শশধর তর্কচূড়ামণি ও কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন কর্ত্তৃক হিন্দুধর্ম্মের বৈশিষ্ট্যপ্রচার, দ্বিতীয় থিয়োসফিকেল সোসাইটীর উদ্যম ও তৃতীয় গিরিশরচিত “চৈতন্যলীলা” নাটকের অভিনয়। একই সময়ে (১৮৮৪ খৃঃ) এই ত্রিবিধ আন্দোলন হিন্দুধর্ম্মের প্রাধান্য ঘোষিত করে, এবং পরে এই ত্রিধারাই ভিন্নভিন্নভাবে রামকৃষ্ণ-মহাসমুদ্রে মিশিয়া

এক হইয়া যায়। এই 'চৈতন্যলীলা' অভিনয় দেখিতে দলে দলে লোক ছুটিয়া আসিল; নগরে, প্রান্তরে, হাঠে, মাঠে, ঘাটে, 'হরিবোল' 'হরিবোল' রব প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল এবং স্বয়ং রামকৃষ্ণও দেখিয়া বলিলেন, "আসল নকল এক দেখিলাম।"

'রেইস্ ও রায়তের' বিজ্ঞ সম্পাদক লিখিলেন,—

"Let the morality-mongers try a dose of sublime morality from Chaitanya Lila."

থিয়োসফিকেল সোসাইটীর প্রেসিডেন্ট কর্নেল অলকট্ লিখিলেন,—

"It is impossible for any one but a civilised peg-drinking Babu to witness the play without a rush of religious feeling and religious fervour upon his face."

প্রত্যক্ষদর্শী অমৃতলাল বসু মহাশয়ও গিরিশ-প্রবাহিত এই ভাবধারাই অমর ছন্দে গাঁথিয়া রাখিয়াছেন—

"লিখিলা চৈতন্যলীলা, হীরক হইল শিলা,
নাট্যশালা হ'ল তীর্থ ভক্তমেলা থিয়েটার॥
বাজে শিঙা বাজে খোল, রঙ্গমঞ্চে হরিবোল,
বিলাসীর নত শির আঁখিজলে ভেসে যায়।
ছুটিল নামের বন্যা, ধরণী হলেন ধন্যা
গণিকা গুণীর গণ্যা কেঁদে লুটে কৃষ্ণ-পায়।"

আর রামকৃষ্ণদেব? যাঁহার নিকটে পাশ্চাত্ত্যশিক্ষিত কেশব সেন-প্রমুখ মনীষিগণও উপস্থিত হইয়া জ্ঞানসুধা পান করিয়া আসিতেন, যিনি ইতিপূর্ব্বে কখনও থিয়েটারের ত্রিসীমানায়ও আসেন নাই, আজ ব্যগ্র হইয়া অভিনয় দেখিতে ছুটিয়া আসিলেন,

দেখিয়া সমাধিস্থ হইলেন, "তোর চৈতন্য হোক" বলিয়া চৈতন্যবেশী অভিনেত্রীকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। দেবতার চরণ-স্পর্শে থিয়েটার পবিত্র হইল। গিরিশ রামকৃষ্ণদেবের চরণে লুটাইয়া পড়িলেন, রামকৃষ্ণকরুণায় গিরিশেরও ইষ্টলাভ হইল—

"গিরিশের এ সাধনা, হীনা সনে আরাধনা,
দেখেন বেদনাহারী হরি রামকৃষ্ণ চক্ষে।
শ্রীগুরু দেখান ইষ্টে, গুরুরূপে ধরাপৃষ্ঠে,
সেই ইষ্টে দৃষ্টি করে কবি ব্যাকুলিত বক্ষে॥
জপ তপ পূজা কর্ম্ম জ্ঞান ভক্তি ধর্ম্মাধর্ম্ম
মর্ম্মের নৈবেদ্যপদে ধীর ধরিলেন ডালি
দেখে রাম রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ সেই কৃষ্ণ
রামকৃষ্ণ স্রষ্টা সৃষ্ট প্রভু রামকৃষ্ণ কালী॥"

এই সময় হইতেই থিয়েটারের নূতন যুগ আরম্ভ হইল, বঙ্গরঙ্গমঞ্চের সম্ভ্রম বাড়িল, অভিনেত্রী-সংস্পৃষ্ট হইয়াও নাট্যশালা ধর্ম্মমন্দিরে পরিণত হইল। এমন কি, গভীর ভাবোদ্দীপক নাটকের তুলনায় পাশ্চাত্ত্য থিয়েটার অপেক্ষাও বাঙ্গালার থিয়েটারেরই সমধিক প্রশংসা হইল। 'Light of Asia'-প্রণেতা পণ্ডিত প্রবর Edwin Arnold 'বুদ্ধদেব' নাটকের অভিনয় দর্শন[১] করিয়া বাঙ্গালা নাটকের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া ঘোষণা করিলেন,—

"বঙ্গরঙ্গভূমির দৃশ্যপটাদি দেখিয়া হয়ত বিলাতী থিয়েটারের অধ্যক্ষ উপহাস করিতে পারেন, কিন্তু মনোবিজ্ঞান-সম্ভূত

[১] Another singular pleasure was to witness a performance of the "Light of Asia" played by a native Company to an audience of

উচ্চভাবসম্পন্ন নাটকের সুচারু অভিনয় ও কলাকুশলতা এবং দর্শকবৃন্দের বোধগম্য এই সব বাঙ্গালা নাটকের উচ্চভাব পাশ্চত্ত্যদেশের থিয়েটারেও বিরল।”

৬। ষ্টারে এমারেল্ড, আর নূতন ষ্টার হাতীবাগানে

কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই ষ্টারের এক প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর আবির্ভাব হইল। ইনি ধনকুবের গোপাললাল শীল। ইহার সঙ্কল্প হইল যত অর্থব্যয়েই হউক ষ্টার থিয়েটার ক্রয় করিবেন এবং গিরিশচন্দ্রকে আয়ত্তাধীনে আনিবেন। এই ধনাঢ্য যুবক প্রস্তাব করিলেন, হয় বিশ হাজার টাকা বোনাস ও মাসিক তিন শত টাকা বেতন-গ্রহণে গিরিশ তাঁহার থিয়েটারের অধ্যক্ষ হউন, নতুবা যে উপায়েই হউক ষ্টারের অনিষ্ট-সাধনে তিনি ক্রটী করিবেন না। এদিকে গিরিশ-নির্ম্মিত সৌধ তাঁহার অভাবে ভূমিসাৎ হইবার আশঙ্কায় শিষ্যগণ তাঁহাকে ছাড়িতে নারাজ। অবশেষে গিরিশ বোনাসের টাকা হইতে হাতীবাগানে নূতন জমির উপর থিয়েটারের বাড়ী নির্ম্মাণের জন্য ১৬০০০৲ দেন, এবং এমারেল্ডের চাকুরী করিয়াও ছদ্মনামে “নসীরাম” লিখিয়া দিয়া ষ্টারের উদ্বোধনে সহায় হন। এই হাতীবাগানের ষ্টার এখনও পূর্ব্বতন স্বত্বাধিকারীদের হাতেই আছে, আর এখনও

Calcutta citizens whose close attention to the long soliloquies and quick appreciation of all the chief incidents of the story gave an idea of their intelligence and proved how metaphysical by nature these Hindu people are......There was a refinement and imaginativeness in acting as well as an artistic sense entirely remarkable and the female performers proved quite as good as the males. *India Revisited*, p. 250.

সেখানে অভিনয় হয়। এমারেল্ডে গিরিশ মাত্র দুইখানি নাটক —'পূর্ণচন্দ্র' ও 'বিষাদ' লিখিয়াছিলেন।

অল্পদিন মধ্যেই গোপাল শীলের থিয়েটার করিবার সখ মিটিয়া গেল, তিনি থিয়েটারের 'লিজ' দিলেন। গিরিশ এবার বন্ধনমুক্ত হইয়া শিষ্যগণের সহিত ষ্টারে মিলিত হইয়া পরিচালনার ভার স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। এমারেল্ডে 'বিষাদের' গভীর ছায়া পড়িল, ষ্টারে কিন্তু 'প্রফুল্ল' বিরাজ করিতে লাগিল।

এই সময়েই গিরিশের প্রসিদ্ধ সামাজিক নাটক 'প্রফুল্ল' ও 'হারানিধি' এবং ঐতিহাসিক 'চণ্ড' অভিনীত হয়। এতদ্ব্যতীত তিনি 'মলিনাবিকাশ' ও 'মহাপূজা' প্রণয়ন করেন।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে গিরিশ দ্বিতীয়বার বিপত্নীক হন। পত্নীর মৃত্যুতে তিনি যে গভীর শোক পান, 'বিষাদে' তাহারই ভাবী চিত্র, আর 'প্রফুল্লে' তাহারই প্রত্যক্ষ ছায়া সরস্বতী ও জ্ঞানদার মৃত্যুদৃশ্যে গিরিশ নিজের রক্তমোক্ষণ করিয়া রঙ্গমঞ্চে প্রদর্শন করেন। 'হারানিধির' সুশীলা-চরিত্রেও সেই সাধ্বার চরিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে। এই সময়ে নানারূপে বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া এবং সেই দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভজাত শিশুপুত্রটির অসুখের জন্য গিরিশচন্দ্র নিয়মিতভাবে রঙ্গমঞ্চের কার্য্য তত্ত্বাবধান করিতে পারেন নাই। সেই বিপদের সময়ে ষ্টার থিয়েটার হইতে তিনি কর্ম্মচ্যুতির পত্র প্রাপ্ত হন, আর শিশুপুত্রটিও অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। গিরিশ শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়েন। অদৃষ্টের পরিহাসে, অভিনেতার প্রতি সহানুভূতি-প্রদর্শনের জন্য গিরিশের উপদেশ তাঁহার উপরেই প্রথম নিষেধে পরিণত হইল।

৭। মিনার্ভা থিয়েটারে

কিন্তু অচিরেই ধৈর্য্য ধরিয়া গিরিশ আবার কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র নাগেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায়কে স্বত্বাধিকারী করিয়া গিরিশ ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে গ্রেটন্যাশনেলের মঞ্চে নূতন বাটী নির্ম্মাণ করাইয়া "মিনার্ভা থিয়েটার" প্রতিষ্ঠা করেন ও সেক্সপিয়রের ম্যাক্‌বেথ নাটকের বঙ্গানুবাদ করিয়া অভিনয় করেন। রঙ্গমঞ্চের বৈশিষ্ট্য, অভিনয়-সাফল্য ও অত্যুৎকৃষ্ট নাটক-রচনার জন্য 'মিনার্ভা থিয়েটার' অচিরেই প্রথম শ্রেণীর থিয়েটারের সম্মান লাভ করে, এবং অভিনয়ে প্রচুর অর্থাগম হয়। ম্যাক্‌বেথের বঙ্গানুবাদ বঙ্গভাষার বিশেষরূপ সমৃদ্ধি-সাধন করে। বিশেষজ্ঞগণ বলিতে লাগিলেন যে ম্যাক্‌বেথের অন্য কোন ভাষার, এমন কি জার্ম্মান ভাষার অনুবাদও নাকি এত সুন্দর হয় নাই। ম্যাক্‌বেথের পরে মিনার্ভায় 'মুকুলমুঞ্জরা', 'আবুহোসেন', 'জনা', 'সভ্যতার পাণ্ডা', 'করমেতিবাঈ' প্রভৃতি উৎকৃষ্ট নাটক রচিত ও অভিনীত হয়।

অর্থাগম প্রচুর হইলেও নাগেন্দ্রভূষণের অমিতব্যয়িতায় রঙ্গমঞ্চ ঋণগ্রস্ত হইতেছে দেখিয়া গিরিশ স্বয়ং ক্যাশের ভার গ্রহণ করিয়া প্রতিবিধান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ইহাতে স্বত্বাধিকারীর সহিত তাঁহার মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইল, তিনি স্বহস্ত-গঠিত মিনার্ভার সংস্রব ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।

এই সংবাদ প্রচারিত হওয়া মাত্রই ষ্টার থিয়েটারের স্বত্বাধিকারিগণ তাঁহাকে নাট্যাচার্য্যরূপে বরণ করিয়া সেখানে লইয়া যান, ষ্টারে গিরিশের "কালাপাহাড়" ও "মায়াবসান"

যথাক্রমে ১৮৯৬ ও ১৮৯৭ সালে অভিনীত হয়। দুইখানি নাটকই গভীর ভাবোদ্দীপক।

৮। ক্লাসিকে

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় ভূতপূর্ব্ব এমারেল্ড রঙ্গমঞ্চ ভাড়া লইয়া ক্লাসিক থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন। নাট্যাচার্য্যরূপে গিরিশচন্দ্র এক বৎসর এই রঙ্গমঞ্চের কার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। এখানে 'দেলদার' ও 'পাণ্ডব-গৌরব' নাটক রচিত ও অভিনীত হয়।

৯। দ্বিতীয় বার মিনার্ভায়

১৯০০ খৃষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্র আবার (নরেন্দ্রনাথ সরকারের) মিনার্ভা থিয়েটারে ম্যানেজার হইয়া গেলেন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের 'সীতারাম' উপন্যাসখানি নাটকে পরিবর্ত্তিত করিয়া অভিনয় করেন। কিন্তু নরেন্দ্রনাথও ব্যবসায় চালাইতে সমর্থ হইলেন না। গিরিশচন্দ্র নাট্যাচার্য্যরূপে আবার ক্লাসিকে ফিরিয়া গেলেন। এখানে গিরিশচন্দ্র 'অশ্রুধারা', 'মনের মতন', 'ভ্রান্তি', 'আয়না' ও 'সৎনাম' নাটক রচনা করেন। কিন্তু ক্লাসিকেও নানা কারণে গোলযোগ ঘটিল। তিনি পুনরায় মিনার্ভায় আসিলেন।

১০। তৃতীয় বার মিনার্ভায়—জাতীয় নাটক-রচনা

মহেন্দ্র মিত্র ও মনোমোহন পাঁড়ে তখন ইহার স্বত্বাধিকারী। এবার মিনার্ভায় আসিয়া গিরিশচন্দ্র 'হরগৌরী', 'বলিদান', 'বাসর', 'সিরাজদ্দৌলা', 'মিরকাশিম', 'ছত্রপতি' প্রভৃতি

নাটক রচনা ও অভিনয় করেন। এই সকল শ্রেষ্ঠ নাটকের অভিনয় মিনার্ভা থিয়েটারকে তৎকালীন নাট্যজগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসনে প্রতিষ্ঠিত করে এবং নাট্যশালা জাতীয় শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠে। বালগঙ্গাধর তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রভৃতি মনীষিগণ জাতীয়তা প্রতিষ্ঠায় রঙ্গালয়ের মহিয়সী সাধনার ভূয়সী প্রশংসা করেন। বঙ্গরঙ্গমঞ্চ তখন বাঙ্গালার জাতীয় মহামন্দির!

১১। কোহিনুরে

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে কোহিনুর থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়। কোহিনুরের স্বত্বাধিকারী বাবু শরৎকুমার রায় ১০০০০৲ টাকা বোনাস দিয়া গিরিশচন্দ্রকে তাঁহার থিয়েটারে আনয়ন করেন। গিরিশের পরিচালনায় প্রথমেই ক্ষীরোদপ্রসাদের 'চাঁদবিবি' তাঁহারই হস্তে পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত হইয়া অভিনীত হয়। পরে 'ছত্রপতি' প্রভৃতি উৎকৃষ্ট নাটকের অভিনয় হয়। অল্পদিনের মধ্যেই কোহিনুর মিনার্ভার সমকক্ষ হইয়া উঠিল। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় এবং শরৎকুমারের মৃত্যুতে অচিরেই কোহিনুরের পতন আরম্ভ হইল। ইহার পর শরৎকুমারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শিশিরের সহিত গিরিশচন্দ্রের এক মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। মোকদ্দমায় গিরিশচন্দ্র জয়লাভ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার হৃতস্বাস্থ্যের আর পুনরুদ্ধার হইল না।

১২। চতুর্থ বার মিনার্ভায়

মহেন্দ্রবাবু গিরিশকে পুনরায় মিনার্ভায় লইয়া আসিলেন (১৯০৮)। মিনার্ভা থিয়েটারই তাঁহার শেষ কর্ম্মস্থল। এখানে

আসিয়া গিরিশচন্দ্র পর পর 'শাস্তি কি শান্তি', 'শঙ্করাচার্য্য' ও 'অশোক' নাটকের রচনা ও অভিনয় করেন। শেষোক্ত নাটকের পূর্ব্বে তিনি তাঁহার মনোমত ঘটনার সমাবেশে বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসখানিকে নাটকে রূপান্তরিত করিয়া অভিনয় করিয়াছিলেন। অতঃপর 'তপোবল' রচিত হয় কাশীতে। এই 'তপোবল'ই গিরিশপ্রতিভার শেষ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। আরও কয়েকখানি প্রহসনও তিনি রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু সেগুলি অভিনীত হইবার পূর্ব্বেই মহাকাল আসিয়া এই ভৈরবরূপী মহাপুরুষকে স্বস্থানে লইয়া যান (১৯১২, ফেব্রুয়ারী)।

এই সুদীর্ঘ ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাইলাম গিরিশচন্দ্র বঙ্গরঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া উহা কেবল কলাবিদ্যাবিশারদগণের কর্ম্মস্থলে পরিণত করিয়া যান নাই, তাঁহার মহাপ্রস্থানের পূর্ব্বেই তিনি দেখিয়া গিয়াছিলেন কত অভাগারও উহা উপজীবিকার স্থল হইয়াছে। আজ তিনি বাঁচিয়া থাকিলে আরও দেখিতেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্ত কত কৃতী অধ্যাপক ও ছাত্র অভিনয়-ব্যবসায়কে হীন মনে না করিয়া উহা অবলম্বন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। নিজকে তিনি 'নটো' ভাবিয়া কাহারও সহিত মিশিতে চাহিতেন না বটে, কিন্তু সকল নটেরই সমাজের সহিত মিশিবার উপায় তিনিই করিয়া দিয়াছেন। গিরিশ-প্রতিষ্ঠিত থিয়েটার আজও বাঁচিয়া আছে। যেখানে গিরিশচন্দ্রের শিষ্যগণ প্রথম স্থায়ী নাট্যশালা গ্রেটন্যাশনেল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন (১৮৭৩), যেখানে গিরিশ স্বয়ং অভিনেতাদিগকে অভিনয়-কৌশল শিক্ষা দিতেন, যে ভূমিতে তাঁহার অনূদিত অমর নাটক ম্যাক্‌বেথ, জনা ও আবুহোসেন অভিনীত হয়, যেখানে তাঁহার

প্রসিদ্ধ সামাজিক নাটক গৃহলক্ষ্মী, শাস্তি কি শান্তি, ও বলিদান অভিনীত হইয়া আমাদের সমাজজীবনের চিন্তাধারাকে নূতন ধারায় প্রবাহিত করিয়া দেয়, যেখানে 'সিরাজদ্দৌলা' ও 'মিরকাশিম' বাঙ্গালীকে বাঙ্গালী করিয়া গড়িয়া তুলিবার প্রেরণা প্রদান করিয়াছিল, যেখানে অশোক, শঙ্করাচার্য্য ও তপোবল নাটকের অভিনয় দর্শকগণকে বিমল আনন্দসুধা পান করাইয়াছিল—অমৃতের আস্বাদ দিয়াছিল, সেই স্থানে পূর্ব্ব গৌরবের স্মৃতিটুকু লইয়া উপার্জ্জন হিসাবে মিনার্ভা এখনও আত্মপ্রতিষ্ঠ। বিডন ষ্ট্রীটের যে ষ্টার, এমারেল্ড, ক্লাসিক ও কোহিনুর গিরিশের শ্রেষ্ঠত্ব সগৌরবে প্রতিপন্ন করিত, কেবল উহারই কোন চিহ্ন নাই। উহার বক্ষ ভেদ করিয়া চিত্তরঞ্জন এভিনিউ উত্তর দিকে গিরিশের বাড়ী পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে, বোধ হয় বা গিরিশের বাড়ীও যায়। যে ষ্টার গিরিশচন্দ্রেরই স্বহস্তে সৃষ্ট, তাঁহারই প্রদত্ত অর্থে যেখানে পূর্ব্বগৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল, যে স্থান হইতে নসীরাম, চিন্তামণি প্রভৃতি আত্মত্যাগী মহাপুরুষের বিশ্বপ্রেমের আস্বাদ আমরা পাইয়াছিলাম, যেখানে যোগেশের আর্ত্তনাদে প্রাণে মহাভয়ের সঞ্চার হইত, সেই ষ্টার আজও তাহার পূর্ব্ব বিজয়ের বার্ত্তা সগৌরবে ঘোষণা করিতেছে।[১] গিরিশচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত রঙ্গমঞ্চ এখনও স্থায়ী ভাবেই বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাঁহারই প্রবর্ত্তিত অভিনয়ের ধারা এখনও বাঙ্গালার রঙ্গালয়ে প্রবাহিত হইতেছে, তাঁহারই প্রেরণা আজও বাঙ্গালার অভিনেতাদিগকে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিতেছে।

[১] এই প্রবন্ধ-রচনার সময়ে দানীবাবু ষ্টারে পোষ্যপুত্রের শ্যামাকান্তরূপে অসামান্য প্রতিভা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হন। মুদ্রাঙ্কনের সময় মিনার্ভা এখানে সম্প্রতি আসিয়া অভিনয় করিতেছে।

গিরিশচন্দ্র তাঁহার ঐকান্তিক অক্লান্ত সাধনায় বাঙ্গালার রঙ্গালয় গঠন করিয়া গিয়াছেন। যে উদ্দেশ্য লইয়া এই মহাসাধনায় তিনি ব্রতী হইয়াছিলেন তাঁহার মহাপ্রস্থানের কিছু পূর্ব্বে তাঁহার কথাতেই তাহা মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে :—

"কর্ম্মক্লান্ত মানবকে আনন্দ প্রদানের জন্য 'নাট্যমন্দির' সৃষ্ট হয় ; এবং তথায় ছোট বড় সকলেই আনন্দ করিতে যান ! কিন্তু নাট্যমন্দির কলাবিদ্যা-বিশারদের কার্য্যস্থল, কেবল আনন্দদানেই তাহার তৃপ্তি নহে। তাহার আজীবন উদ্যম, কিরূপে আনন্দস্রোত মানবহৃদয় স্পর্শ করিয়া মানবের উন্নতি সাধন করিতে পারে। গাম্ভীর্য্য ও মাধুর্য্যপূর্ণ দৃশ্য সকল অঙ্কিত করিয়া দর্শকের চক্ষের সম্মুখে ধরে। দর্শক তুষারাবৃত হিমাদ্রি-শিখরের চিত্রদর্শনে মহাদেবের ধ্যানভূমির আভাস পান। কোকিলকূজিত পুষ্পিত কুঞ্জবনে রাধাকৃষ্ণের লীলাভূমি অনুভব করিতে পারেন। মহাদেবের মুকুরস্বরূপ বিশালসমুদ্র-অঙ্কিত চিত্রপট দর্শন করিয়া অনন্তের আভাস প্রাপ্তে স্তম্ভিত হন। বাহ্যচাকচক্যমণ্ডিত পাপের ছবি দেখিয়া তাঁহার মনে পাপের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক হয়। আত্মত্যাগী মহাপুরুষের বিশ্বপ্রেমে প্রেমের আভাস পান। উদ্ঘাটিত মানবহৃদয়ে রিপুর দ্বন্দ্ব দেখেন এবং তাহা হইতে যে, সে রিপু বর্জ্জনীয়, তাহাও বুঝিয়া যান। অন্তস্তলদর্শী তানলহরীর সরসসলিলে হৃদ্পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়া বিমল অশ্রুজল শ্রোতার চক্ষে আনে। ক্ষুদ্র কাপট্যের ক্ষুদ্র ক্রিয়াকলাপ নিজ চতুরতা-প্রভাবে বিফল হইয়া, কিরূপ হাস্যাস্পদ হয়—তাহাও দেখিতে পান। নবরসে আপ্লুত হইয়া দর্শক তাঁহার সুখস্বপ্নে যামিনী যাপন করেন।"

গিরিশের এই সাধনায়ই বঙ্গরঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা ও গৌরব।

১৩। রঙ্গমঞ্চের সাধনায় গিরিশের বৈশিষ্ট্য

আমরা পর পর দেখিলাম গিরিশচন্দ্র ন্যাশনেল, ষ্টার, মিনার্ভা প্রভৃতি নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা করিয়া এবং এমারেল্ড, ক্লাসিক ও কোহিনুরের অধিনায়কত্ব করিয়া বঙ্গরঙ্গমঞ্চে অসামান্য প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছেন। নাট্যশালা প্রত্যেক জাতির জাতীয় প্রতিষ্ঠান, A Nation is known by its Theatre. সমাজের এই বিশিষ্ট অঙ্গের গঠনপরিচালন ও সৌষ্ঠবসম্পাদনের জন্যই বাঙ্গালা দেশে গিরিশচন্দ্রের জন্ম। গিরিশচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত রঙ্গমঞ্চ হইতেই কত লোকে ধর্ম্ম শিখিয়াছে, কর্ম্ম শিখিয়াছে, জাতীয়তার আভাস পাইয়াছে। এমনও দেখিয়াছি শত শত মেদিনী-কম্পিত-বক্তৃতায় যাহা হয় নাই, বাঙ্গালী ছাত্র এক 'সিরাজদ্দৌলা' কি 'মিরকাশিমের' অভিনয়ে তাহা শিখিয়া গিয়াছে। কত দর্শককে রঙ্গমঞ্চে হরিধ্বনি করিতে শুনিয়াছি, 'শঙ্করাচার্য্য' দেখিয়া সহজ আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছে। 'বলিদান' অভিনয় দেখিয়া বরপণ বন্ধ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছে। বিধাতৃ-নিরূপিত সাধনা লইয়া জন্মগ্রহণ না করিলে একজনের জীবনে গিরিশ-অনুষ্ঠিত কার্য্য দুঃসাধ্য।

আমরা গ্যারিক, কীন, কেম্বল প্রভৃতি মঞ্চাধ্যক্ষ, সেক্সপিয়র, মার্লো, সেরিডিয়েন প্রভৃতি নাট্যকার, Drury Lane, Covent Garden, Lyceum এবং আধুনিক সময়ের 'মস্কো আর্ট থিয়েটার' প্রভৃতি নাট্যশালার কথা শুনিয়া বাঙ্গালার রঙ্গমঞ্চের প্রতি নাসিকাকুঞ্চিত করি। কিন্তু গভীর আলোচনা করিয়া দেখিলে গিরিশচন্দ্রের অনুষ্ঠিত কর্ম্মের সহিত তাঁহাদের কাহারও তুলনা হয় না। ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা গ্যারিকের

কথাই বলি। গ্যারিক ও গিরিশের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য আছে সন্দেহ নাই। গ্যারিক যেমন ১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে প্রথমে Drury Lane Theatreএর মঞ্চাধ্যক্ষ হইয়া ত্রিশ বৎসর কাল পর্য্যন্ত অখণ্ডপ্রতাপে উহা পরিচালনা করিয়াছিলেন, গিরিশও ১৮৭৭ হইতে ১৯১২ পর্য্যন্ত ৩৫ বৎসর কাল বাঙ্গালার যাবতীয় রঙ্গালয়ের উন্নতি সাধন করেন। তবে গ্যারিক যখন Drury Lane Theatreএর পরিচালনার ভার প্রথমে গ্রহণ করেন, উহার পূর্ব্ব হইতেই সেই থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। Triumvirate স্বত্বাধিকারীর দক্ষতা, Boothএর ওথেলো, Macleanএর Shylock সেই প্রতিষ্ঠা আরও বর্দ্ধিত করে। আর গিরিশের পূর্ব্বে বাঙ্গালার থিয়েটার বা রঙ্গমঞ্চ বলিতে কিছুই ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, সবই তাঁহাকে নিজহাতে গঠন করিতে হইয়াছিল।

দ্বিতীয়তঃ গ্যারিক নিজে নাটক লিখিতে না পারিলেও তাঁহার নাটকের কোন অভাব ছিল না। সেক্সপিয়রের নাটকের তখন এখানে সেখানে অভিনয় হইতেছিল, আর Dryden, Congrave, Cibber, Sedley, Steele প্রভৃতির অনেক সুন্দর সুন্দর 'কমেডি'র প্রাচুর্য্যে থিয়েটারে রসদের কখনও অভাব হয় নাই। নাট্যশালার প্রধান উপাদান নাটক। কোন শক্তিমান্ পুরুষই নাটক ভিন্ন নাট্যশালা বাঁচাইয়া রাখিতে পারেন না। গিরিশচন্দ্রই সেই উপাদান সরবরাহ করিয়া বাঙ্গালার রঙ্গশালায় আনন্দের স্রোত প্রবাহিত করিয়াছেন। রসসঞ্চারে বাঙ্গালীর আনন্দ পিপাসা দূরীভূত করিয়া অর্দ্ধশতাব্দীরও অধিককাল বঙ্গরঙ্গমঞ্চকে সঞ্জীবিত ও সরস করিয়া রাখিয়াছেন, সুধাভাণ্ড-হস্তে এই অমৃত সকলকে পরিবেষণ করিয়াছেন। গিরিশ-রচিত

নাটক ও প্রহসন প্রভৃতি মোট ৮৭খানা হইবে। মেঘনাদবধ, পলাশীর যুদ্ধ প্রভৃতি কাব্য এবং কয়েকখানি উপন্যাসও তিনি নাটকে রূপান্তরিত করিয়াছেন, এতদ্ব্যতীত তাঁহার কয়েকখানি অসমাপ্ত নাটকও আছে। অন্যের নাটক, গীতিনাট্য প্রভৃতিও তিনি সংশোধিত ও মার্জ্জিত করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার গল্প, কবিতা, উপন্যাস এবং প্রবন্ধাদিও শতাধিক হইবে। এই সমস্তই তাঁহাকে অবস্থায় পড়িয়া করিতে হইয়াছিল। যখন বাহিরের পথ রুদ্ধ, নিজেই তিনি লেখনী পরিচালনা করিতে প্রবৃত্ত হন, আর এই জন্য রঙ্গালয়-প্রয়োজনে রচিত নাটকে স্থানে স্থানে নৃত্যগীতাদির বাহুল্য দৃষ্ট হয়। ইহা ত্রুটি সন্দেহ নাই, কিন্তু অবস্থাতাড়নে অনিবার্য্য।

তৃতীয়তঃ আমাদের দেশের অবস্থা পাশ্চাত্ত্য দেশের মত নয়। এখানে উৎসাহ নাই, পৃষ্ঠপোষকতা নাই, প্রতিভার যোগ্যসম্মানও এখানে কেহ দিতে চাহেন না। রাজপৃষ্ঠ-পোষকতা তো আছেই, এমন কি সকল দেশেরই ধর্ম্মযাজকগণ রঙ্গমঞ্চবিদ্বেষী হইলেও জগদ্বিখ্যাত কর্নেলিকে ধর্ম্মযাজক রাজমন্ত্রী রিস্‌লু পর্য্যন্ত সাধুবাদ এবং উৎসাহপ্রদান করিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত করিয়া দেন। আর আমাদের দেশে বিনা উৎসাহে নিন্দাবিদ্রূপ ভ্রুক্ষেপ না করিয়া রঙ্গমঞ্চাধ্যক্ষ ও অভিনেতাকে অগ্রসর হইতে হয়—জাতির সেবা করিতে হয়, সকলের আনন্দবর্দ্ধন করিতে হয়—

"অন্য পরে যার তরে, সতত যতন করে
অভিনেতা অনায়াসে দেয় বিসর্জ্জন,
যায় ধন-প্রাণ-মান, সুখ-সাধ অবসান
পরের প্রীতির তরে আত্ম-সমর্পণ।

সদা পর-আরাধনা সহকারী বারাঙ্গনা,
কে কোথায় রাখে তার মান !
অনুগ্রহপ্রার্থিজন, কে কোথায় পায় ধন,
রজনীর জাগরণ নিত্যহরে প্রাণ।"

এই ত্যাগের জীবনই উপেক্ষিত অভিনেতৃবর্গের নীরব সাধনা।

চতুর্থতঃ গ্যারিক নাট্যকার ছিলেন না। তিনি সেক্সপিয়র লইয়া কাটছাঁট করিতেন। কিন্তু গিরিশের দেশে কোন সেক্সপিয়র ছিল না, তিনি মাইকেলের কাব্য ও ছন্দ লইয়া কাটছাঁট করেন এবং পরে নিজেই সেক্সপিয়র হইয়া পড়েন। সেরিডিয়ন অভিনেতা ছিলেন না, সেক্সপিয়রও কোন রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা করেন নাই। আর গিরিশ একাধারে স্রষ্টা, অধ্যক্ষ, নাট্যকার, শিক্ষক, প্রযোজক ও অভিনেতা। সমস্ত অবস্থা বুঝিয়া দেশবাসীর বাঙ্গালার রঙ্গালয়-সম্বন্ধে বিচার করা কর্ত্তব্য।

বিভিন্ন ভূমিকায় কৃতিত্ব

দ্বিতীয় অধ্যায়

গিরিশচন্দ্র যে যে ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, নিম্নে তাহার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদত্ত হইল। 'নীলদর্পণ', 'বিল্বমঙ্গল', 'হারানিধি', 'প্রফুল্ল' ও 'শঙ্করাচার্য্য' ব্যতীত প্রায় সকল নাটকের প্রথমাভিনয়গুলিতেই তিনি অবতীর্ণ হন।

১৮৬৮—সধবার একাদশীতে নিমচাঁদ	...	বাগবাজারে।
১৮৭১—লীলাবতীতে ললিত	...	শ্যামবাজারে।
১৮৭৩, ২২শে ফেব্রুয়ারী—কৃষ্ণকুমারীতে ভীমসিংহ		জোড়াসাঁকো ন্যাশনেলে।
১৮৭৩, ২৯শে মার্চ্চ—নীলদর্পণে উড্	...	টাউন হলে।
(১৮৭২, ৭ই ডিসেম্বর—অর্দ্ধেন্দুশেখর প্রথম উড্ হন।)		
১৮৭৪—মৃণালিনীতে পশুপতি	...	গ্রেটন্যাশনেল থিয়েটারে।
১৮৭৭, ডিসেম্বর—মেঘনাদ-বধেতে রাম ও মেঘনাদ		নিজনামে লিজ লওয়া ন্যাশনেল থিয়েটারে।
১৮৭৮—পলাশীর যুদ্ধে ক্লাইভ	...	"
" —বিষবৃক্ষে নগেন্দ্রনাথ	...	"
" —দুর্গেশনন্দিনীতে জগৎসিংহ	...	"
১৮৮০, ১লা জানুয়ারী—হামিরে হামির	...	প্রতাপ জহুরীর ন্যাশনেল থিয়েটারে।
১৮৮১—মাধবী-কঙ্কণে ৭টি ক্ষুদ্র ভূমিকায়	...	"
" —আনন্দরহোতে আনন্দরহো	...	"
" —রাবণবধে রাম	...	"
" —সীতার বনবাসে রাম	...	"

১৮৮১—অভিমন্যু-বধে যুধিষ্ঠির ও দুর্য্যোধন প্রতাপ জহুরীর ন্যাশনেল থিয়েটারে।
„ লক্ষ্মণ-বর্জ্জনে রাম ... „
১৮৮২—সীতার বিবাহে বিশ্বামিত্র ... „
১৮৮৩—পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসে কীচক ও দুর্য্যোধন „
„ —দক্ষযজ্ঞে দক্ষ ... ষ্টার থিয়েটারে।
১৮৯৩—ম্যাক্‌বেথে ম্যাক্‌বেথ .. মিনার্ভায়।
১৮৯৪—জনায় বিদূষক (প্রথম তিন রাত্রি ... „
অর্দ্ধেন্দুশেখর সাজেন)।
১৮৯৫—প্রফুল্লে যোগেশ ... „
১৮৯৬—কালাপাহাড়ে চিন্তামণি ... ষ্টারে। (১৮৮৯ খৃঃ প্রফুল্ল ও হারানিধিতে অমৃত মিত্র প্রথম যোগেশ ও হরিশ সাজেন)।
১৮৯৭—মায়াবসানে কালীকিঙ্কর .. ষ্টারে।
„ —হারানিধিতে হরিশ ... „
১৯০০—পাণ্ডবগৌরবে কঞ্চুকী ... ক্লাসিকে।
„ —সীতারামে সীতারাম ... মিনার্ভায়।
১৯০১—কপালকুণ্ডলায় অধিকারী, চটীরক্ষক, মাতাল, মুটে ও প্রতিবাসী „
„ —ভ্রান্তিতে রঙ্গলাল ... ক্লাসিকে।
১৯০২—আয়নায় সৃষ্টিধর ... „
১৯০৫—হরগৌরীতে হর (প্রথম রাত্রিতে ... মিনার্ভায়।
তারক পালিত)।
„ —বলিদানে করুণাময় ... „
„ —হারানিধিতে হরিশ ... „
„ —সিরাজদ্দৌলায় করিম চাচা ... „
১৯০৬—দুর্গেশনন্দিনীতে বীরেন্দ্রসিংহ ... „
„ —মিরকাশিমে মিরজাফর ... „

১৯০৭—ছত্রপতিতে আওরঙ্গজেব	...	কোহিনুরে।
১৯১০—শঙ্করাচার্য্যে শিউলী	...	মিনার্ভায়।
„ —চন্দ্রশেখরে চন্দ্রশেখর, এবং পরে শ্রীনাথ, সর্ব্বেশ্বর ও বকাউল্লা	...	„
১৯১১, ১৭ই জুন—রকমফেরে জালিম	...	„
„ ১৫ই জুলাই—বলিদানে করুণাময়	...	„

এতদ্ব্যতীত প্রতাপসিংহ, শশিভূষণ, সাধক প্রভৃতি ভূমিকায়ও দুই-এক বার নামিয়াছেন। গিরিশ শেষ-জীবনে এই সকল ভূমিকায় রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া দর্শকমণ্ডলীকে প্রচুর আনন্দ দিয়াছিলেন।

অভিনয়-নৈপুণ্যে

তৃতীয় অধ্যায়

আমরা গিরিশের নিমচাঁদের ভূমিকার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বিচারপতি সারদা মিত্রের ধারণার কথাও উল্লেখ করিয়াছি। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ও অনেকবার বলিয়াছেন, "অভিনয় এত সুন্দর হইত, ইনি যে আমার গিরিশ দাদা তাহা একেবারে ভুলিয়া যাইতাম।"

তারপরে—

"ভীমসিংহ পশুপতি মেঘনাদ রঘুপতি
দক্ষ দক্ষ-প্রজাপতি সুযশ প্রকাশে যাঁর।"

ভীমসিংহের কঠোরতা ও স্নেহ অতি চমৎকার ফুটিয়া উঠিত, এবং পশুপতির অভিনয় এত উৎকৃষ্ট হইত যে অমৃত বসু মহাশয় সর্ব্বদাই বলিতেন যে "গিরিশবাবু যদি অন্য কোন ভূমিকায় না নামিয়া এক পশুপতি অভিনয় করিয়াই মরিতেন, তবু আমি বলিতাম যে তাঁহার অভিনয়-কৃতিত্বের সহিত কাহারও তুলনা হয় না। এই ভূমিকার জন্য অন্যদেশে হইলে অভিনেতা রাজসম্মানে ভূষিত হইতেন। সে মধুর গম্ভীর কণ্ঠস্বরও শুনিব না, সে ভাবের অভিব্যক্তিও দেখিব না। নাটকের শেষ-দৃশ্যে অগ্নিরাশির মধ্যে অষ্টভুজা মূর্ত্তি-আলিঙ্গনে গিরিশবাবুর অপূর্ব্ব অভিনয় দেখিয়া আমরা পর্য্যন্ত অভিভূত হইতাম, দর্শকতো দূরের কথা।" শ্রীযুক্তা বিনোদিনীও বলেন, "গিরিশচন্দ্র কারাগারে আবদ্ধ পশুপতিবেশে যখন বলিতেন—

'মন্ত্রিবর, বল দেখি পা রাখি কোথায়?' আবার পরক্ষণেই অগ্নিদগ্ধ স্বীয় গৃহখানি দেখিতে পাইয়া 'মনোরমা যে গৃহে আছে, ছাড়ো, ছাড়ো' বলিয়া সহসা উন্মত্তাবস্থায় সবলে হাত ছাড়াইয়া ধাবিত হইতেন,—স্মরণ হইলে আজিও দেহ কণ্টকিত হয়।" বিধর্ম্মী সৈন্য-পরিবেষ্টিত হইয়া পশুপতি যখন রাজপথ দিয়া চলিতেন, গিরিশচন্দ্রের উন্মাদ অবস্থা দেখিয়া অনেকেই ভীত হইতেন। একদিন গিরিশচন্দ্রের মাতুলকন্যা ভুবনমোহিনী (শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন মিত্রের মাতা) সেই অবস্থা দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ী আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "দেখে এলুম, মেজদাদা পাগল হ'য়ে গেছেন।"

গিরিশচন্দ্রের পশুপতি ভূমিকার সম্বন্ধে আর একটি বিষয় উল্লেখ করিব। প্রায় একই সময়ে ন্যাশনেল ও বঙ্গরঙ্গভূমিতে 'মৃণালিনী'র অভিনয় হইতেছিল। একমাত্র স্বর্গীয় সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার-সম্পাদিত "সাধারণী" পত্রিকায় তখন নাটকের নিরপেক্ষ সমালোচনা হইত। এই সাধারণীতে গিরিশচন্দ্রের পশুপতি-সম্বন্ধে লিখিত হয়—"অভিনেতাদের মধ্যে পশুপতির ভূমিকা অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। ইনি সকল বিষয়েই সমধিক দক্ষতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইঁহার মুখভঙ্গি-পরিবর্ত্তন ও নিপুণ অভিনয়-কার্য্যে সকলেই সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন।" সাধারণীতে যথার্থই লেখা হইয়াছে যে বঙ্গরঙ্গশালার মধ্যে ইনি এক শ্রেষ্ঠরত্ন। আর 'বঙ্গরঙ্গভূমি' (Bengal Theatre) সম্বন্ধে লিখিত হয়, "পশুপতিকে নিতান্ত কাগজ-কুড়ান পাগল বলিয়া বোধ হইতেছিল। যখন মহম্মদ আলিকে পশুপতি যবনবেশ পরাইতেছিলেন, তখন পশুপতি বানরের ন্যায় মুখভঙ্গিমা করিতেছিলেন। তাহাতে অত্যন্ত রসভঙ্গ হইয়াছিল।"

নীলদর্পণের উড্ গিরিশচন্দ্রের অতি অদ্ভুত হইত, শিক্ষিত এবং ইংরাজ দর্শক তাঁহার অভিনয়েব প্রশংসা করিতেন। এদিকে আবার যাবতীয় দর্শক কিন্তু অর্দ্ধেন্দুশেখরের অভিনয়ে অধিক রসাস্বাদ উপভোগ করিতেন। তবে উভয়ের অভিনয়-কৌশলে পার্থক্য ছিল। গিরিশ করিতেন একজন কঠোর কর্ত্তব্যপরায়ণ বিদেশী ব্যবসায়ীর অভিনয়, আর অর্দ্ধেন্দুশেখর দেখাইতেন নিষ্ঠুর অত্যাচারী শ্বেতাঙ্গ সাহেবের চিত্র। বোধহয় গিরিশের অভিনয় অধিক কলাসম্মত হইত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সান্যাল-বাড়ীতে উদ্বোধন-রাত্রে নীলদর্পণ অভিনয়ে গিরিশ-চন্দ্রকে না দেখিয়া স্বয়ং দীনবন্ধু আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, "ইহাতে একজন যোগ্য গম্ভীর অংশের (serious part) অভিনেতা যোগদান না করায় অঙ্গহানি হইয়াছে।"

'মেঘনাদ-বধে' গিরিশ একাই রাম ও মেঘনাদ দুইটি বিরুদ্ধ ভাবোদ্দীপক ভূমিকার অভিনয় করিতেন। রামের ভূমিকা অভিনয় করিবার সময় রামের ভ্রাতৃস্নেহ, সৌম্যমূর্ত্তি ও দীনভাব যেমন উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিত, আবার মেঘনাদের ভূমিকায় বীরত্বব্যঞ্জক আকৃতি ও দৃপ্ত কণ্ঠস্বরে তেমনি মেঘনাদ-চরিত্রও পরিস্ফুট হইতে দেখা যাইত। উভয়ের কথাবার্ত্তা, ভাবভঙ্গী, চেহারা দেখিয়া একজন লোক বলিয়া মনেই হইত না। দানীবাবু বলিতেন, "বাপীর রাম-ভূমিকায় ওষ্ঠ হইয়া যাইত ব্রহ্মচারীর অনুরূপ সাদা, আর মেঘনাদের ভূমিকায় ওষ্ঠ হইত রক্তাভ বীরোচিত।" শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলেন, "গিরিশ ঘোষ ফুলিয়া একটা গিরিশ ঘোষ তিনটা হইয়া যাইতেন – প্রথম গিরিশ ঘোষ রাম যে দ্বিতীয় গিরিশ ঘোষ মেঘনাদের শত্রু, এই ভাবটি অতি উত্তমরূপে পরিস্ফুট হইত।"

এই সম্বন্ধেও "সাধারণী" পত্রিকার নাট্যসমালোচনা হইতে আমরা আপনাদিগকে কিছু উপহার দিতেছি—

"গিরিশচন্দ্রের রামরূপের অভিনয়ে বারংবার আমাদের কঠোর চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়াছিল। লক্ষ্মণ যখন পূজাগারে প্রবেশ করেন, তখন গিরিশচন্দ্রের মেঘনাদ-সম্ভব সৌম্যভাব-দর্শনে আমরা মুগ্ধ হই; আবার তৎপরক্ষণেই যখন মেঘনাদ সহসা রোষকষায়িতনেত্রে বীরমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বক্ষ প্রসারণপূর্ব্বক লক্ষ্মণের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার উপক্রম করিলেন তখন গিরিশচন্দ্র অভিনয়-পটুতার চরমসীমা দেখাইলেন, তাঁহার সে ভাব অদ্ভুত বিস্ময়কর! তাহাতে আমরা মুগ্ধেরও অধিক হইয়াছিলাম। ইংলণ্ডের প্রথিতনামা গ্যারিকের ক্ষমতার পরিচয় পুস্তকে পাঠ করিয়াছি, কিন্তু বঙ্গের গিরিশ অপেক্ষা কোনও গ্যারিক যে অধিকতর ক্ষমতা প্রদর্শন করিতে পারেন ইহা আমাদের ধারণা হয় না। গিরিশচন্দ্র দীর্ঘজীবী হউন আর এইরূপে আমাদের সুখবর্দ্ধন করিয়া সাধুবাদ গ্রহণ করিতে থাকুন। গিরিশ বঙ্গের অলঙ্কার।"—সাধারণী, ৯ম ভাগ, ১৫ সংখ্যা।

মধুসূদনের রামচরিত্র অভিনয় করিতে গিরিশচন্দ্রকে যে কতদূর ভাবিতে হইয়াছিল এ সম্বন্ধে তাঁহার স্বরচিত উক্তি হইতেই পাঠকবর্গকে যৎকিঞ্চিৎ উপহার দিতেছি—

"নটের সাধনায় সিদ্ধ হওয়া বড় অল্পায়াস-সাধ্য নহে। যাঁহার পূর্ব্বোল্লিখিত ধ্যান-ধারণায় শক্তি নাই তাঁহার রঙ্গালয়ে প্রবেশ বিড়ম্বনা। তিনি সুপাঠক হইলে যথাযোগ্য উচ্চারণের সহিত নিজ ভূমিকা বুঝাইয়া পাঠ করিতে পারেন বটে, কিন্তু তাহা অভিনয় নহে। অভিনয়ের পন্থা কঠোর,—কুসুমাবৃত নহে।

নটের কণ্ঠস্বর লইয়া কাজ। অতএব যে কার্য্যে কণ্ঠস্বর বিকৃত হয়, তাহা বিষবৎ পরিহার্য্য। অন্তর্দ্দৃষ্টি লাভ করিতে হইলে অন্তর্ব্বৃত্তিসকল তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ না করিলে অনেক ভ্রম-প্রমাদ ঘটে। এই বিশ্লেষণ-কার্য্যে মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা তৎসম্বন্ধে যাহা বলেন তাহা বুঝিয়া আপনার মনোবৃত্তির সহিত মিলাইয়া দেখিতে পারিলে কার্য্যের বিশেষ সহায়তা হয়। নাটক-বর্ণিত ভূমিকা কোথাও ক্ষুণ্ণ থাকিলে তাহা অভিনয়-কালে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া প্রদর্শন করা যায় কি না সে বিষয়ে নিয়ত চেষ্টা না করিলে নট, নাটককারের যোগ্য ভাব-প্রকাশক হন না— প্রকৃত বন্ধু-জ্ঞানে নাটককার তাঁহাকে অভিবাদন করেন না। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। মাইকেল মধুসূদন দত্ত রামকে ভীরুরূপে অঙ্কিত করিয়াছেন। সেই নিমিত্ত 'মেঘনাদ-বধ' উচ্চ কাব্য হইয়াও হিন্দুর নিকট দূষণীয় হইয়াছে। নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত "মেঘনাদ-বধ" নাটকে রামের ভীরুতা ঢাকিবার চেষ্টা করিতে হয়। যখন নৃমুণ্ডমালিনী রামকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেন তখন রামকে দৃপ্তস্বরে বলিতে হয়—

'জনম রামের, রমা, রঘুরাজকুলে
বীরেশ্বর'— ইত্যাদি

তারপর যখন বিভীষণ বলেন—

'দেখ
প্রমীলার পরাক্রম, দেখ বাহিরিয়া
রঘুপতি! দেখ দেব, অপূর্ব্ব কৌতুক!
না জানি এ বামাদলে কে আঁটে সমরে
ভীমারূপা, বীর্য্যবতী চামুণ্ডা যেমতি
রক্তবীজ-কুল অরি!'

তদুত্তরে রাম উপেক্ষা-ব্যঞ্জক ঈষৎ হাস্য করিয়া উত্তর প্রদান করিলেন,

'দূতীর আকৃতি দেখি ডরিনু হৃদয়ে
রক্ষোবর! যুদ্ধ-সাধ ত্যজিনু এখনি।' ইত্যাদি

এই ঈষৎ হাস্যে নট প্রকাশ করিতে চান যে, 'রাবণের সহিত যুদ্ধ করিতে দুর্লঙ্ঘ্য সাগর লঙ্ঘন করিয়া লঙ্কায় আসিয়াছি, রমণীর বীরত্ব আর কি দেখিব?' কিন্তু রামের ভীরু স্বভাব মেঘনাদবধ কাব্যের এত অধিক স্থানে প্রকাশিত হইয়াছে যে, তাহা ঢাকিবার জন্য নটের এই কৌশল কতদূর সফল হইয়াছে তাহা বলা কঠিন।

আবার মেঘনাদের ভূমিকায় নিকুম্ভিলা-যজ্ঞাগারে লক্ষ্মণের পশ্চাতে বিভীষণকে দেখিয়া মেঘনাদের ভূমিকায় গিরিশচন্দ্র যখন ঘাড় নাড়িয়া বলিতেন—

'এতক্ষণে,
জানিনু কেমনে আসি লক্ষ্মণ পশিল
রক্ষঃপুরে।'

এবং পরক্ষণে বীরোচিত গম্ভীর ও দৃপ্তস্বরে বলিতেন—

'ধর্ম্মপথগামী
হে রাক্ষসানুরাজ, বিখ্যাত জগতে
তুমি। কোন্ ধর্ম্মমতে, কহ দাসে শুনি
জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি, এ সকলে দিলা
জলাঞ্জলি। শাস্ত্রে বলে, গুণবান্ যদি
পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ পর পর সদা।'

শুনিতে শুনিতে শ্রোতৃবৃন্দের শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিত। বস্তুতঃ সে অভিনয় কেহ ভুলিবে না।

'পলাশীর যুদ্ধে' চিন্তাকুল-চিত্ত ক্লাইভ বলিতেছেন,—

'হায় উপেক্ষিয়া সমগ্র সমর-সভা
নিষেধ সবার, অণুমাত্র ভবিষ্যৎ
না ভাবিয়া মনে একাকী রণ-সমুদ্রে
দিলাম সাঁতার, ডুবি যদি একা নহি
ডুবিব সকল, ডুবিবে ব্রিটিশ রাজ্য
যাবে রসাতল।'

কথাগুলি গিরিশচন্দ্র এমনি ভাবে উচ্চারণ করিতেন যেন চিত্ত তাঁহার গভীর চিন্তাকুল, আবার মুখে তাঁহার অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্য, অথচ এমনি ভাব যে, চিন্তা যেন আগেই শেষ হইয়া গিয়াছে। তাই গিরিশচন্দ্র অর্দ্ধেন্দুশেখরের ন্যায় চিন্তা করিতে করিতে থামিয়া থামিয়া কথাগুলি উচ্চারণ করিতেন না। চিন্তাকুল হৃদয়ের সুচিন্তিত উক্তি স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যের সহিত উচ্চারিত হইত। যখন বলিতেন 'ডুবিবে ব্রিটিশ রাজ্য যাবে রসাতল' তখন তাঁহার চক্ষে মুখে কণ্ঠস্বরে এমনি ভাব প্রকাশিত হইত যে, মনে হইত যেন ক্লাইভের সমস্ত আশা নিষ্ফল হইতে চলিয়াছে—তাঁহার কল্পনার রাজ্য বুঝি ভাঙ্গিয়া চূরমার হইয়া গেল।

'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে একমাত্র কন্যা কৃষ্ণকুমারীর শোকে (৫ম অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য) উন্মাদপ্রায় ভীমসিংহ বলিতেছেন, "মানসিংহ, মানসিংহ, মানসিংহ! তাকে তো এখনই নষ্ট করবো, আমি এই চল্লেম।" বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় মানসিংহ নামটি একই সুরে তিনবার উচ্চারণ করিতেন। কিন্তু গিরিশবাবু প্রথম

মানসিংহ নামটি এরূপ ভাবে উচ্চারণ করিতেন যেন নামটি ক্ষিপ্ত ভীমসিংহের মস্তিষ্কে দুঃস্বপ্নের ছায়ার ন্যায় পতিত হইত, দ্বিতীয় মানসিংহের উচ্চারণে বোধ হইত যেন সেই ছায়া পরিষ্কার হইতেছে—যেন কি দুর্ঘটনা স্মরণ করা হইতেছে; তৃতীয় বারে ক্ষিপ্ত রাজার স্মৃতিপটে মানসিংহ সুস্পষ্ট হইয়া দাঁড়াইল—তিনি অসি উন্মোচন করিয়া তাঁহাকে বধ করিতে ছুটিলেন। তৃতীয় বারের মানসিংহ নাম এমন গম্ভীর গর্জ্জনে উচ্চারিত হইত যে দর্শকগণ ভয়বিহ্বল হইয়া পড়িতেন, একবার দুইজন 'ষ্টল' হইতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। এই গর্ভাঙ্কেই কন্যা-শোকাতুরা রাণী অহল্যাকে ভীমসিংহ বলিতেছেন, "মহিষী যে, দেখ, তুমি আমার কৃষ্ণাকে দেখেছ? কৈ?" বিহারী-বাবু এই অংশ কাঁদিতে কাঁদিতে অভিনয় করিতেন। গিরিশ-বাবুর অভিনয়ে ক্রন্দন ছিল না। কৃষ্ণকুমারী যেন কোথায় গিয়াছে—ভীমসিংহ তাঁহার প্রিয় দুহিতাকে খুঁজিতেছেন। গিরিশবাবুর এই পরিকল্পনায় দৃশ্যটি আরও হৃদয়বিদারক হইয়াছিল। গিরিশের গুণমুগ্ধ নাটোরের রাজা চন্দ্রনাথ স্বহস্তে আপনার রাজপরিচ্ছদে গিরিশচন্দ্রকে সুসজ্জিত করিয়া নিজের তরবারি গিরিশের কটিদেশে ঝুলাইয়া দিয়াছিলেন।

ষ্টার থিয়েটারে পরমহংসদেব একদিন 'দক্ষযজ্ঞ' দেখিতে গিয়াছিলেন। দক্ষরূপে গিরিশকে দেখিয়া শিষ্যগণকে বলিলেন, "ছাখ্, ব্যাটা যেন অহঙ্কারে মট্‌মট্ কচ্ছে।" আবার যখন শিবকে গালাগালি করেন, রামকৃষ্ণদেব বলেন, "ছাখ্, এটা বলে কি?"—বস্তুতঃ দক্ষ যে স্রষ্টা ও লোকগঠনকারী,—গিরিশের অভিনয়ে তাহা বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইত। দক্ষের দর্প ও আত্মসম্মানবোধও তদ্রূপ অভিনয়ে আশ্চর্য্যভাবে

আত্মপ্রকাশ করিত। সতীর প্রতি দক্ষের উক্তি—"অপমান মান আছে যার, ভিখারীর মান কি রে ভিখারিণী"—জনৈক লব্ধ-প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকের কাণে নাকি সাত দিন পর্য্যন্ত বাজিয়াছিল।

মিনার্ভা থিয়েটারে দক্ষের অভিনয়ে গিরিশচন্দ্রের কৃতিত্ব দেখিয়া রায় বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ বসু—"Indian Mirror"এ লিখিয়াছিলেন—

"The dignified and difficult pantaur of Daksha was capitally rendered by G. C. who from the fact of being the author of the piece was singularly well justified to reflect the exact spirit of the role. His impersonation was, to apply the remarks of Victor Hugo on Lamaitre's Ruy Blass, 'not a transformation, but a trans-figuration.' The other figures in the play would have done very well indeed, if they had not laboured under what was undoubtedly to them a serious disadvantage which penny candles must suffer in the presence of incandescent lamps."

গভীর ভাবোদ্দীপক অভিনয়ে,—কি ভাবাভিব্যক্তিতে, কি চেহারায়, কি কণ্ঠস্বরে, কি গাম্ভীর্য্যোক্তিতে গিরিশচন্দ্রের তুলনা ছিল না। অভিনেতাকে বিশেষরূপে ধ্যানস্থ থাকিতে হয়, গিরিশ-চন্দ্রও পূর্ব্ব হইতে ভাববিভোর না হইয়া কোন ভূমিকায় নামিতেন না। রঙ্গালয়ে উপস্থিত হইয়াই তিনি কখনও অভিনয় করেন নাই। তাঁহার যোগেশ, করুণাময়, হরিশ, চন্দ্রশেখর, ম্যাক্‌বেথ ও কালীকিঙ্কর এইরূপ ভাবসাধনায় অতীব মর্ম্মস্পর্শী হইত।

আমরা ইতিপূর্ব্বে উড্‌ এবং ক্লাইভের ভূমিকার কতক পরিচয় দিয়াছি, কিন্তু গ্যারিক, কেম্বল, কীন ও আর্ভিং অভিনীত

ম্যাক্‌বেথ ভূমিকায় সাফল্য বড় সহজ কথা নয়। বিশেষতঃ ১৮৮৮ ডিসেম্বর হইতে লণ্ডনে সার হেনরী আর্ভিং এলেনটেরীর সহিত ম্যাক্‌বেথ নাটকে দক্ষতা দেখাইতেছিলেন।

তবে গ্যারিকের যেমন Mrs. Cibber ছিলেন প্রধানা সহযোগিনী অভিনেত্রী, কেম্বলের ছিলেন তাঁহার সহোদরা মিসেস্ সিডনস্, স্যার হেনরী আর্ভিংএর ছিলেন রূপবতী কলাময়ী এলেনটেরী, গিরিশেরও সহযোগিনী অভিনেত্রী ছিলেন প্রতিভাশালিনী বিনোদিনী এবং পরবর্ত্তী সময়ে সিডেনসের মত কলাভিজ্ঞা তিনকড়ি। পূর্ব্বোক্ত আর্ভিংই ছিলেন গিরিশের সমসাময়িক।

গিরিশের ম্যাক্‌বেথ অভিনয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বেই স্যার হেনরী আর্ভিং Wolsey (Jan. 1892), King Lear (Nov. 1892) ও Becket (Feb. 1893) এর ভূমিকায় প্রভূত যশোর্জ্জন করেন। এইরূপে আর্ভিংএর যশোগানে যখন নাট্যজগৎ একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত মুখরিত, ইতিপূর্ব্বে Sir Henryর Macbeth 'scarcely a success' হইলেও গিরিশচন্দ্র-সম্বন্ধে কিন্তু বাঙ্গালাদ্বেষী Englishmanও[১] যেন বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াই লিখিতে বাধ্য হন—

"A Bengali Thane of Cawdor is a living suggestion of incongruity, but the reality is an astonishing reproduction of the standard convention of the English stage."

এই আর্ভিং অভিনয় করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেনও যেমন গিরিশের ছয় বৎসর পূর্ব্বে, মহাপ্রস্থানও করেন (১৯০৬)

[১] *Vide Englishman*, 8th Feb., 1893

গিরিশের ছয় বৎসর পূর্ব্বে। মৃত্যুকালে আর্ভিং যেমন বেকেটের শেষ উক্তি "Into Thy hands, O Lord, into Thy hands" বলিয়া চিরনিদ্রায় অভিভূত হন, গিরিশও—"প্রভু শান্তি দাও, শান্তি দাও, যদি এসেছো নেশা কাটিয়ে দাও" বলিতে বলিতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পদতলে চিরাশ্রয় লাভ করেন।

'দক্ষযজ্ঞের' পর দশ বৎসর গিরিশ কোন নূতন ভূমিকায় অবতীর্ণ হন নাই। কেন হন নাই সে সম্বন্ধে অনেক কাহিনী আছে। দুই-একটি অলৌকিক ঘটনাও শুনিতে পাই, তবে আমরা তাহার অবতারণা করিব না। কারণ যাহাই হউক, প্রকৃতপক্ষে অমৃতলাল মিত্রের ন্যায় একজন যোগ্য শিষ্য পাইয়াই বোধ হয় ষ্টারে তিনি অভিনয় করিতে বড় রাজী ছিলেন না। এমারেল্ডেও মহেন্দ্র বসুর দ্বারাই কার্য্য চালাইতেন, কিন্তু মিনার্ভা প্রতিযোগিতায় পরাজিত হইবে এই আশঙ্কায় আবার মিনার্ভায় তিনি ম্যাক্‌বেথের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ষ্টারে তাহা করিতে হয় নাই। একবার 'চণ্ডের' রিহার্সেলের সময়ে একদিন অমৃত মিত্র "হের অট্টহাস্যে" প্রভৃতি আবৃত্তি করিতেছিলেন। গিরিশ বলিলেন, "আরও উচ্চে, আরও উচ্চে।" অমৃত বলিলেন, "মশায়, আর পারি না।" সকলেই জানেন অমৃতলালের ন্যায় সুমিষ্ট, গম্ভীর ও উচ্চ কণ্ঠস্বরের অভিনেতা বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চে আর কেহই ছিলেন না। গিরিশ বলিলেন, "আচ্ছা তুমি যেখানে ছাড়িবে, আমি সেখানে ধরিব" তারপর এত উচ্চ উদাত্তস্বরে বলিতে লাগিলেন যে, হরিপ্রসাদ বসু প্রভৃতি বলেন, "মশায় এটা একবার publicকে শোনাবেন না?"—

গিরিশ—না, তা হ'লে অমৃত খাটো হ'য়ে যাবে।

মহেন্দ্রবাবু প্রভৃতির ক্ষোভ ছিল যে সম-ক্ষমতাপন্ন হইয়াও

তিনি অমৃতলালের ন্যায় গিরিশের স্নেহসৌভাগ্যে বঞ্চিত ছিলেন। কেহ কেহ গিরিশকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসাও করিয়াছিলেন, উত্তরে গিরিশ বলেন, "অমৃত নির্ব্বিচারে অন্ধের ন্যায় আমার শিক্ষা গ্রহণ করে, মহেন্দ্রও কম ক্ষমতাশালী নয়, কিন্তু আমি যা বলি বিচার না করিয়া সে নেয় না।" বিনোদিনী, তিনকড়ি প্রভৃতিরও এই অন্ধবিশ্বাস ছিল, তাই অন্যে মনে করিত, উহারা গিরিশের অধিক স্নেহের সৌভাগ্যশালিনী।

গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' ষ্টার থিয়েটারে যখন প্রথম অভিনীত হয়, যোগেশের ভূমিকা গ্রহণ করেন অমৃতলাল মিত্র, এবং সে ভূমিকায় তিনি সাফল্যও লাভ করেন। ম্যাক্‌বেথের কিছু পরেই গিরিশ এবার মিনার্ভায় 'প্রফুল্ল' অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী tragedian মহেন্দ্র বসুর উপর এই ভূমিকা অর্পিত হয়। ঠিক এই সময়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা স্বরূপ ষ্টারেও 'প্রফুল্ল' বিজ্ঞাপিত হয়। রিহার্সেলের পর মহেন্দ্রবাবু গিরিশচন্দ্রকেই এই ভূমিকাটি গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। সকলে গুরুশিষ্য-সংগ্রাম দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া প্রতীক্ষা করে। রসাল বাঙ্গালা ও ইংরাজী কবিতার সহযোগে ষ্টার সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়—

"তোমার শিক্ষিত বিদ্যা
দেখাব তোমারে—"

"Inpartial censure we request from all
Prepared by just decrees to stand or fall."

ষ্টারে এবারও অমৃতলালই যোগেশের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু গুরুশিষ্যের অভিনয়-প্রতিযোগিতায় শিষ্যকেই পরাজিত হইতে হইয়াছিল। তিন-চারি রাত্রি অভিনয়ের পর

ষ্টারের কর্তৃপক্ষ 'প্রফুল্লের' অভিনয় বন্ধ করিয়া দিলেন; কারণ, দর্শক-সংখ্যা মিনার্ভায় দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, আর ষ্টারে হ্রাস পাইতে আরম্ভ করিল। এই সময় একজন বিখ্যাত সমালোচক উভয়ের অভিনয়ের যে তুলনামূলক সমালোচনা করিয়া ছিলেন তাহা যেমন পাণ্ডিত্যপূর্ণ তেমনি সারগর্ভ। তাঁহার কথাগুলি আপনাদিগকে উপহার দিতেছি—

"So far the advantages and disadvantages almost balance each other. Now comes the question of the claims of the two Jogeshes to superiority. The character of Jogesh is the pivot on which the whole mechanism of the play moves and the weight of its correct impersonation is there calculated to turn the scales one way or the other. Here is a case of Greek meeting Greek. It would however be no discredit to the original Jogesh if he owns his inferiority to the new, nor would we believe, the latter take it as anything but a matter of self-gratulation if he is beaten by the former whom he trained to the part some years ago. The former has the gift of a clear incisive voice and a roundness of delivery while the latter has the advantage of being the author of the piece (not necessarily an advantage in the case of all authors) and of being possessed with the intuitive skill of probing into the depths of human thought and giving it feeling expression. The former voices the thunder, while the latter emits the lightning of the gloomy atmosphere of the character's life."
—*Indian Mirror*, 1st August, 1895.

স্বর্গীয় অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও তাঁহার "রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর"এ লিখিয়াছিলেন—"প্রথম রাত্রে গিরিশচন্দ্রের যোগেশ দেখিয়া যোগেশের এমন একটা ছাপ আমাদের মনে বসিয়া গিয়াছিল যে অমৃতলালের যোগেশ ইহার পূর্ব্বে আমাদের খুব ভাল লাগিলেও তাঁহার এ বারের যোগেশ সেখানে স্থান পাইল না। অমৃতলালের ছবি গিরিশবাবু একেবারে বদলাইয়া দিলেন। অমৃতলালের কণ্ঠস্বরে এমন একটা সুরের মাধুর্য্য ছিল—যাহা তাঁহার কণ্ঠেই স্বাভাবিক বলিয়া মনে হইত, এবং সত্যই সেটী তাঁহার স্বাভাবিক সম্পদ্‌ই ছিল। আর তাহা নিতান্তই অননুকরণীয়। গিরিশচন্দ্র যে অভিনয় করিলেন তাহাতে কোনো সুরের সংস্পর্শ তো ছিলই না। কিন্তু তথাপি তাহা অমৃতলালের অপেক্ষা চিত্তাকর্ষক ও মর্ম্মভেদী হইয়াছিল। কথার প্রত্যেক ভঙ্গিতে, চালচলনে, ভাবের অভিব্যক্তিতে, বয়সে, আকারে, গাম্ভীর্য্যে গিরিশচন্দ্রের যোগেশের পার্শ্বে অমৃতলালের যোগেশ ক্ষীণপ্রভ হইয়া পড়িল। মনে হইল একজন যেন যথার্থই যোগেশ, আর একজন যেন যোগেশ সাজিয়াছে।"

গ্যারিকের অভিনেতৃ-জীবনেও তাঁহার শিষ্য ব্যারীর সঙ্গে এইরূপই একটি প্রতিযোগিতা সংঘটিত হইয়াছিল। গ্যারিক Hamlet, Macbeth, Othello, Benedick ও Henry IIএর ভূমিকায় অদ্বিতীয় হইলেও, ব্যারী Romeoর ভূমিকায় অধিকতর প্রশংসালাভ করিতে সমর্থ হন। প্রথমতঃ গ্যারিকের চেহারায় Romeo মানাইত না, তারপর ব্যারীর চালচলন প্রেমিকের কোমলতায় পরিপূর্ণ ছিল (Barry was as much superior to Garrick as York Minister is to Methodist Chapel). ফলে এই হয় যে "রোমিও জুলিয়েটের"

অভিনয় গ্যারিককে কিছু দিনের জন্য বন্ধ রাখিতে হয়। কিন্তু তিনি ইহার শোধ লইলেন লীয়রের ভূমিকায় অপূর্ব্ব অভিনয়ে। তাঁহার মর্ম্মভেদী কথায়—

"I tax not you, you elements with unkindness ; I never gave you kingdom, called you children, you owe me no subscription."—

এমন করুণরস প্রবাহিত হয়, আর—

"That she may feel how sharper than a serpent's tooth it is to have a thankless child."

এই অভিসম্পাত-বাণীর 'that she may feel' ইত্যাদি বাক্যটি গ্যারিক একবার খাদে বলিয়া ওই পঙ্‌ক্তিটি পুনর্ব্বার অতি তীব্রস্বরে এমন মর্ম্মভেদী ভাবে উচ্চারণ করিয়াছিলেন যে সমগ্র দর্শকবৃন্দ ছন্দোবন্দে গ্যারিকের প্রশংসাবাদ করিতে লাগিলেন—

"The town has found out different ways
To praise its different Lears—
To Barry it gives loud huzzas,
To Garrick only tears.

A king, aye, every inch a king—
Such Barry doth appear,
But Garrick's quite another thing
He's every inch King Lear."

গ্যারিকের ন্যায় গিরিশের অবশ্য শিষ্যের কাছে কখনও পরাভব স্বীকার করিতে হয় নাই। এক্ষেত্রে শিষ্য বরং গুরুর কাছে পরাজয় স্বীকার করিতে খুব গৌরব বোধই করিয়াছিলেন। আর একবার সুদর্শন দৃপ্তযুবক অমরেন্দ্রনাথ দত্তও সীতারামের

ভূমিকায় বিজয়ী হইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তিনিও প্রৌঢ়, 'স্থবির' গিরিশচন্দ্রকে পরাভূত করিতে পারেন নাই।

পূর্ব্বোক্ত গুরুশিষ্য-সংগ্রামের পরের বৎসর হইতে অমৃতলাল দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত যোগেশের ভূমিকায় আর অবতীর্ণ হন নাই। একবার মাত্র ১৯০৭ সালে যখন অমর দত্ত মহাশয় ষ্টারের অ্যাসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার হইয়া আসেন, তাঁহারই একান্ত অনুরোধে মিনার্ভার সহিত প্রতিযোগিতায় নামিয়াছিলেন, কিন্তু দুরন্ত ব্যাধি তখন তাঁহাকে অধিকার করিয়া বসিয়াছে, কাল ক্যানসার রোগে সুকণ্ঠ অমৃতলাল তখন বিকৃতকণ্ঠ। বলা বাহুল্য এক্ষেত্রেও গিরিশ পূর্ব্বানুরূপ যশোর্জ্জনই করেন।

গিরিশ যোগেশ-ভূমিকার কিঞ্চিদাভাস স্বরচিত একটি প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন, পাঠকের অবগতির জন্য এখানে তাহা উদ্ধৃত করিলাম—

"প্রসঙ্গক্রমে বলিতে হইতেছে, সহৃদয় দর্শক বর্ত্তমান প্রবন্ধকারের অভিনয়ের অনেক স্থলে প্রশংসা করিয়াছেন। কাশিমবাজারে 'প্রফুল্ল' নাটকের অভিনয়ের কথা উল্লেখ করিতেছি। যখন যোগেশ সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে, পণিকের নিকট মদের পয়সা-প্রার্থী, স্ত্রীকে রাস্তায় পড়িয়া মরিতে দেখিয়াছে ও বলিয়াছে 'আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল।'—তাহার পর ভগ্নহৃদয় ও মদ্যপানে জীর্ণদেহ যোগেশ সাজিয়া যখন আমি বাহির হইয়াছিলাম ও পা টানিয়া চলিয়াছিলাম, তখন আমার এই গমন-ভঙ্গী কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী লক্ষ্য করেন। অভিনয়ান্তে তিনি ঐরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত একব্যক্তির নাম করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করেন—আমি তাহাকে দেখিয়াছি কি না? আমি 'না' উত্তর করায় মহারাজা বলেন, 'আপনার চলন

ঠিক তাহারই অনুরূপ হইয়াছিল।' এই প্রশংসায় আত্মতৃপ্তি জন্মিয়াছিল, কারণ আমি যাহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, তাহা লক্ষিত হইয়াছিল।"

গিরিশ যখন অভিনয় করিতেন, মনে হইত যেন তিনিই যোগেশ ঘোষ, লোকে নাটকীয় যোগেশের কথা ভুলিয়া যাইত। যখন বলিতেন, "রমেশ, ব্যাপারীদের কি মর্গেজখানা দেখিয়েছ?"

রমেশ—আজ্ঞে না দেখিয়ে আর করি কি? এখনই সাতখানি injunction আস্‌তো—

তখন গিরিশের "তবে জোচ্চর হয়েছি" বলার সঙ্গে সঙ্গেই মুখখানি যেন বিষাদের গাঢ় কালিমায় আচ্ছন্ন হইয়া যাইত।

"আমিই তোমায় লাথি মেরে, মেরে ফেলেছি" ও সঙ্গে সঙ্গে "আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল" কথায় মনে হইত যে যোগেশ কি গভীর শোকসাগরে মগ্ন, কিন্তু মমতা বা করুণার লেশমাত্র তখন তাহার নাই, সব যেন শুকাইয়া জমাট হইয়া গিয়াছে।

যখন বলিতেন, "কোন্ যোগেশ? একি সে?" তখন মনে হইত নিজেকেই খুঁজিয়া যেন পাইতেছেন না। যখন বলেন, "যেদো ধর্ ধর্, তোর কাকাবাবুকে ধর্," দর্শক বুঝিত যে যোগেশ রমেশকে চিনিতে পারিয়াছেন। গিরিশের অভিনয়ে মনে হইত যে মদ্যপান করিয়াও তাঁহার সম্পূর্ণ জ্ঞান ছিল, তিনি সবই বুঝিতেন, সবই বলিতেন, কিন্তু কাজ করিতে আর চেষ্টা ছিল না, নৈরাশ্যে গা ঢালিয়া দিয়াছিলেন। এই যে নৈষ্কর্ম্ম ও আত্মবিক্রয় ইহা হরিশের চরিত্র অপেক্ষা স্বতন্ত্র। হরিশের অধৈর্য্যে tragedy সংঘঠিত হইলেও হরিশ কখনও আপনাকে বিসর্জ্জন দেন নাই। এই পার্থক্য গিরিশের অভিনয়েই সম্পূর্ণ

পরিস্ফুট হইত। স্বর্গীয় মহেন্দ্র বসুর হরিশের অভিনয় খুব হৃদয়গ্রাহী হইত। কেহ কেহ মনে করিতেন তাঁহার হরিশ অমৃত মিত্র অপেক্ষাও ভাল হইত, যখন বলিতেন "ঐ বাজ্ পড়ছে।" মনে হইত যেন সত্যই বাজ পড়িতেছে।

কিন্তু হরিশের দুঃখ এবং অপমানেও এই অদম্য বৈশিষ্ট্য গিরিশের ন্যায় তাঁহাতেও বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হইত না। খুন করিতে গুলি ছুড়িবার পরে যখন আসিয়া বলেন, "চুপ" —সে চেহারা ও ভাবভঙ্গী কেহ কল্পনাও করিতে পারেন না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ষ্টারে হরিশের ভূমিকা গ্রহণ করিতেন অমৃত মিত্র। ১৮৯৭ সালে গিরিশ প্রথমে হরিশের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন—ষ্টারেই অমৃতলালের অনুপস্থিতির সময়। অতঃপর মিনার্ভায় রিহার্সেলের সময় (১৯০৫) তারাসুন্দরী প্রভৃতি তাঁহার অত্যদ্ভুত অভিনয় দেখিয়া বলেন, 'মশায়, এসব জিনিষ সচরাচর দেখান না কেন?"

উত্তরে গিরিশ বলেন, "আমি যদি সর্ব্বদাই এরূপ দেখাই, তা হ'লে তোরা থাকিস্ কোথায়? আমার নিজের বিদ্যা দেখাবার তো দরকার নাই, আমার উদ্দেশ্য তোদের সকলকে মানুষ ক'রে থিয়েটার আরও লোকপ্রিয় ক'রে তোলা।"—

এইরূপ মনোভাবও পূর্ব্বোক্ত ১০বৎসর পর্য্যন্ত (১৮৮৩-৯২) থিয়েটারে ভূমিকা গ্রহণ না করিবার অন্যতম কারণ।

করুণাময়ের ভূমিকায় এই জীবন-সংগ্রাম আরও মূর্ত্ত হইয়াছে। সংগ্রামে সংগ্রামে যখন তিনি বিকৃতমস্তিষ্ক, সদসদ্-বিচারে অক্ষম, তখনই আপনাকে আয়ত্তে রাখিতে পারেন নাই। উভয় অবস্থারই অভিনয় অতি জাজ্বল্যপূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করিত। গিরিশ করুণাময়ের ভূমিকায় অভিনয় করিতেন

অত্যন্ত কলাসম্মতভাবে এবং গভীর ভাব লইয়া। চতুর্থ অঙ্কে হিরণ্ময়ীকে সম্মুখে দেখিয়া "যাও উনুন থেকে পাঁশ বেড়ে নিয়ে এসো, ক'জনে ব'সে খাবো কিনা" বলিয়া তিরস্কার করিয়া কাজে বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। আসিয়া দেখিলেন হিরণ্ময়ী মৃতাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে, যাহারা তাহাকে জল হইতে গলায় কলসীবাঁধা অবস্থায় লইয়া আসে, তাহারা তাহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত, সরস্বতী মেয়ের কাছে 'হিরণ রে' বলিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে ;—করুণাময় প্রবেশ করিয়া "এই যে খুঁজে পাওয়া গিয়েছে, তাইতো বলি আমার শান্ত মেয়ে—রাস্তায় যাবে না, লজ্জাশীলা রাস্তায় যাবে না" বলিতে বলিতে আসিয়া যখন দাঁড়াইতেন, দর্শক তখনই অশ্রুসংবরণ করিতে পারিত না। আবার যখন "মা, মা, অন্ন দিতে পারি নাই, এই যে আকণ্ঠ জলপান করেছ !" বলিয়া ঘূর্ণিতাবস্থায় বসিয়া পড়িতেন এবং পরক্ষণেই গভীর শোকে শুষ্ককণ্ঠে সান্ত্বনা-নিরত যুবকগণকে বলিতেন, "বাছা মরেছে কেন জানো, ঘৃণায় মরেছে.........আমিই দেখে শুনে বিবাহ দিয়ে ছিলুম, জরাজীর্ণ স্থবির জেনে বিবাহ দিয়েছিলুম, বিধবা হবে জেনে দিয়েছিলুম—বিধবা হ'য়ে আমার বাড়ী এল, আমি ছাই খেতে বল্লুম !" বলিয়া এক একটা কথা বলিতেন, মনে হইত যেন অশ্রুধারা নয়, চক্ষু হইতে রক্ত মোক্ষণের উপক্রম হইয়াছে। তাহারই বাক্যবাণে জর্জরিত হইয়া কন্যা যে আত্মহত্যা করিয়াছে, এই ভাবটি অভিনয়ে অতি উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিত। আর গিরিশচন্দ্রের একটি দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে দর্শকগণের চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিত, কিন্তু তাঁহার চক্ষে এক ফোঁটা জলও দেখা দিত না। এই দৃশ্যে গিরিশচন্দ্রের অভিনয়-সম্বন্ধে অপরেশচন্দ্র বলিয়াছেন,

"তখন তাঁহার দেহের সমস্ত রস যেন শুকাইয়া গিয়াছে, শোণিতপ্রবাহ স্তব্ধ, নিষ্পলক নেত্রে জমাট বাঁধা মেঘ, কণ্ঠস্বর শুষ্ক, ভগ্ন, গভীর।" গিরিশচন্দ্র এই দৃশ্যে গভীর শোকের চিহ্নস্বরূপ অশ্রুধারা ফেলিতেন না কেন, তৎসম্বন্ধে তিনি নিজেই বলিয়াছেন, "করুণাময় যদি এই দৃশ্যে কাঁদে, তা হ'লে আর সে গলায় দড়ি দিতে পারে না।" রূপচাঁদের দপ্তরখানায় মত্ত অবস্থায় কন্‌ট্রাক্ট সহি করা, বেলিফের হস্তে ধৃত ও লাঞ্ছিত হইয়া তাঁহার বেদনাময় উক্তি, মাতাল মোহিতকে দেখিয়া ঘৃণার অভিব্যক্তি এবং আত্মহত্যার দৃশ্য প্রভৃতিতে অতি উচ্চ অঙ্গের অভিনয়-কৌশল প্রদর্শিত হইত। প্রত্যেক ভাবে ও কথায় তাঁহার expression (মুখ-ভাব) বদলাইয়া যাইত। জ্যোতির বিবাহ-সভায় যেন ঠিক বিব্‌ভুল হইয়া যাইতেন। তাঁহার অভিনয়-কৌশলের আর একটি বিশেষত্ব ছিল, তিনি কখনও চীৎকার করিতেন না। মেট্রোপলিটান ইন্‌ষ্টিটিউশনের প্রিন্সিপাল সুপণ্ডিত এন্. এন্. ঘোষ মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত ইণ্ডিয়ান্ ন্যেশন কাগজে লিখিয়াছিলেন (১৪ই আগষ্ট ১৯০৫)—

"The play is an intensely realistic tragedy. Babu Girish Chandra Ghosh, the talented author of the play, plays the part of Karunamay to the perfection."

'বলিদানে' করুণাময়ের ভূমিকায় গিরিশচন্দ্রের অভিনয় দেখিয়া সুবিখ্যাত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বলিয়াছিলেন, "সার হেনরি আর্ভিংকে দেখেছি, গিরিশবাবুর অভিনয় তাঁর চেয়েও অদ্ভুত। সামাজিক নাটকে এরূপ বস্তুতন্ত্র-বিষয়ীভূত ব্যাপারে সার হেনরি গিরিশবাবুর ন্যায় কিছুতেই পারিতেন না।"

করুণাময়ের ভূমিকায় অর্দ্ধেন্দুশেখর, অমৃত বসু, অমর দত্ত, সুরেন্দ্র ঘোষ ও চুনীলাল দেব মহাশয়দের অভিনয়ও ভাল হইত কিন্তু গিরিশের হইত অননুকরণীয় এবং আর সকলের মধ্যে অর্দ্ধেন্দুবাবুরই হইত তাঁহার পরে।

আর যোগেশের ভূমিকায় গিরিশচন্দ্র এবং অমৃতলাল ভিন্ন অর্দ্ধেন্দুশেখর, অমরেন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ, প্রবোধ ঘোষ প্রভৃতিও ঐ ভূমিকায় সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তবে গিরিশের সহিত অন্য কাহারও তুলনা হয় না।

বস্তুতঃ যোগেশ এবং করুণাময়ের অভিনয়ে গিরিশ নিজেকেই নিজে ছাড়াইয়া যাইতেন।

Serio Comic অভিনয়েও গিরিশের কৃতিত্ব কম পরিলক্ষিত হইত না। দুই-একটি দৃষ্টান্ত দিয়াই এই অধ্যায় শেষ করিব।

মিনার্ভা থিয়েটারে 'জনা' নাটকের অভিনয়ে তিন রাত্রি বিদূষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবার পর অর্দ্ধেন্দুশেখর এমারেল্ড থিয়েটারে চলিয়া যান। এই ভূমিকায় অর্দ্ধেন্দুশেখর এত যশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন যে তিনি হঠাৎ চলিয়া যাওয়ায় গিরিশ-চন্দ্রকে একটু ভাবনায় পাড়তে হইয়াছিল। অবশেষে তিনি নিজেই এই ভূমিকায় অবতীর্ণ হইলেন। রহস্যপূর্ণ শ্লেষোক্তিতে গিরিশচন্দ্রের অভিনয়ে এমন ভক্তিরস ফুটিয়া উঠিত যে অতঃপর অর্দ্ধেন্দুশেখরের বিদূষককে অত্যন্ত তরল প্রকৃতির বলিয়া মনে হইত।

"নাম কিনা কংসারি, দানবারি, আরির একেবারে কেয়ারি!"

"যদি ঐহিক সুখ চাও, হরির নাম যেথা হয় কাণে আঙুল দাও।"

গিরিশচন্দ্রের বিদূষকের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া

শ্রোতৃবর্গ হাসিতেন বটে কিন্তু ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মতই তাঁহার অন্তরালে লুক্কায়িত ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া তাঁহারা আনন্দাশ্রুও বর্ষণ করিতেন। বিদূষকের ভূমিকায় গিরিশ-চন্দ্রের অভিনয় স্মরণ করাইয়া দেয় তাঁহার সেই মূর্ত্তি, যে মূর্ত্তিতে তিনি অন্তরে অসীম ভক্তি অথচ বাহিরে রুদ্রভাব লইয়া তাঁহার গুরুদেবকে আহত করিতেন। বিদূষকের ভূমিকায় গিরিশ-চন্দ্রের অভিনয় দেখিয়া সকলে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন। তবে এ কথা ঠিক যে আবুহোসেনের কি জলধরের ন্যায় হাস্য-রসিকের ভূমিকায় গিরিশচন্দ্র হয়ত অর্দ্ধেন্দুশেখরের মত সাফল্য লাভ করিতে পারিতেন না।

আর একটি চরিত্র করিম চাচা। এমন হাস্যরসিক, প্রভুভক্ত এবং স্বদেশানুরাগী চরিত্র বড় বিরল। এক সঙ্গে হাসি-কান্নার অভিনয় করা অসাধারণ ক্ষমতার পরিচায়ক। করিম চাচার ভূমিকায় গিরিশচন্দ্রের অভিনয়ে দর্শকের মুখে হাসি ফুটিত বটে কিন্তু চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া যাইত। তিনি যখন বলিতেন, "জুতার মর্ম্ম তখন বুঝি নাই" শ্রোতৃবর্গ হাসিলেও তাহাদের নয়ন অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিত। "জনাব্ এ বাঙ্গালার তিন জনের যদি দু'মত দেখাতে পারেন তবে নাকে খত দিয়ে আফিং খাওয়া ছেড়ে দিব," "বেইমানীর সাজা থাক্‌লে সারি সারি মুণ্ড গড়াতো" প্রভৃতি গিরিশচন্দ্র এমনি ভাবে বলিতেন যে দর্শকগণ হাসিয়া উঠিত বটে, কিন্তু পরক্ষণেই অশ্রুতে তাহাদের চক্ষু ভরিয়া উঠিত। সুহৃদ্বর অবিনাশবাবু বলেন, "সিরাজদ্দৌলাকে পলায়নের সুযোগ প্রদানের নিমিত্ত করিম চাচা যখন নবাবের সহিত পোষাক বদল করিলেন এবং নবাব প্রস্থান করিলে স্বয়ং নবাবের বেশে গমনকালে পুনরায় পশ্চাতে চাহিয়া সিরাজের উদ্দেশে

সিংহাসনকে তিনবার কুর্নিস করিতেন—তখনকার গিরিশচন্দ্রের ভক্তিকরুণরস মিশ্রিত সেই নির্ব্বাক্ অভিনয়-দর্শনে কেহই অশ্রুসংবরণ করিতে পারিতেন না।”

শুনিয়াছি গিরিশচন্দ্রের কঞ্চুকি ভূমিকায়ও ভক্তের বিশ্বাস অতীব আশ্চর্য্যভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। বিল্বমঙ্গলের সাধক চরিত্রেও ভণ্ডসাধুচরিত্র আশ্চর্য্যভাবে প্রদর্শিত হইত। আবার সেবাধর্ম্মপরায়ণ রঙ্গলাল চরিত্রেও গিরিশচন্দ্র এমন রহস্য-জড়িত গভীর ভাব ও দেশাত্মবোধ ফুটাইয়া তুলিতেন যে তাহার তুলনা আর কোথাও মিলে না। এই চরিত্রের অভিনয়ে গিরিশচন্দ্র যে দক্ষতা প্রদর্শন করিতেন তাহা সত্যই বিস্ময়কর।

রামকৃষ্ণ অবতার চিন্তামণির অভিব্যক্তিও অতি সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিত। চিন্তামণি বলিতেছেন “নাহং নাহং নাহং তুঁহু তুঁহু তুঁহু” গিরিশচন্দ্রের অদ্ভুত ভাবে যেন দর্শক একেবারে স্তম্ভিত হইয়া যাইত। গিরিশ-চিন্তামণির নিকটে কালাপাহাড়-বেশী দক্ষ অমৃতলালও নিষ্প্রভ হইয়া যাইতেন।

মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্ব্বে, গিরিশ মিনার্ভায় ‘চন্দ্রশেখরে’ চন্দ্রশেখরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতেন। প্রবাস-প্রত্যাগত হইয়া বাড়ীতে যখন দেখিলেন বন্দুক, লাঠি মশালের চিহ্ন বর্ত্তমান, ভৃত্য আসিয়া যখন দুঃসংবাদ দিল, তখন “শৈবলিনী নাই” বলিয়া যে ভূমিতে বসিয়া পড়িতেন তাহা দেখিয়া দর্শক বিস্ময়ে একেবারে অভিভূত হইত।

আমরা সংক্ষেপে গিরিশচন্দ্রের নাট্য ও অভিনয় প্রতিভার আলোচনা করিলাম। শিক্ষাপ্রদানেও তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। নাট্যাচার্য্য অমৃত বসু বলিতেন, “অর্দ্ধেন্দু ছিলেন School Master, গিরিশ কলেজের প্রোফেসার”—অর্থাৎ ছোটখাট

বিষয়ে তিনি বিশেষ মাথা ঘামাইতেন না, কিন্তু উচ্চকলা সম্বন্ধে শিক্ষার বিরাম ছিল না। যাহাকে দেখিতেন উচ্চকলা ধরিতে পারে না, তিনি বলিতেন, 'তুমি যে রকম করিতেছ তাহাই কর, এখন শিক্ষা দিলে তুমি পারিবে না, আর তোমার নিজেরটাও নষ্ট হইবে।" লেডী ম্যাক্‌বেথ স্বামীর পত্রখানি লইয়া কি ভাবে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিবে সেই postureটি নাকি তিনকড়ি দাসীকে প্রায় শতাধিকবার দেখাইয়াছিলেন। ক্লাইভের "Charge, bayonets charge," কথাটি ক্ষেত্রবাবুকে প্রায় পোনর বার দেখাইতে হইয়া ছিল। শিক্ষাদান-বিষয়ে তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা-সম্বন্ধে আমি গিরিশ-প্রতিভায় আলোচনা করিয়াছি। এক অর্দ্ধেন্দুশেখর ব্যতীত বঙ্গরঙ্গমঞ্চের সকল অভিনেতাই ছিলেন গিরিশের ছাত্র। প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াও অমৃত বসু মহাশয় সর্ব্বদাই তাঁহাকে সেই সম্মান দিতেন—

"সাথী, মিত্র, গুরু, তুমি, প্রণমি লুটায়ে ভূমি
চিরশিষ্য-তরে স্থান কিছু রাখিও চরণে।"

গিরিশচন্দ্র ধর্ম্মদাস সুর মহাশয়ের দ্বারা বৈজ্ঞানিক উপায়ে দৃশ্যাদির উন্নতি বিধানে যত্নবান্ ছিলেন। সুরসংযোজনায় তিনি মদন বর্ম্মণ, রামতারণ সান্যাল, দেবকণ্ঠ বাগ্‌চী প্রভৃতির সহায়তা লইতেন। নৃত্যাদি-শিক্ষা-পরিচালনায়ও রামতারণ সান্যাল, কাশী চট্টোপাধ্যায়, রাণুবাবু ও নৃপেন বসু প্রভৃতি গিরিশচন্দ্রকে সাহায্য করিতেন। Make-upএর দিকেও তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। নাট্যশালার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিই তাঁহার কাম্য ছিল। কিন্তু এক জীবনে তাহা সর্ব্ববিষয়ে সুসম্পন্ন করা সাধ্যায়ত্ত নয়। আজকাল Make-up প্রভৃতি বিষয়ে আরও উন্নতি হইতেছে। দৃশ্যপটও এখন ক্রমেই ভাল হইতেছে।

গিরিশ বরাবরই ভাব-গভীর নাটক লিখিতেন, তিনি রঙ্গালয়কে ধর্ম্মমন্দির ও জাতীয় শিক্ষায়তনে পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন। এক সময়ে তাহা হইয়াছিলও ; কিন্তু মাঝে শ্লেষাত্মক প্রহসনাদিতে রঙ্গালয়ের গাম্ভীর্য্য ক্ষুন্ন হয়। 'ক্ল্যাপ' ও 'এনকোরের' প্রাবল্য হইল, রঙ্গালয়ে চটুলতা প্রবেশ করিল, গিরিশ ক্ষুব্ধ হইলেন। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও ষ্টারের স্বর্গীয় অমৃত বসু প্রমুখ অধ্যক্ষগণ রঙ্গমঞ্চে শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে যত্নের ত্রুটী করেন নাই। অতঃপর স্বর্গীয় অমর দত্ত 'আলিবাবা' প্রভৃতি গীতিনাটক ও নানারূপ চটুল প্রহসনে ষ্টেজের আবহাওয়া সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলেন। এই সময়েও গিরিশ 'ভ্রান্তি', 'সৎনাম', 'পাণ্ডবগৌরব', 'সিরাজদ্দৌলা', 'মিরকাশিম', 'শাস্তি কি শান্তি' প্রভৃতি ভাব-বহুল নাটক লিখিয়া জাতির সেবা করিতে ত্রুটী করেন নাই। ইতিমধ্যে গিরিশ অসুস্থাবস্থায় যখন বারাণসীধামে, ষ্টেজের অবস্থা-সম্বন্ধে ষ্টার থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী অমৃত বসু মহাশয় তাঁহাকে লেখেন (১৯১০)—

"আপনার অতুল প্রতিভা ও প্রকৃতি-সিদ্ধ আত্মশক্তি এবং আমার সযত্ন-সেবা বঙ্গীয় নাট্যশালাকে অবজ্ঞার পদাসন হইতে যে গৌরবের সিংহাসনে তুলিয়াছিল, সে সিংহাসন টলটল করিতেছে, বর্ত্তমান নটকুল আপনার মাথা আপনি কাটিতেছে আর 'শিক্ষিত' বঙ্গীয় দর্শককুল তালি বাজাইয়া সেই মস্তক ভক্ষণ করিতেছেন আর দিগ্বিজয়া নাট্যকারগণ নিত্য নূতন ছুচোঁবাজি ছাড়িয়া রঙ্গমঞ্চ আলোকিত করিতেছেন। এসময়ে আপনার স্বাস্থ্যভঙ্গ রঙ্গভূমির পক্ষে অমঙ্গলের উপর অমঙ্গল।"

প্রত্যুত্তরে গিরিশ তাঁহাকে লেখেন—

"থিয়েটারের উন্নতি-অবনতি লইয়া এখন আর আক্ষেপ

করা বৃথা। আমার দ্বারা আর থিয়েটারের উন্নতি হইবার সম্ভাবনা কি? নাটক লেখা হইতে পারে, ভগবানের কৃপা থাকিলে উৎকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্টতর নাটক হইতে পারে [১] কিন্তু থিয়েটারের উন্নতি আর আমার দ্বারা সম্ভব নয়।............... সময় চলিয়া গিয়াছে, আরতো ফিরিয়া পাইবার নয়। Audience-এর হাততালিতে নাটকের গুণাগুণ-বিচার প্রথম 'ষ্টারে'ই হয়। 'ষ্টার' পথপ্রদর্শক হওয়ায় অন্য থিয়েটার পথ পাইল; এবং ক্রমে ক্রমে তাহাই চলিবে, নিবারণ কে করে! ধরো—যদি এখন একটি উৎকৃষ্ট নাটক হয়, তাহা অভিনয় কে করিবে? শিক্ষিত অভিনেতা অভিনেত্রী কয়জন আছে? যদি না থাকে, নাটক সাধারণে কিরূপে বুঝিবে? যে অঙ্গের নাটক হইতেছে তাহা সাধারণে বোঝে, অভিনেতা অভিনেত্রীও সেই নাটকের উপযুক্ত, সুতরাং সে সকল নাটক আর সাধারণের নিকট ছুঁচোবাজী নয়, উৎকৃষ্ট তুবড়ি। কে এমন Proprietor আছে যে বসিয়া বসিয়া শিক্ষিত দল প্রস্তুত করিবে? কে শিক্ষক আছে শিখাইবে? এখন উন্নতির আশা কল্পনা করা স্বপ্নে রাজা হওয়ার ন্যায়। অনেক শিক্ষা তুমি আমার নিকট পাইয়াছ, আমার আর একটি কথা শুন—এক যজ্ঞে দুই ফল কখনও হয় না। আয়াস, মান, কর্ত্তৃত্বভার—এ সকল সৎকার্য্যের বিষম অন্তরায়, ইহারা বিবাদ সৃষ্টি করিতে পারে, কিন্তু কার্য্যের হন্তারকই হয়।"

এই দুইখান পত্র হইতেই গিরিশচন্দ্রের রঙ্গমঞ্চ সাধনার আভাস পাওয়া যায়। গিরিশ বঙ্গরঙ্গমঞ্চ গঠন করিয়াছেন,

১ ইহার পরেও শ্রেষ্ঠ দুইখানি নাটক 'অশোক' ও 'তপোবল' রচিত ও অভিনীত হয়।

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীকাল অমরনাট্যগ্রন্থে উহাকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছেন, এবং উহার আদর্শ সম্বন্ধে এইরূপ উচ্চভাব পোষণ করিতেন। অমৃত বসু মহাশয়ও বলিতেন—"কার্য্যক্ষেত্রে আমরা ছিলাম মজুর, আর গিরিশচন্দ্র ছিলেন রাজমিস্ত্রী, আমরা তাঁহাকে তাগাড় মাখিয়া দিয়াছি আর তদ্দ্বারা তিনি যে অপূর্ব্ব সৌধচূড়া নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন তাহা চিরকাল তাঁহার কীর্ত্তিকথা ঘোষণা করিবে।" কিন্তু, হায়! নাট্যজ্যোতিষ্কমণ্ডলের মধ্যাহ্ন-ভাস্কর আজ চিরাস্তমিত। উজ্জ্বল নক্ষত্ররাজিও ক্রমে ক্রমে ম্লান ও অপসৃত হইতেছে. নাট্যশালায় আর দীপশিখা এখন জ্বলে না, তমসা আসিয়া উহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, গিরিশ-সৃষ্টি কি বিলুপ্ত হইবে?

আবার কবে সেই আলোকরশ্মি দীপ্ত হইয়া উঠিবে? আবার কবে বাঙ্গালার এই গৌরবময় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি গড়িয়া উঠিবে? আমরা সে দিনের প্রতীক্ষায়ই বসিয়া আছি।

সঙ্গীত-রচনায় গিরিশ

চতুর্থ অধ্যায়

সঙ্গীত-রচনায়ও গিরিশের অসাধারণ শক্তি ও আন্তরিকতা পরিলক্ষিত হইত। তাঁহার নাটকে অসংখ্য গান রচনা করিয়া তিনি উহা সকলের হৃদয়গ্রাহী করিয়াছেন। গানগুলি খাঁটি বাঙ্গালার গান। প্রায় সকল সঙ্গীতেই বাঙ্গালার প্রাণের পরিচয় পাওয়া যায়। অধিকাংশ গানই ভক্তি ও প্রেমরসাশ্রিত।

একদিন চণ্ডীদাস ও রামপ্রসাদ যে সুরের তালে বাঙ্গালার মাঠঘাট ঝঙ্কৃত করিতেন, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, দাশরথি রায়ের যে গানে ভক্তহৃদয় বাঙ্গালীর প্রাণ আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিত, যে গানে বঙ্গবাসী নানা কর্ম্মের ভিতরেও মায়ের সান্ত্বনা পাইত, হায়! জাতীয়ভাববর্জ্জিত যুগে বহুদিন আমরা সে গান আর শুনি না, শুনিতে চাইও না। আমরা যেন সবই হারাইয়াছি, বাঙ্গালীর সব সম্পদই খোয়াইয়াছি। বাঙ্গালী কবির নামও যেন বিস্মৃতির অতলগর্ভে বিলীন হইয়াছে।

এই দুর্দ্দিনেও গিরিশের মুখে বাঙ্গালী আবার একদিন বাঙ্গলার গান শুনিয়াছিল। রামপ্রসাদের ধারা আবার গিরিশ-চন্দ্রে জাগিয়া উঠিয়াছিল। এ সম্বন্ধে বাঙ্গালার গীতিকবিতার অপূর্ব্ব সমালোচক ভক্ত চিত্তরঞ্জনের কথাই বার বার আমাদের কাণে ঝঙ্কৃত হইতেছে—

“গিরিশচন্দ্রকে আমি মহাকবি বলি কেন? যার কবিতায় ধর্ম্ম নাই, সে কবি অধিক দিন বাঁচে না। মহাকবি বলি কাকে? যাঁর কবিতায়, যাঁর রচনায়, যাঁর সঙ্গীতে জাতীয়তা

আছে, ধর্ম্ম আছে তাহাকেই বলি মহাকবি। চণ্ডীদাস হইতে ঈশ্বর গুপ্ত পর্য্যন্ত আমি আমার “নারায়ণ” পত্রে দেখাইয়াছি—কবিতার মধ্যে জাতীয়তার কত বার উত্থান-পতন হইয়াছে। চণ্ডীদাসের পর মহাপ্রভুর সময়ে এই ভাব বিশেষ জাগিয়া তাহার পরে আবার ভারতচন্দ্রের সময়ে অনেকটা মলিন হইয়া যায়। পরে রামপ্রসাদে আবার জাগিয়া উঠে—আবার বহুদিন পরে গিরিশচন্দ্রে তাহা জাগিয়া উঠিয়াছিল।”

রামপ্রসাদের ন্যায় গিরিশচন্দ্রও ছিলেন শাক্ত কবি। রামপ্রসাদ বলিতেন—

“প্রসাদ কভু ভয় করে না মায়ের অভয় পদের জোরে।”

গিরিশও বলিতেন –

নেচে নেচে চল্ মা শ্যামা
দুজনে তোর সঙ্গে যাবো,
দেখ্‌বো রাঙ্গা চরণ দুটী
বাজ্‌বে নুপূর শুন্‌তে পাবো।
ঘোর আঁধারে ভয় বা কারে ?
ডাক্‌বো শ্যামা অভয় যারে
ওমা ব'লে যাবো চ'লে
মা ব'লে মোর প্রাণ জুড়াবো॥

গিরিশ বলিতেন “বেটীকে গাল ভ'রে চেঁচিয়ে যা চাইবো, তাই পাব।” চাহিলেই পাইতেন বলিয়াই সব ভার তাঁহার উপর দিয়াই নিশ্চিন্ত হইয়া গিরিশ গাহিতেছেন—

আমায় নিয়ে বেড়ায় হাত ধ'রে ;
যেখানে যাই সে যায় পাছে,
আমায় ব'ল্‌তে হয় না জোর ক'রে।

মুখখানি সে যত্নে মুছায়,
আমার মুখের পানে চায়,
আমি হাস্‌লে হাসে,
কাঁদ্‌লে কাঁদে—
কত রাখে আদরে।
আমি জান্‌তে এলাম তাই
কে বলে রে আপন রতন নাই
সত্যি মিথ্যা দেখ্‌না কাছে
বল্‌ছে কথা সোহাগ ভ'রে ॥

মা জগজ্জননী রামপ্রসাদকে কন্যাবেশে বেড়ার বাঁধিয়া দিয়াছিলেন, আর গিরিশচন্দ্রও মায়ের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন।

আবার অন্যত্র শ্যামাভক্ত গিরিশ অভিমান-ভরে গাহিতেছেন—

মা বলে মা ডাক্‌ছি কত—
বাজে না কি মা তোর প্রাণে ?
পাষাণী পাষাণের মেয়ে,
বাবা ব'লে ডাক্‌বো এবার প্রাণ যদি না মানে।

ঠিক রামপ্রসাদও এই ভাবেই গাহিতেন—

"রামপ্রসাদ বলে এবার মোলে
ডাক্‌বো সর্ব্বনাশী বলে।
তুমি গো পাষাণের সুতা
আমার যেম্নি পিতা তেম্নি মাতা।"

অন্যত্র আবার গিরিশ আনন্দ-ভরে গাহিতেছেন—

আমার পাগল বাবা পাগ্‌লী আমার মা,
আমি তাদের পাগলী মেয়ে, আমার মায়ের নাম শ্যামা।

রামপ্রসাদের ন্যায় গিরিশও প্রকৃত ভক্ত ছিলেন, তাঁহার নিকট শাক্ত-বৈষ্ণবের প্রভেদ কোথায়? প্রকৃত ভক্ত শ্যামার ভজন করিতে করিতে শ্যামমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করেন। গিরিশের 'ব্রজ বিহারে' শ্রীরাধার মুখে এইরূপ সঙ্গীতে পাষণ্ডেরও হৃদয় বিগলিত হয়—

ধরম করম সকলি গেল গো, শ্যামাপূজা মম হলো না,
মন নিবারিতে নারি কোন মতে,
ছিছি কি জ্বালা বল' না।
কুসুম-অঞ্জলি দিতে শ্রীচরণে
ত্রিভঙ্গিম ঠাম পড়ে সখী মনে,
পীত বসনে হেরিল নয়নে
ভাবিতে দিগ্‌বসনা।
ভাবি নরমালী কালী অসি-করে,
হেরি বনমালী বাঁশরী-অধরে,
ত্রিনয়না ধ্যানে বঙ্কিম নয়নে
হেরি হই সই বিমনা।
এ কি লো এ কি লো ছলনা!
মোরে নিদয়া হর-ললনা॥

এই গানের সহিত রামপ্রসাদের সেই গানটিই মনে হয়—

"ঐ যে কালী কৃষ্ণ শিব রাম
সকল আমার এলোকেশী;

শিবরূপে ধর শিঙ্গা,
কৃষ্ণরূপে বাজাও বাঁশী;
ওমা রামরূপে ধর ধনু
কালীরূপে করে অসি।"

অন্যত্রও গিরিশ আবার শৈব ও ভাগবতের পার্থক্য বিদূরীত করিয়া গাহিতেছেন—

হরি হরি হরি
হর হর হর !
কায়ে কায়ে মিল্‌লো ভালো……

কখনও বা আমরা চৈতন্যলীলার মধুর সঙ্গীতে বৃন্দাবনের দৃশ্য সম্মুখে দেখিয়া স্তম্ভিত হই—

কাঁহা মেরা বৃন্দাবন, কাঁহা যশোদা মায়ি,
কাঁহা মেরা নন্দ পিতা, কাঁহা বলাই ভাই।
কাঁহা মেরি মোহন মুরলী,
শ্রীদাম সুদাম রাখালগণ কাঁহামে পাই।
কাঁহা মেরি যমুনা তট,
কাঁহা মেরি বংশীবট,
কাঁহা গোপ-নারী মেরি, কাঁহা হামারা রাই।

আবার নিম্নলিখিত গানটিতে ভাগবতের ভক্তিরস উথলিয়া উঠে—

রাই কালো ভালবাসে না,
কালো দেখে বলেছিল কুঞ্জে যেন আসে না।
রূপের বড় গরব করে রাই—
দেখবো এবার মন যদি তার পাই;

এবার গৌর হয়ে ধ'রব পায়ে
আরতো কালো র'ব না।
বড় অভিমানী রাই,
বাঁশী ছেড়ে কেঁদে ফিরি তাই;
যোগিবেশে ফিরবো দেশে ঘরে ত মন বসে না।

আবার নিম্নলিখিত গান আমরা সর্ব্বত্রই শুনিতাম

কেশব কুরু করুণা দীনে কুঞ্জকাননচারী,
মাধব মনোমোহন মোহন মুরলীধারী !
হরি বল হরি বল হরি বল মন আমার···

অন্য দিক্ হইতে এই গানটিও কি সুন্দর—

ঘরে কি নাই নবনী ?
কেন অমন ক'রে পরের ঘরে চুরি করিস্ নীলমণি !

এবংবিধ গান গিরিশ যেখানে-সেখানে প্রচার করেন নাই। তাঁহার বৈশিষ্ট্য ছিল, যে ব্যক্তির মুখে যে সময়ে যে সঙ্গীতটি মানাইত, তিনি স্থানকাল-ভেদে তাহাই রচনা করিতেন। 'মৃণালিনীর' অশিক্ষিতা পাটুনী গাহিতেছে—

আমি নবীন পাটুনী,
কিসে অকূল পাথার হ'ব পার ?
আমার ছোটতরী—বোঝাই ভারী
কূল ছাড়া সই হ'ল ভার।

আবার 'সীতারামের' বিদূষী সন্ন্যাসিনী জয়ন্তী গাহিতেছেন—

উদার অম্বর শূন্য সাগর শূন্যে মিলাও প্রাণ।
শূন্যে শূন্যে ফোটে কত শত ভুবন,

তারকা চন্দ্রমা কত শত তপন।
শূন্যে ফোটে অভিমান,
অহম্ অহম্ ইতি শূন্যে বিভাসিত—
শূন্যে বিকশিত মনোবুদ্ধি চিত,
মদ মাৎসর্য্য ভোক্ত ভোজ্য শূন্য সকলি এ ভাণ।

গানটিতে একেবারে অদ্বৈত জ্ঞানের জ্বলন্ত ছবি। তবে প্রথমটিরও ভাব কম নয়।

আবার কলঙ্ক-ভয়হীন জোবি গাহিতেছে—

কলঙ্ক যার মাথার মণি কোমল প্রাণে তারই সয়।

'অশোকের' দেবীর মুখেও আবার একটি চমৎকার ভাব আরোপিত হইয়াছে—

কিনিছে বিকিয়ে দিয়ে, ধরেছে ধরা দিয়ে,
এ সাধের খেলা দিয়ে-নিয়ে, নয় শুধু নিয়ে;

আবার আত্মত্যাগী ভক্ত কুণাল গাহিতেছে—

নিদারুণ বন্ধন কত দিন সহিব
ত্রিতাপ-দহনে কত দিন দহিব
পান্থবাসে কত রহিব?

গিরিশচন্দ্রের কোন কোন সঙ্গীতে নাটকের গতি বর্দ্ধিত বা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে; যেমন 'বুদ্ধদেব' নাটকে কৃচ্ছ্র সাধনায় তাঁহার দেহ ক্রমশঃই ক্ষীয়মাণ, তাঁহাকে দেহত্যাগের পথ

হইতে ফিরাইয়া আনিয়া মধ্যপথ অবলম্বন করাইতে হইবে, দেববালার মধুরকণ্ঠে গান সংযোজিত হইল—

আমার এ সাধের বীণে
যত্নে গাঁথা তারের হার,
যে যত্ন জানে বাজায় বীণে
উঠে সুধা অনিবার।

বিল্বমঙ্গল যখন "কোথা যাব, কে দেখাবে আলো" বলিয়া দিশাহারা, তখন পাগলিনীর মুখে গুরুবরণের ইঙ্গিত হইল—

আমায় নিয়ে বেড়ায় হাত ধ'রে!

এইরূপ বিল্বমঙ্গল ও চিন্তামণিকে চেতনা দিবার জন্যই টহলদারদিগের সঙ্গীতের অবতারণা—

মিছে আর কেন মায়া
কাঞ্চন কায়া তো রবে না।

আবার মেনকার সম্ভোগে উন্মত্ত বিশ্বামিত্র যখন আত্মবিস্মৃত, একটি ছোটগানে ব্রহ্মণ্যদেব তাঁহাকে আত্মচেতনার ইঙ্গিত প্রদান করেন—

আপনাকে চেন আগে, চিনবে আমায়
তা'রপরে—
দেখ্‌ছো কি এদিক্ ওদিক
দেখো কে আছে ঘরে।

এইরূপ কত গানের নাম করিব। গিরিশের সমস্ত গানই সার্ব্বজনীন।

রাম রহিম না জুদা করো, দিল্‌কো সাঁচ্চা রাখো জী।
হাঁজি হাঁজি ক'রতে রহো, দুনিয়াদারী দেখো জী॥

যেমন হিন্দু-মুসলমান একসঙ্গে গাহিতে পারে, তেমনই সর্ব্বধর্ম্মানুগত ব্যক্তিই সমস্বরে আত্মনিবেদন করিতে পারে—

হে দীনশরণ শরণ বন্ধন মোচন
তাপে তাপ বার' ত্রিতাপ বারণ ॥

রামপ্রসাদের মেনকা যেমন গাহিতেন—

"গিরি এবার আমার উমা এলে
আর উমা পাঠাব না।
বলে বল্‌বে লোকে মন্দ
কারো কথা শুন্‌বো না।"

গিরিশের 'আগমনী' সঙ্গীতও বাঙ্গালীর চিরন্তন ভাবধারা কেন্দ্র করিয়াই প্রবাহিত।

কুস্বপনে দেখেছি গিরি,
উমা আমার শ্মশানবাসী—

গানটিতে স্বামিগৃহে অকল্যাণ আশঙ্কা করিয়া স্নেহময়ী মাতার প্রাণের কি গভীর কাতরতা! আবার কন্যাস্নেহ যেমন একদিকে খুব পরিস্ফুট, উমার পতিপ্রেমেরও কি জ্বলন্ত ছবি উহাতে প্রতিভাত! উমাকে দেখিয়া গিরিরাণী যখন বলেন—

ওমা কেমন করে পরের ঘরে ছিলে
উমা বল্‌ মা তাই।
কত লোকে কত বলে, শুনে ভেবে মরে যাই।
মার প্রাণে কি ধৈর্য্য ধরে,
জামাই নাকি ভিক্ষা করে;
এবার নিতে এলে ব'লব হরে,
উমা আমার ঘরে নাই ॥

যিনি জগৎশুদ্ধ নারীকে পতিপ্রেম শিখাইতে স্বামিসহ শ্মশান-বাসিনী, তিনি মায়ের উপরই দোষ চাপাইয়া স্বামীর পক্ষ সমর্থন করিয়া উত্তর করিলেন—

তুমি তো মা ছিলে ভুলে,
আমি পাগল নিয়ে সারা হই—
হাসে কাঁদে সদাই ভোলা
জানে না মা আমা বই।

আবার অন্যত্র গাহিতেছেন—

খেপার দশা ভাব্‌তে গেলে,
ও মা ভেসে গেল নয়ন-জলে !
একলা পাছে যায় গো চলে—
আপন হারা এমন কই !

ইহাই খাঁটি বাঙ্গালার গান। যে গানে রামপ্রসাদ মাকে আদেশ করিয়া কাজ করাইতেন, যে গান গাহিয়া দাশরথি বাঙ্গালা কাঁদাইতেন—বাঙ্গালার সেই সনাতন সুর, ভক্তকবি গিরিশের সুরে। হায় ! কবে বাঙ্গালায় এ সঙ্গীতের আবার পুনরুদ্ধার হইবে ?

কি জাতীয় সঙ্গীতে, কি প্রেমিক-প্রেমিকার প্রণয়-সঙ্গীতে, কি ভগবৎপ্রেম-সঞ্চারণে—ভাবে, সজীবতায় ও রসসমাবেশে গিরিশের গান অদ্বিতীয়। আজও সুদূর পল্লীতে এই গান প্রতিধ্বনিত হয়, বাঙ্গালার হাটে মাঠে ঘাটে এখনও এ গান শুনিয়া আনন্দে বিহ্বল হই। বস্তুতঃ বাঙ্গালার এই খাঁটি প্রাণ-সঙ্গীত চিরদিন বাঙ্গালীর হৃদয়ে অমর হইয়া থাকিবে।

পরিচয়

গ্রন্থোক্ত ব্যক্তি

অ

অতুল মিত্র—১৬৬

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—৫৮, ১০০, ১১০, ২২৪

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত—২০০, ২২৫, ২২৬, ২৩২

অমৃতলাল বসু—১৪, ৫৮, ১১৬, ১৫৮, ১৮৮, ১৯৩, ১৯৫, ২৩২, ২৩৬, ২৩৮

অর্দ্ধেন্দু মুস্তাফী—১৬৩, ১৮৬, ১৮৭, ১৮৮, ২১৪, ২৩২

অলকট—১৯৫

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়—৯০

অক্ষয়চন্দ্র সরকার—১৮৪, ২১৩

আ

আর্নল্ড—১৯৬

আর্ভিং—২২০, ২২১, ২৩১

Aristophanes—১১৩

ই

ইবসেন—(Ibsen)—১১৪

ঈ

ঈশ্বর গুপ্ত—২, ১৭৭, ২৪০

উ

উপেন্দ্র দাস—১১৬, ১৮৮

উপেন্দ্র মিত্র—১১৬

ও

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ—(Wordsworth)
৩২

ক

কালীপ্রসন্ন সিংহ—২, ৪০, ১৫০, ১৭৬, ১৭৮

কাশীরাম দাস—১

কীন—২২০

কৃত্তিবাস—১

কৃষ্ণগোবিন্দ—১৬৮

কেদার চৌধুরী—৪৬, ১৮৯

কেশব গাঙ্গুলী—১৭৯

কেম্বল—২২০

কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন—১৯৪

কবিকঙ্কণ—১

গ

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—১৬৮

গুর্ম্মুখ রায়—১৯১, ১৯৩

গোপাল শীল—১৯৬, ১৯৭

গ্যারিক—১৯২, ২০৫, ২০৭, ২১৪, ২২০ ২২৪, ১২৫

চ

চন্দ্রমাধব—:৬৮

চিত্তরঞ্জন—৪৯, ৬৮, ১০৩, ১৩৮, ১৭১, ২০১

চুনীলাল দেব—২৩২

জ

জননী—১২

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর—৮০, ১০৭

ত

তারাসুন্দরী—১০০, ২২৯

তিনকড়ি—১০৯, ২২১, ২৩৫
তিলক—২০১

দ

দানীবাবু—২০৩, ২১৩
দাশরথি রায়—১, ২, ১৭৭
দীনবন্ধু মিত্র—২, ১০, ১২৬, ২১৪
দেবেন্দ্রনাথ বসু—২ ১০, ১২৬, ২১৪
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর—১৫৫
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—১৩, ৮০, ৮৬, ৮৮, ১০৭, ১২৭, ১৫৯, ১৬১

ধ

ধর্ম্মদাস সুর—১৮৭

ন

নবীনচন্দ্র সেন—৩৭, ১০৬, ১৪৮, ১৫৬
নবীনকৃষ্ণ বসু—৩, ১৭৮
নরেন্দ্রনাথ সরকার—১৯৯
নাগেন্দ্রভূষণ—১৯৯

প

Plutarch—১৪
প্রতাপ জহুরী—১৮৯, ১৯১
প্রসন্নকুমার ঠাকুর—১৯৯

ব

বঙ্কিমচন্দ্র—২, ১৩, ৩৮, ৬৯, ৮৬, ১০১ ১০৬, ১৪২, ১৮৪
বার্নার্ড্ শ—১২৯
বাল্মীকি—৬২, ৬৫
বিপিনচন্দ্র পাল—৫৮, ২০১
বিদ্যাসাগর—২, ১৭৮
বিবেকানন্দ—৯, ১০, ৩৬
বিনোদিনী—১৪৬, ১৮৮, ১৯২, ২১২, ২২১, ২২৩
বেকন—৩
বিহারী চট্টোপাধ্যায়—২১৮
ব্যাস—৬২, ৬৫
ব্রজেন্দ্র দেব—১৮৪

ম

মধুসূদন দত্ত—১৪৩, ১৪৫, ১৪৮, ১৭৬
মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী (মহারাজ)—২২৭
মনোমোহন বসু—৪৫
মহেন্দ্র বসু—১৪৬, ২২২
মার্লো—৩, ৮৯
মিল্—৩
মিল্টন্—৩, ১৪৭
মোলিয়ার—৩

য

যোগেশ চৌধুরী—৫৮

র

রবীন্দ্রনাথ—১৩, ৪৬, ১১৪, ১৪৪, ১৪৮
রাজকৃষ্ণ রায়—৪৬, ৪৭, ১৫৮
রমেশচন্দ্র দত্ত—৩৭
রামকৃষ্ণদেব—২, ৮, ৯, ১০, ৪১, ৪৪, ৬০ ৬১, ১৯৫, ২১৯
রামপ্রসাদ—২৩৯-২৪১
রামমোহন রায়—১
রামতারণ সান্ন্যাল—১৮৯, ২৩৫
রামনারায়ণ—১৭৬
রূপগোস্বামী—১৩৩

শ

শশধর তর্কচূড়ামণি—১৯৪
শিশিরকুমার ঘোষ—১৮৬

স

সারদাচরণ মিত্র—১৮২
সিলার—৭৩, ৭৪, ৭৬
সুকুমারী দত্ত—১৮৭
সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার—১৩
সুরেন্দ্র রায়চৌধুরী—১৬৩
সুইন্‌বার্ণ—১৪, ৬৬

সেক্সপিয়র—৩, ৪, ১৩-১৫, ৩৩, ৬২, ৬৫, ৭২, ৭৩, ৮৯, ৯৮, ১১১, ১১২, ১২৯, ১৩২, ১৩৬, ১৪০, ১৪৮, ১৫৭, ২০৮

হ

হরলাল রায়—৪৫
হরিনাথ দে—৫৮
হরিভূষণ—৪৬
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—১৩১
হোমার—৬৫
হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—১৭৯
হেমচন্দ্র—২, ৩৮, ১৪৮

ক্ষ

ক্ষীরোদপ্রসাদ—১৫, ৪৯, ৫৮, ৬৯, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ১০০, ১০৭, ১৬২
ক্ষেত্র মিত্র—১০১, ২৩৫

গ্রন্থোক্ত নাটকাদি

অ

অকালবোধন—১৮৯
অশ্রুধারা—২০০
অশোক—৬, ৯, ১২, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২
অভিমন্যুবধ—১৭

আ

আলাদ্দিন—১৬৬
আয়না—১৬৭, ২০০
আলিবাবা—২৩৫
আনন্দরহো—৩৭, ৬৬
আগমনী—১৪২, ১৮৯
আবুহোসেন—১৬৬, ১৯৯, ২০২

ক

কমলেকামিনী—১৯৪
করমেতিবাঈ—১৯৯
কালাপাহাড়—৯, ৪৮, ৪৯, ৫৭, ১৬৩
কৃষ্ণকুমারী—২১৮

গ

গিরিশপ্রতিভা—৪, ১১ (গ্রন্থকার)
গোবরা—১২
গৃহলক্ষ্মী—৯, ১১১, ১১৩, ১১৯, ১২৬, ১২৯, ২০৩

চ

চন্দ্রা—১২৯, ১৩৬, ১৬৭
চণ্ড—৩৬, ৬৭, ৬৯, ১৬৪
চন্দ্রশেখর—২০২
চন্দ্রগুপ্ত—১৩
চাঁদবিবি—২০০ (ক্ষীরোদপ্রসাদ)
চৈতন্যলীলা—৪০, ৪২, ৪৯, ৬০, ১৯৩, ১৯৪, ২৪২

ছ

ছত্রপতি—১০, ৩৪, ৮৮, ১০৪

জ

জনা—৯, ১৭-২১, ২৩-২৬, ২৭-৩৩, ৪০, ১৩১, ১৯৯, ২০২

ত

তপোবল—৯, ৪০, ৪৯, ৫৬, ৫৮, ৬১, ১১০, ১২০, ১৫৪, ২০২

দ

দক্ষযজ্ঞ—৪০, ১৪১, ১৯২, ১৯৪
দুর্গেশনন্দিনী—১৮৯
দোললীলা—১৮০
দেলদার—২০০

ধ

ধ্রুব—১৩১, ১৯৩

ন

নলদময়ন্তী—১৩১, ১৯৩
নসীরাম—৯, ৪০
নিমাইসন্ন্যাস—১৯

প

পলাশীর যুদ্ধ—২০৭, ২১৮
পাণ্ডবগৌরব—৯, ৪০
পৌরাণিক নাটক—৩৮, ৪০
পূর্ণচন্দ্র—৪০, ১৩৪
প্রফুল্ল—৬, ৪৪, ৬৭, ১১০, ১১৫, ১১৯, ১২১, ১২২, ১৯৭, ২২৩, ২২৭
প্রভাসযজ্ঞ—১৯৩
প্রহ্লাদচরিত্র—৪৭, ১৯৪

ব

বলিদান—৯, ৫৯, ১১১, ১১৩, ১১৯, ১২৫, ১৪১, ২০০, ২০৫, ২৩০
বাসর—১৩৪
বিল্বমঙ্গল—৯, ৪০, ৪৮, ৪৯, ৬১, ১৪১
বিষাদ—১৪১, ১৯৮
বিষবৃক্ষ—১৮৯
বুদ্ধদেব—৪৮, ৫৯, ১৩৯, ১৪১, ১৯৩, ১৯৬, ২৪৪
বৃষকেতু—১৯৪
বেল্লিকবাজার—১৬৭
ব্রজবিহার—২৪২

ভ

ভ্রান্তি—৬৯, ১৩৫, ১৯৯, ১৩৫

ম

মনের মতন—৯, ২০০
মলিনাবিকাশ—১৬৬, ১৯৮
মহাপূজা—১৯৮
মায়াবসান—৬, ৯, ১১১, ১১৩, ১১৯, ১২৩, ১২৯, ১৩৫
মায়াতরু—১৬৬
মাধবীকঙ্কণ—৩৭
মীরকাসিম—৯, ৫৯, ৮৮, ৮৯, ১০১-১০৩, ১০৬, ১১০, ২০০, ২০২, ২০৪, ২৩৫
মুকুলমুঞ্জরা—১৩২, ১৪২, ১৬৩, ১৬৪, ১৯৯
মৃণালিনী—৩৭, ২১১, ২১২, ২৪৩
মেঘনাদ-বধ কাব্য—৩৭, ২০৬, ২১৩, ২১৫ (মধুসূদন)
ম্যাক্‌বেথ—৩৩, ১৫০, ১৬৮, ১৬৯, ১৭০, ১৭১

য

য্যায়সা কি ত্যায়সা—১৬৬

র

রাণাপ্রতাপ—৭৯, ৮০
রাবণ-বধ—১৫০
রূপসনাতন—৪০, ১৪০, ১৯২

শ

শঙ্করাচার্য্য—৯, ৪০, ৪৯, ৬০, ৬১
শাস্তি কি শান্তি—১১১, ১৯৩, ১২৬, ১২৮
শ্রীবৎসচিন্তা—৫

স

সৎনাম—১০, ৫৪, ৫৫, ৬৮-৮৮, ১০৮, ১৪১
সপ্তমীতে বিসর্জ্জন—১৬৬
সধবার একাদশী—২ (দীনবন্ধু)
সিরাজদ্দৌলা—১০, ৫৯, ৮৮-৯১, ৯০-১০২, ১০৪, ১০৫, ১১০, ১৩১, ১৬০, ২০০, ২০২, ২০৪, ২৩৫
সীতার বনবাস—৩৪, ৩৫
সীতারাম—৬৯, ১৯৯, ২৩৫ (বঙ্কিম)
স্বপ্নের ফুল—১৬৬

হ

হরগৌরী—২০০
হারানিধি—৬৭, ১১২, ১১৯, ১৯৭

চরিত্রাভিনয়

উড্—২১৪
করিমচাচা—১৩৪, ২৩৩
করুণাময়—২২০, ২৩০
কালীকিঙ্কর—২২০
কঞ্চুকী—২৩৪
ক্লাইভ—১০১, ২১৮
চন্দ্রশেখর—২২০
চণ্ড—২২২
চিন্তামণি—২৩৪
জহরা—১০০
তারা—১০৯
দক্ষ—১৯২, ২১৮-১৯
নিমচাঁদ—১৮২
পশুপতি—২১১-২১২
বিদূষক—১৩৪, ২৩১
বরুণচাঁদ—১৩৩
ভীমসিংহ—১৮৬, ২১৯
ম্যাক্‌বেথ ২২০, ২২১
মেঘনাদ—২১৪
মিরকাশিম—১০৩
যোগেশ—১১৯, ২১২-২২৪, ২২৬, ২৩১
রঙ্গলাল - ২৩৩
রোমিও—২২৪
রাম—২১৪
লীয়র—২২৬
ললিত—১৮৪
সীতারাম—২২৫
সাধক—২৩৪
হরিশ—২২০, ২২৮